البريلوية عقائد وتاريخ

বেরেলভী মতবাদ:
আকীদা-বিশ্বাস ও ইতিহাস

মাকতাবাতুস সুন্নাহ প্রধান অফিস
কাটাখালী (দেওয়ানপাড়া মাদরাসা মোড়), রাজশাহী।
মোবাইল: ০১৯১২-০০৫১২১ (বিকাশ/নগদ-ব্যক্তিগত)
www.maktabatussunnah.org
email: maktabatussunnah19@gmail.com

মাকতাবাতুস সুন্নাহ শাখা অফিস
৩৪, নর্থ ব্রুক হল রোড (তৃতীয় তলা), বাংলা বাজার, ঢাকা ১১০০।
মোবাইল: ০১৭৬৭-৫৭০১৮৬ (বিকাশ/নগদ-ব্যক্তিগত)

দ্বিতীয় সংস্করণ:
মহররম, ১৪৪৬ হিজরী; জুলাই, ২০২৪ ঈসায়ী

মূল্য : ২৫০ (দুইশত পঞ্চাশ) টাকা

বেরেলভী মতবাদঃ
আকীদা-বিশ্বাস ও ইতিহাস

মূলঃ শায়খ ইহসান ইলাহী যহীর

অনুবাদকঃ

আবূ রোমাইসা মোঃ নূর-এ-হাবিব

ও

মোঃ তরিকুল ইসলাম

অনুবাদক ও সহকারী গবেষক, মাকতাবাতুস সুন্নাহ

সম্পাদকঃ

ড. আব্দুল বাসির বিন নওশাদ
পিএইচডি, দাওয়াহ ও উসূলুদ্দীন অনুষদ, মদিনা ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়, সৌদী আরব।
সহকারী অধ্যাপক ও একাডেমিক প্রধান, কুল্লিয়াতুল কুরআন, উত্তরা, ঢাকা।

الناشر: مكتبة السنة

প্রকাশনায়ঃ মাকতাবাতুস সুন্নাহ

বিষয় সূচি

সউদী ধর্ম মন্ত্রণালয়ের বিশিষ্ট দাঈ ও মাদরাসা মুহাম্মাদিয়া আরাবিয়ার মুহাদ্দিস শাইখ মুহাম্মাদ ইবরাহীম আল-মাদানী হাফিযাহুল্লাহর

বাণী

'বেরেলভী মতবাদঃ আকীদা-বিশ্বাস ও ইতিহাস' বইটির মূল লেখক হচ্ছেন- তাওহীদ ও সুন্নাতের প্রচারকারী, শির্ক-বিদআতের মূলোৎপাটনকারী এক অকুতভয় ব্যক্তিত্ব, শির্ক-বিদআতের মূলোৎপাটনে আপোষহীন সংগ্রামকারী শাইখ আল্লামা ইহসান ইলাহী যহীর রহিমাহুল্লাহ। তাঁর এ বইটিতে তিনি হানাফী মাযহাবের অনুসারী দাবিদার প্রধান দলসমূহের একটি দল বেরেলভীদের সম্পর্কে আলোকপাত করার প্রয়াস পেয়েছেন। বেরেলভীদের পরিচয়, উৎপত্তি, আকীদা-বিশ্বাস ও তাদের মাঝে যেসব অপসংস্কৃতি রয়েছে সেসবগুলোকে তিনি কুরআন ও সহীহ হাদীসের নিরিখে বিশ্লেষণ করেছেন। বইটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। বইটি আরবী ভাষা হতে ইংরেজী ভাষায় অনুবাদ করা হয়েছে। ইতিমধ্যেই উক্ত বইটি বাংলা ভাষায় অনূদিত হয়ে প্রকাশিত হতে যাচ্ছে। উক্ত বইটি আমি শুরু হতে শেষ পর্যন্ত পাঠ করেছি। আমার দৃঢ় বিশ্বাস ও আশা এই যে, এটি বাংলা ভাষাভাষি পাঠক ভাই-বোনদের বিশেষ উপকারে আসবে। তাই আমি এ বইটির বহুল প্রচার ও প্রসার কামনা করছি এবং এই বইয়ের মূল লেখক, অনুবাদক এবং অন্যান্য সকল সহযোগিতাকারীদের জন্য কল্যাণ কামনা করে শেষ করছি।

Ibrahim 22/01/2015

মুহাম্মাদ ইবরাহীম আল-মাদানী

অনুবাদকের ভূমিকা

إِنَّ الْحَمْدَ لِلَّهِ نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِينُهُ مَنْ يَهْدِهِ اللهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ وَمَنْ يُضْلِلْ فَلَا هَادِيَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ أَمَّا بَعْدُ – فَإِنَّ خَيْرَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللهِ وَخَيْرُ الْهُدَى هُدَى مُحَمَّدٍ وَشَرُّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ وكل ضلالة في النار–

আমাদের উপমহাদেশে সবচেয়ে বড় যে সংকট, তা হলো ঈমান বা আকীদা বিষয়ক জ্ঞান চর্চার সংকট। বক্ষমান বইটিতে যাদের আকীদা বিশ্বাস নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে, তারা হানাফী মাযহাবের অনুসারী হিসেবে দাবি করলেও তারা মূলত শিয়া প্রভাবিত সুফী সম্প্রদায়। এরা 'বেরেলভী', 'রেযভী', 'আহলুস সুন্নাত ওয়াল জামাআত' বা 'আহলে সুন্নাত', 'সুন্নী' সুন্নিয়া' ইত্যাদি নামে নিজেদের পরিচয় দেয়।

বাংলাদেশের কবরপূজারী বেরেলভী বা রেযভী হলো যেমন- আটরশী, মাইজভাণ্ডারী, দেওয়ানবাগী, এনায়েতপুরী, চন্দ্রপাড়া, সুরেশ্বরী, রাজারবাগী এবং আরো অনেকে যারা কবরপূজা ও অন্যান্য শিরকী কাজের সংঙ্গে জড়িত।

দুঃখের বিষয় হলো, এদের আকীদা বিশ্বাস সম্পর্কে অনেক মুসলিমই অবগত নন। এমনকি অনেক লোক যারা সমাজে আলিম-উলামা নামে পরিচিতি লাভ করেছেন, তারাও এদের আকীদা-বিশ্বাস সম্পর্কে অনবহিত। ফলে আমাদের দেশের সরলপ্রাণ মুসলিমদেরকে বিভ্রান্ত করতে এ সকল নামধারী আলিমগণ এদের শিরকী-বিদআতী আকীদা-বিশ্বাস ও কর্মকাণ্ড প্রচারে গুরুত্বপূর্ণ (!) ভূমিকা পালন করে চলেছেন।

এরা নামে হানাফী হলেও আবু হানীফা রহিমাহুল্লাহ -এর কোনো আকীদাই তারা মানে না। ইমাম আবু হানীফা (রহমতুল্লাহি আলাইহি) -এর আকীদার কিতাব 'ফিকহুল আকবার' বা তাঁর অনুসারী ইমাম তাহাবী (রহমতুল্লাহি আলাইহি)-এর 'আকীদাতুত তাহাবী'র অনুসরণ এরা করে না।

এরা শিয়া প্রভাবিত সুফীদের তৈরী বিভিন্ন মতবাদ আমদানী করে আমাদের সরলপ্রাণ মুসলিম ভাইদেরকে বিভ্রান্ত করে চলেছে। এ সকল নামধারী আলিম ও তাদের অনুসারীদেরকে বিশেষ ভাবে এসকল বেরেলভীদেরকে তাদের বাতিল সুফীবাদী ও বিভ্রান্ত শিয়া-রাফিযীদের থেকে গৃহীত আকীদা-বিশ্বাসসমূহ প্রচার করতে কোনো বেগ পেতে হয় না। সুফীদের নামে যে যা বলে, সকলে তাই বিশ্বাস করে। মূলত সুফী আকীদার অধিকাংশই

শিয়া মতবাদ থেকে গৃহীত। শিয়ারা তাদের কথিত ইমামগণের সম্পর্কে যেসকল শিরকী আকীদা পোষণ করে, ঠিক একই আকীদা রাখে সুফীবাদী এসকল লোকেরা তাদের শায়খ বা পীরদের সম্পর্কে।

এ সকল আকীদার মধ্যে অধিকাংশই আছে স্পষ্ট শিরক, কিছু গোপন শিরক এবং কিছু বিদআতী আমল। এদের কিছু নিদর্শন বা চিহ্ন রয়েছে, যার সবচেয়ে প্রভাবশীল হলো রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে নিয়ে বাড়াবাড়ি করা, আল্লাহকে বাদ দিয়ে সরাসরি তাঁর কাছে দুআ করা, তাঁর জন্য 'ইলমে গায়েব' বা সকল অদৃশ্যের পরিপূর্ণ জ্ঞান দাবি করা, তাঁকে দুই জাহানের সকল ক্ষমতার মালিক বলে দাবি করা, তাকে সকল কল্যাণের-অকল্যাণের মালিক দাবি করা, তাঁকে 'হাজির-নাযির' বা সবসময় সর্বত্র উপস্থিত ও সবকিছুর দর্শক বলে দাবি করা।

এছাড়া শিয়াদের মত তাদের কথিত ওলী, ইমাম ও পীরদের ব্যাপারে বাড়াবাড়ি করা, যেমন- তাদের জন্যও সকল গায়েবের জ্ঞান ও ক্ষমতা দাবি করা, তাদের কাছে সরাসরি যাচ্ঞা করা, দুআ করা ও হাযত প্রার্থনা করা, কবরকেন্দ্রিক ইবাদত করা, এদের শিরকী ওসীলা দেওয়া, কবরের মাটি আরোগ্য লাভের উদ্দেশ্যে ব্যবহার করা, কবরে বা পীরের দরগায় মানত-নযর দেওয়া, কবরে বা পীরের দরগার নিকট জবাই করা, ভেট বা মানসা দেওয়া, কবর বা পীরকে সাজদা করা, কবরের, মাজারের বা পীরের ছবি হাত দিয়ে মলা এবং চোখে মুখে লাগানো ইত্যাদি যার প্রায় সবটাই শিরকে আকবার যা একজন মুসলিমকে ইসলাম থেকেই বের করে দেয়। আরও একটি বড় নিদর্শন বা চিহ্ন হলো বিদআতী অনুষ্ঠান যেমন 'ঈদে মিলাদুন্নবী' নামে বিভিন্ন জমকালো অনুষ্ঠান, তাযিয়া, জশনে জুলূস, কিয়াম, ওলী আওলিয়ার কবরের নিকট তাদের জন্ম বা মৃত্যুদিবসে কথিত 'ওরস' পালন ইত্যাদি। আমাদের দেশের মুসলিমরা না জেনেই অনেকে এ শিরক ও বিদ'আতের বেড়াজালে আটকে পড়ে অজান্তে নিজের ঈমানটাকেই বরবাদ করে দিচ্ছেন।

এ মুহূর্তে এদের শিরকী-বিদআতী আকীদা খণ্ডনে শায়খ ইহসান ইলাহী যহীরের বক্ষমান বইটি আমাদের প্রিয় মুসলিম ভাইদের হাতে পৌঁছানো অতীব জরুরী। তাই এ অনুবাদের কাজে পুরোপুরি আত্মনিয়োগ করি। আলহামদুলিল্লাহ। আল্লাহ তা'আলার শোকর করি যে, তিনি আমার মত এক নগণ্য বান্দাকে এ কাজটি করার মতো সাহস, সামর্থ্য ও সুযোগ দান করেছেন। শায়খের এ বইটি মূলতঃ আরবী ও উর্দূ ভাষায় লিখিত। এর ইংরেজী অনুবাদ হয়েছে। এর পূর্বে এর কোনো বাংলা অনুবাদ কেউ করেছে বলে আমাদের

জানা নেই। আমরা এর তিনটি গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায় অনুবাদ করেছি, এখনও দুটি অধ্যায় অননুবাদিত (এ সংস্করণে তা অনুবাদ করা হয়েছে) রয়েছে।

বেরেলভী মতবাদের খণ্ডনে সবচেয়ে তথ্যবহুল ও সূত্রবহুল হলো শায়খ যহীরের এ কিতাবটি। অত্যন্ত প্রাজ্ঞ ও সুপণ্ডিত শায়খ তাদের ফিরকার স্বীকৃত আলিমদের লিখনী ও গ্রন্থ থেকে সকল তথ্য সূত্র সহ তাদের প্রতিটি আকীদা উল্লেখ করেছেন এবং এরপর কুরআন ও সহীহ সুন্নাহর আলোকে এর বিষয়বস্তু খণ্ডন করেছেন।

অনুবাদের ক্ষেত্রে আমার সর্বাত্মক চেষ্টা ছিল বইটি যাতে হুবহু অনুবাদ হয় সেজন্য মূল বক্তব্যেরও কোনো পরিবর্তন করিনি, কোথাও কোথাও সেজন্য অস্পষ্টতা থাকতে পারে। কোনো বিষয়ে অতিরিক্ত তথ্য দিতে বা কোনো আকীদার ক্ষেত্রে তুলনামুলক বিষয় সংযোজন করতে আমি টীকার আশ্রয় নিয়েছি। অনেক লেখকের লেখা থেকে টীকায় উদ্ধৃতি দিয়েছি। বেশিরভাগ টীকাতেই সেসকল লেখকের বই থেকে সরাসরি উদ্ধৃতি প্রদান করেছি। আল্লাহ সেসকল লেখকদের জাযায়ে খায়ের দান করুন। আর হাদীসগুলির নম্বর দেওয়ার ক্ষেত্রে কখনো মূল কিতাবের, কখনো বা প্রচলিত বাংলা অনুবাদের থেকে এবং যুগশ্রেষ্ঠ মুহাদ্দিস মুহাম্মদ নাসির উদ্দীন আল আলবানী', মুহাক্কিক শোয়াইব আরনাউত্ব এবং ক্ষেত্রবিশেষে অন্যান্য মুহাক্কিকগণের তাহকীক উল্লেখ করেছি। 'অনুবাদকের টীকায় যত ভুল-ভ্রান্তি তার সকল দায়ভার আমার, মূল লেখকের নয় কোনোভাবেই। আর অনুবাদ কর্মেও কোথাও কোনো অনিচ্ছাকৃত ভুল লক্ষ্য করলে আমাদেরকে জানালে আমরা তা সংশোধন করবো ইনশাআল্লাহ এবং তার জন্য মহান আল্লাহর নিকট দুআ করবো যেন তাকে জাযায়ে খায়ের দান করেন।

যা হোক, আমরা দুআ করি যেন মহান আল্লাহ আমাদেরকে তাঁর কল্যাণময় দীনের সঠিক ও সহীহ আকীদার জ্ঞান দান করেন এবং আমাদের আকীদার সকল ভুল-ক্রটি গুলো সংশোধন করে দেন।

আসলে অনেকেই আছেন যারা না জেনে এ ভুল আকীদার মধ্যে রয়েছেন, হয়তো সঠিক আকীদার লাভ ও তার এ ভুল আকীদার ক্ষতি জানলে ফিরে আসবেন। যে ব্যক্তি ফিরে আসে, অর্থাৎ তাওবা করে, তার তো কোনো গুনাহ-ই অবশিষ্ট থাকেনা। আমি কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি আমার সেসকল দীনি ভাইদের যাদের উৎসাহ-প্রেরণা আমার এ অনুবাদকর্মের ক্ষেত্রে অত্যন্ত উপকারী প্রমাণিত হয়েছে, আলহামদুলিল্লাহ এবং সে সকল ভাইদের যারা এর প্রিন্টিং ও প্রকাশনায় আমাকে বিভিন্নভাবে সহযোগিতা করেছেন। বিশেষভাবে শায়খ মুহাম্মদ ইবরাহীম মাদানীর প্রতি আমি গভীর কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি যিনি

হাজারো ব্যস্ততার মাঝে অনেক কষ্ট করে এ অনুবাদ কর্মটি দেখেছেন। সকাতর প্রার্থনা করি মহান বিচারক প্রতাপশালী আল্লাহর দরবারে তিনি যেন লেখক, অনুবাদক, অনুবাদকের মাতা-পিতা, পরিবার-পরিজন, প্রকাশক ও এর প্রকাশনার ব্যাপারে আর্থিকভাবে সহায়তাকারী এবং পাঠকসহ সকল মুসলিম ভাইদেরকে ক্ষমা করেন, কিয়ামতে নাজাতের উপলক্ষ বানিয়ে দেন এবং তাঁর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর শাফাআতের অধিকারী করেন ও দীনের কল্যাণকামীদের কাতারে আমাদেরকে শামিল করেন। আমীন, ইয়া রব্বাল আলামীন।

আল্লাহুম্মা সল্লি আলা মুহাম্মাদিনিন নাবিয়্যিল উম্মিয়্যি ওয়া আলিহী ওয়া সাল্লিম।

বিনীত

আবু রুমাইসা মোঃ নূর-এ- হাবিব

মুহাররম ১৪৩৬ হিজরী, নভেম্বর ২০১৪ ঈসায়ী

২য় সংস্করণের ভুমিকা

নাহ্‌মাদুহূ ওয়া নুস্বল্লি আলা রাসূলিহিল কারীম আম্মাবা'দ।

আলহামদু লিল্লাহি। মহান আল্লাহ আমাদের এ কর্মটিকে লোকদের মাঝে ছড়িয়ে দেয়ার ব্যবস্থা করেছেন তাঁর দীনের খাদিম, ডা. মোঃ মোশাররফ হোসেন ভাইয়ের মাকতাবাতুস সুন্নাহর মাধ্যমে, সে কারণে সবার প্রথমে আল্লাহর প্রশংসা করছি। অতঃপর যে প্রিয় ভাই এ কিতাবটি দ্বিতীয় বার প্রকাশের উদ্যোগ গ্রহণ করেছেন, ডা. মোঃ মোশাররফ হোসেন ভাই, আল্লাহ তাকে দুনিয়া ও আখিরাতে উত্তম বিনিময় দান করুন।

পরকথা, প্রথম প্রকাশিত হওয়ার পর এবার ডা. মোশাররফ ভাইয়ের উদ্যোগে মাকতাবাতুস সুন্নাহ থেকে ২য় বার প্রকাশিত হতে যাচ্ছে অত্যন্ত মূল্যবান এই কিতাবটির বঙ্গানুবাদ। আশাকরি কিতাবটির সম্পর্কে বিশেষ কিছু বলবার নেই। তবে প্রথম প্রকাশের উপর সামান্য কিছু সংশোধনী এনেছি, যা আবশ্যক মনে হয়েছে।

মহান আল্লাহর নিকট দুআ করি বইটি বাংলা ভাষাভাষী ভাইদের সঠিক ঈমান আকীদার জ্ঞানার্জনে পাথেয় হয়ে থাক। মহান আল্লাহ এর মাধ্যমে মহান লেখকের, অনুবাদকের এবং পাঠক কুলের আখিরাতে নাযাতের উসীলা ফায়সালা চূড়ান্ত করে দিন, আমীন।

বিনীত

অনুবাদক, আবু রোমাইসা মোঃ নূর-এ-হাবিব

পাবনা, বাংলাদেশ।

২৬ শে রজব, ১৪৪৪ হিজরী; ১৮ই ফেব্রুয়ারী, ২০২৩ ঈসায়ী।

আতিয়্যা মুহাম্মদ সালিম

এর বাণী

সকল প্রশংসা মহান আল্লাহর জন্য এবং সালাত ও সালাম বর্ষিত হোক আল্লাহর সৃষ্টির সেরা ও শেষ নবীর প্রতি, তাঁর পরিবার-পরিজনের প্রতি, তাঁর সম্মানিত সাহাবীগণের প্রতি এবং যারা তাঁর প্রতি আনুগত্য ও বিশ্বস্ততা প্রদর্শন করেছেন, তাদের প্রতি।

অতঃপর, আমি সুযোগ্য এবং সুপন্ডিত প্রফেসর ইহসান ইলাহী যহীরের এই বিচ্ছিন্নতাবাদী 'বেরেলভী' ফিরকা সম্পর্কে লিখিত বই "আল-বেরেলভীয়া" (আরবী) পড়ার সুযোগ লাভ করেছিলাম। যদি কোনো দল বা চক্রান্তকারী ও স্বার্থান্বেষী গোষ্ঠীকে নিজেদেরকে অপরদল বা গোষ্ঠীকে গালাগাল করে বা অভিশাপ দিয়ে তাদের থেকে নিজেদেরকে আলাদা করে নিতে দেখা যায়, তবে তা সম্পূর্ণভাবে পরিকল্পনা করা হয় স্বার্থপরায়ণতার জন্য, যা অভ্যন্তরীণ বা গোপন উদ্দেশ্য হতে উদ্ভূত বা অন্তরের দুর্বলতার দরুণ কিংবা অজ্ঞতা এবং চিন্তা-ভাবনার অভাবে কিছু কিছু (গোপন) অনুসন্ধান হতে উদ্ভূত। যদি কোনো একদল লোকদেরকে তার সহগামী-দলগুলোর পথ থেকে পথভ্রষ্ট হয়ে এবং তাদের শিক্ষার বিষয়, মূলনীতিসমূহ এবং খুঁটিনাটি তুচ্ছ বিষয়াবলিকে কুফরী ঘোষণা করে তাদের আসল ভিত্তি হতে বিচ্ছিন্ন হতে দেখা যায়, তবে সেটা কোনো নিয়মনীতির বা বিচার-বুদ্ধির কাছেই গ্রহণযোগ্য কোনো আচরণ নয়। এ ফিরকা সম্পর্কে ইতঃপূর্বে কখনো কোনো অবগতি তো আমাদের ছিলই না, এমনকি এ সম্পর্কে কোনো ধারণাও আমাদের ছিল না, কেবল এ বইটির মাধ্যম যা বিজ্ঞ শাইখ ইহসান ইলাহী যহীর পাঠকদের সামনে উপস্থাপন করেছেন। তিনি এ ফিরকাকে কাছ থেকে জেনেছেন, তার দৃষ্টিশক্তি ও অন্তর্দৃষ্টি দিয়ে, তাদের ব্যপ্তির গভীরতাসমূহ অভ্যন্তরীণভাবে এবং বাহ্যিকভাবে পরিমাপ করেছেন, তাদের মূল নথিপত্রগুলো অবিশ্রান্তভাবে পড়েছেন, সেগুলো আয়ত্ব করেছেন এবং তাঁর নিজ দেশে তাদের সাথে বসবাস করেছেন। এ সকল উৎসসমূহের মাধ্যমে তিনি এ দলটির আসল অবস্থার সাথে পাঠকদের পরিচয় করে দিতে এবং অজ্ঞাত সত্য, যা তারা কেবল নিজেদের ব্যতিরেকে অন্য সকলের থেকে এবং যারা তাদের মতো নয় তাদের থেকে তাদের অন্তরে গোপন করে রাখতো, তা উন্মোচন করতে সক্ষম হয়েছেন। এ সত্য তাদের পীড়িত হৃদয়ে লুকায়িত রয়েছে, আর যা তাদের অন্তর গোপন করে তা হয়তো আরও ভয়াবহ।

যদি এ বইয়ের বিজ্ঞ লেখকের এ দলের প্রতিবেশীত্ব ও সাহচার্য-এর সুবাদে তাদের সঙ্গে নিকটবর্তী সম্পর্ক না থাকতো এবং আমরা যদি তাঁর পাণ্ডিত্যের সত্যপরায়ণতার উপর এবং সেই দলের আসল নথিসমূহের দ্বারা তাঁর গ্রন্থে দলিল উপস্থাপন করার উপর আস্থা স্থাপন না করতাম, তবে তাদের মতো কোনো দলের অস্তিত্ব সম্পর্কেও আমরা জানতে পারতাম না।

যখন আমরা এ দলের স্পষ্ট দৃষ্টিভঙ্গির সাথে পরিচিত হলাম এবং এদেরকে পাণ্ডিত্যসুলভ পদ্ধতিতে পরিমাপ করলাম, আমরা দেখলাম যে, যে (আকীদা-বিশ্বাস ও) কর্মপদ্ধতিসমূহ তারা অবলম্বন করে তা অর্থহীন এবং গুরুত্বহীন, কারণ তারা বাড়াবাড়ি ও অবজ্ঞা -এ দুটি প্রান্তিক/চরম সীমানায় দাঁড়িয়ে রয়েছে এবং কুসংস্কার ও ভিত্তিহীন বানোয়াট ভাবনা-চিন্তার উপর তাদের ভিত্তি স্থাপন করেছে।

তাদের তীব্র আবেগতাড়িত দৃষ্টিকোন থেকে দেখা, দ্রুত বিস্তারলাভ, তাদের মিথ্যা বানোয়াট আকীদার প্রসারের কার্যক্রম, আমজনতার নিকট তাদের ভ্রমাত্মক ধ্যানধারণার মাধ্যমে ঘটনাবলির ভুল ব্যাখ্যাকরণ, এর জন্মভূমি (ভারত পাকিস্তান) এর বাইরেও এর প্রচারণা ও বিস্তারলাভ - এসকল বিষয়ই অন্যান্যদের চেয়ে তাদের পক্ষ হতে বিপদ ও ঝুঁকিকে অধিক সংকটপূর্ণ করে তুলেছে। প্রত্যেক ব্যক্তি যে তাদের ব্যাপারে আসল সত্যকে জানে তার উপর আবশ্যক হলো তা প্রকাশ করে দেওয়া। পন্ডিত লেখক আমাদের নিকট এ বইটি উপহার দেওয়ার মাধ্যমে একটি প্রশংসনীয় উদ্যোগ গ্রহণ করেছেন যাতে এই ফিরকার কর্মকান্ড সম্পর্কে আমরা খুব ভালভাবে অবগত হতে পারি।

একজন পাঠক প্রত্যেক বইয়ের শুরুতে এটার মত একটি উপক্রমনিকা/সূচনা দেখতে অভ্যস্ত যা এর বিষয়বস্তু সম্পর্কে আলোকপাত করবে, এর অধ্যায়গুলো তার সামনে খুলে ধরবে এবং এর সত্যতা/বাস্তবতা সম্পর্কে পরিচিত হতে এর জ্ঞানজাগতিক মানের নিক্তিতে একে পরিমাপ করবে এবং এর রচনাশৈলী ও ভাব বিচার করার জন্য একে মূল্যায়ন করবে।

আমার জন্য যা করা সম্ভব তা হলো, আমি পাঠকদের জন্য কয়েকটি কথা এবং সেগুলোর স্পষ্টভাবে বিবৃত দৃষ্টিকোন উপস্থাপন করতে পারি।

এ বইয়ের লেখক সম্পর্কে, তার জ্ঞানজাগতিক উদ্যোগসমূহ, এ ফিরকার বিরুদ্ধে তার সংগ্রাম এবং তার মনোমুগ্ধকর রচনাশৈলীর জোরে এবং বিদ্বানসূলভ গবেষণার দ্বারা আধুনিক সময়ে পাক-ভারত উপমহাদেশে মুসলিমদের জন্য তার প্রচেষ্টা সম্পর্কে কিছু কথা আমি লিখলাম। তার লিখনী,

“আল বেরেলভীয়্যাহ” এর সাথে সাথে তিনি কাদিয়ানী ও বাবী ফিরকা সম্পর্কেও তিনি জ্ঞানগর্ভ বই লিখেছেন।

তিনি শিয়াদের সম্পর্কেও আধুনিক সময়ে বিবেচনাযোগ্য তাদের ব্যপ্তিসমূহ প্রকাশ করে অনেকগুলি রিসালা বা ছোট ছোট পুস্তিকা রচনা করেছেন। সামসময়িক বিভিন্ন বাতিল ফিরকার ধ্বংসাত্মক অন্ধবিশ্বাস বা গোঁড়ামি, বিভ্রান্ত পন্থাসমূহ, মুসলিমদের আকীদা-বিশ্বাস, মতধারার প্রতি মারাত্মক বিপদ হাজির করা-সহ সে সকল বাতিল ফিরকা সম্পর্কে তার লিখনীগুলো এই ক্ষেত্রে তার পূর্বসূরীদের লিখনীগুলোর অনুরূপ গণ্য করা হয়, যারা তাদের সময়ে তাদের সামসময়িক ফিরকাগুলো সম্পর্কে লিখেছেন, যদিও কেবল তাদের নামটিই আজ অবশিষ্ট রয়েছে অথবা যা তারা ইতিহাসের পাতায় লিখে গেছেন, যেমন মু'তাযিলা, খারেজী এবং অনুরূপ অন্যান্য ফিরকা। এ ব্যাপারে যা তাকে সাহায্য করেছিল তা হলো দু'সভ্যতা- ফার্সী ও আরবীর একত্রীকরণ এবং ফার্সী, উর্দু ও আরবীর আঞ্চলিক ভাষায় তার দক্ষতা; এবং প্রাচীন ও সমসাময়িক শিক্ষা, ইসলামী মানহাজের উসূল, কুরআন ও সুন্নাহ, উসুলে ফিকহ, হানাফী ফিকহ, হাদীসের ফিকহ এবং সালাফী আকীদায় তার দক্ষতা, সে তার দেশে হোক কিংবা মদীনা মুনাওয়ারায় ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়াকালীনই হোক। এসকল কারণেই তার সকল লেখনীই সংযম, ভারসাম্য এবং ন্যায়সঙ্গত যুক্তি সত্যপরায়ণতা দ্বারা সমর্থিত। সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কারণ হলো, তিনি যে ফিরকা সম্পর্কে লিখেন, সেই ফিরকার নির্ভরযোগ্য তথ্য বা প্রমাণের উৎসস্বরূপ প্রামাণ্য গ্রন্থাদির ভিত্তিতে যুক্তি প্রদর্শন করেন। ফলে তার লিখনীগুলো হয় সন্দেহের উর্ধ্বে। তিনি তাদের উৎসসমূহ থেকে যেগুলো বাছাই করে নেন, সেগুলোর কোনো উৎসকে অবিশ্বাস করার কোনো সুযোগই থাকে না। তাদের উৎসসমূহ থেকে (উদ্ধৃতির মাধ্যমে প্রমাণ দেওয়ার ক্ষেত্রে) তিনি এতই বিশেষজ্ঞ ছিলেন যে, তার বইগুলো ছাত্র এবং গবেষকদের জন্য সম্পদ ও সূত্রে পরিণত হয়েছে। বেরেলভী নামের এ ফিরকা সম্পর্কে তার লিখনীসমূহের ব্যাপারে একই যুক্তি বিদ্যমান। এ হলো এ বইয়ের বিদ্বান লেখক সম্পর্কে সামান্য কিছু কথা যা আমি পাঠকদের সামনে উপস্থাপন করতে ইচ্ছা করেছিলাম।

বেরেলভী সম্পর্কে আরো কিছু গুরুত্বপূর্ণ বিষয় যার উপর আমি আরো বেশি জোর দিতে চাই এবং আমি এগুলো এ বইটির পাতা থেকেই পেয়েছি:

প্রথমত: এ ফিরকার প্রতিষ্ঠাতার জীবনেতিহাস, তার জীবনের বিস্তারিত ঘটনাবলি এবং ১২৭২ হিজরী/ ১৮৫৫ খ্রি. হতে ১৩৪০ হিজরী /১৯২১ খ্রি. সালের মধ্যে ময়দানে তার আবির্ভূত হওয়া সম্পর্কিত যুগটি ভারতে

জ্ঞানজাগতিক, বুদ্ধিবৃত্তিক এবং সাহিত্যিক আন্দোলনের যুগ ছিল না, কারণ এ সময়ে দেশটি ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদীদের নির্মম শাসনের অধিনে ছিল যারা জীবন অন্বেষী বা জীবনমুখী সকল আন্দোলনকে ধ্বংস করেছিল। তাই এ ফিরকাটি আপন স্বার্থের জন্য বরং তাদের সেবাদানের জন্য সাম্রাজ্যবাদীদের সমর্থন ও পৃষ্ঠপোষকতার অধীনে জনসম্মুখে অবতীর্ণ হয়েছিল। এ আন্দোলনের আবহ অধ্যয়নের চেয়ে আর কোনো কিছুই এ ঘটনার অধিক নির্দেশক নয়। কাদিয়ানিয়্যাহ বিষয়টিও একই। পণ্ডিত লেখক এর আসল সত্য, ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের প্রতি এর বন্ধুত্বপূর্ণ আচরণ এবং সাহায্য-সেবাকে উন্মোচন বা প্রকাশ করে দিয়েছেন।

আল্লাহ তার (এ ফিরকার প্রতিষ্ঠাতা) কিছু ক্ষুদ্র রচনায় (রিসালায়) তাকে বলিয়েছেন যে, সে ব্রিটিশদেরকে ওয়াহাবীদের থেকে সতর্ক করে। এর অর্থ সে ব্রিটিশদের খাঁটি বন্ধু, যারা ছিলো দাওয়াহ'র বিরোধী ও শত্রু যা মুসলিম বুদ্ধিজীবীগণ এর সুবিধাদি ও সক্ষমতাসহ প্রত্যক্ষ করেছেন। ইসলামী বিশ্বের মুসলিমদের প্রতিনিধিগণ এদেশের বিশ্ববিদ্যালয়সমুহে ইসলামী শিক্ষাগ্রহনের জন্য এ দেশে সফর করেছেন। এ ফিরকার উৎস সম্পর্কে ঐতিহাসিক দৃষ্টিকোনই এর অস্তিত্বের উদ্দেশ্য এবং সাম্রাজ্যবাদীদের সমর্থনের প্রয়োজনীয়তা প্রকাশের জন্য যথেষ্ট।

বিজ্ঞ লেখক এ পর্যন্ত প্রকাশ করে দিয়েছেন যে এ ফিরকার প্রধান ব্রিটিশদের থেকে সাহায্য ও সমর্থন লাভ করেছে, যদিও সে সাধাসিধা সাধারণ লোকদের নিকট এর ব্যবহারের দ্বারা ভান করেছে যে, তার কেবল একটি মাত্র ছোট থলে ছিল যা থেকে সে অর্থ, সোনা-দানা এবং কাপড়-চোপড় বের করতো।

এর প্রতিষ্ঠাতার সূচনার বিষয় হলো, তার প্রথম শিক্ষক ছিলো মির্জা কাদির বেগ যে ছিলো গোলাম আহমাদ কাদিয়ানীর ভাই। এভাবে সত্যি বলতে কি, কাদিয়ানী এবং বেরেলভীরা হলো ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদীদের সেবায় নিয়োজিত যমজ দুই ভাই।

যদি কাদিয়ানী এবং বেরেলভী (অর্থাৎ প্রতিষ্ঠাতাগণ) তাদের দেশে সাম্রাজ্যবাদীদের পতনের এবং তাদের থেকে ওদের (ব্রিটিশদের) সাহায্য-সমর্থন প্রত্যাহারের খবর জানতে পারতো, তবে তারা তাদের অবস্থান পরিবর্তন করতো হয়তো। যাহোক, তাদের দৃষ্টি মোটেও অন্ধ ছিল না, কিন্তু তাদের বক্ষে রক্ষিত অন্তরসমূহ অন্ধ ছিলো।

দ্বিতীয়ত: এখন আমি বেরেলভীদের মতবাদ সম্পর্কে আলোচনা করব। তারা দুটো প্রান্তিক সীমাকে একত্রিত করেছে, অতিভক্তি ও অবজ্ঞা-অবহেলা।

ক. আল্লাহকে বাদ দিয়ে তাদের মৃত বা জীবিত ওলীদের বিশ্বাসের ব্যাপারে তারা খুবই বাড়াবাড়ি করেছে। তারা তাদের ওলীদের উপর সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী'র গুণাবলি আরোপ করেছে। তারা বিশ্বাস করে যে, তাদের ওলীগণ এবং নেককারগণ দুনিয়াবী সম্পদের মালিক এবং আখিরাতে নাজাতের কাঠি তাদের হাতেই, যেগুলো কোনো বিবেকবান ব্যক্তি বিশ্বাস করতে পারে না, এমনকি ইসলাম পূব যুগের্র কোনো পৌত্তলিক বা মুশরিকও বিশ্বাস করতো না।

খ. তারা সারা জীবন সালাত পরিত্যাগকারী একজন লোকের জন্য ফিদইয়া বা অর্থ বিনিময়ই যথেষ্ট মনে করার মাধ্যমে অবজ্ঞা বা শৈথিল্য চর্চা করেছে; আর সে যত বছর সালাত আদায় করেনি, সেই অনুসারে এ ফিদইয়া বা অর্থ বিনিময় দিতে হবে তাদের মোল্লাদেরকে।

তৃতীয়ত: তারা নিজেদেরকে বাদে আর সকল মুসলিমদেরকে কাফির ঘোষণা করেছে, এমনকি হানাফী দেওবন্দীদেরকেও। এটি তাদের নির্বুদ্ধিতা ও অদূরদর্শিতারই ইঙ্গিত করে, কারণ দেওবন্দীগণও তাদের মত হানাফী ফিকহের অনুসারী এবং এ উভয় দলই তাদের উৎসের জন্য হানাফীদের নিকট কৃতজ্ঞতা পাশে আবদ্ধ। দেওবন্দীদেরকে তারা কাফির ফতোয়া দেয়, যখন দেওবন্দীরাও হানাফী, তারাও হানাফী, পরিশেষে উপসংহার দাঁড়ায় যে, বেরেলভীরাও কাফির। এটি একটি স্পষ্ট ন্যায়সঙ্গত যুক্তি। অতীতের আলিমগণ বলেছেন : "যে ব্যক্তি মহান ব্যক্তিদের গালি দেয় সে যেনো নিজেকেই গালি দেয়।" এভাবে তারা পক্ষান্তরে নিজেদের অজান্তে নিজেদেরকেই কাফির ঘোষণা করে। অন্যদেরকে কাফির ঘোষণা করা তাদের প্রতীকে পরিণত হয়েছে; তারা কাউকে বাদ দেয়নি এবং এতবেশী সীমালংঘন করেছিল যে, লেখক এ ফিরকার প্রতিষ্ঠাতা সম্পর্কে উল্লেখ করেছেন যে, সে মাঝে মাঝে নিজেকেও কাফির ঘোষণা করতো। সে ছিলো কবি জারীর এর মতো। যখন তার বিদ্রূপ সীমাহীন হয়ে গেল, তখন সে বিদ্রূপ করা থেকে নিজেকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারতো না; যখন বিদ্রূপ করার মতো কাউকে পেতনা, তখন সে নিজেকেই বিদ্রূপ করতো।

তাদের নিজেদেরকে ব্যতীত অন্যদেরকে কাফির ঘোষণা করার কারণ যদি আমরা অনুসন্ধান করার চেষ্টা করি, তাহলে দেখা যায় যে, তাদের নির্বোধ কিচ্ছা ও কুসংস্কার বা গোঁড়ামিতে অন্যদের অবিশ্বাসই হলো এর অন্যতম কারণ।

এ চরমপন্থা বা বাড়াবাড়ি, হঠকারিতা এবং অতি সহজেই অন্যান্যদের কাফির ঘোষণা দেওয়ার ফলে তারা পাকিস্তানের প্রতিষ্ঠাতা মুহাম্মদ আলী জিন্নাহকে, পাকিস্তানের ইসলামী কবি ড. মুহাম্মদ ইকবালকে, এমনকি সেসময়ের পাকিস্তানী প্রেসিডেন্ট মুহাম্মদ জিয়াউল হককে কাফির ঘোষণা দিয়েছিলো।

আমি বিশ্বাস করি তাদের নিকট এটি খুবই স্বাভাবিক কারণ ছিলো যে, এ সকল লোকেরা তার বন্ধুবর ঔপনিবেশিকদের শত্রু ছিলো। তারা হলেন সেই সকল লোক যারা তাদের দেশ থেকে তাদের (ঔপনিবেশিকদের) তাড়ানোর জন্য সংগ্রাম করেছিলেন এবং যা সে (প্রতিষ্ঠাতা বেরেলভী) তাদের থেকে লাভ করতো তা বন্ধ করে দিয়েছিলেন। অতএব, তারা তাদের চোখে কাফির হবেন- এতে আশ্চর্য হবার কিছু নেই।

চতুর্থতঃ তারা পাক-ভারত উপমহাদেশের বাইরের মুসলিমদেরকেও কাফির ঘোষণা করতে শুরু করেছিল, এমনকি ইবনু তাইমিয়্যাহ রহিমাহুল্লাহকে সহ, যার শ্রেষ্ঠত্ব এবং মর্যাদা সারা বিশ্বে প্রমাণিত হয়েছে এবং এমনকি তাঁর শত্রুরা পর্যন্ত তাঁর জ্ঞান ও মেধার সমালোচনা করতে পারেনি। তারা শাইখ মুহাম্মদ ইবনু আব্দুল ওয়াহহাবকেও তাকফীরের লক্ষ্যস্থল বানিয়েছিল, যিনি তৎকালীন বিশ্বকে এবং প্রত্যেক ন্যায়বান ব্যক্তিকে নাড়া দিয়েছিলেন। তিনি মুসলিমদের মধ্যকার বিবাদ-বিসম্বাদগুলো মীমাংসা করার জন্য আল্লাহর কিতাব ও রাসূলের সুন্নাহর নিকট নিয়ে আসার জন্য তাদেরকে আহবান জানিয়েছিলেন। সেসকল বিদআতী এবং মিথ্যা বাতিল আকীদা বিশ্বাসকে পশ্চাতে নিক্ষেপ করেছিলেন, যে সকল আকীদা ইসলামের প্রথম যুগের সালফে সালেহীনগণ পোষণ করতেন না। তিনি লোকদেরকে নিম্নলিখিত অসৎকাজসমূহ থেকে বিরত রেখেছিলেন: আল্লাহকে ছাড়া অন্যের কাছে যাঞ্চা করা বা চাওয়া, আল্লাহ ছাড়া অন্যের নিকট সাহায্য প্রার্থনা করা, অথবা যা প্রাথমিক যুগের মুসলিমদের নিকট - রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নিজে যে যুগ সম্পর্কে কল্যানকর বলে সাক্ষ্য দিয়েছেন, তাদের নিকট অপছন্দনীয় ছিল এমন আমল করা। তিনি মুসলিমদেরকে এই পতাকার অধীনে একত্রিত হওয়ার দাওয়াত দিয়েছিলেন -লা- ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ এবং শরীয়াত (ইসলামী আইন) কে সালিশ বা বিচারক মানা।

সেসময়ে যখন আমাদের ঐক্য ও সংহতি প্রয়োজন ছিল তখন এ বেরেলভী সাহেব (এ ফিরকার প্রতিষ্ঠাতা) তার নিজেকে ব্যতীত আর সকলকে কাফির ঘোষণা করেছিল, এভাবে মুসলিম সম্প্রদায়কে বিভক্ত করেছিল এবং ধর্মের ভিত্তিকে ধ্বংস করেছিল।

সে লোকজনদেরকে একমাত্র আল্লাহর ইবাদত করা থেকে এমন অনেক ব্যক্তির ইবাদতের দিকে ফিরিয়ে দিয়েছে, তার মতে, যেসকল লোকেরা তাদের ডাকে সাড়া দেয় যারা তাদেরকে ডাকে, তাদের সাহায্য করে যারা তার নিকট সাহায্য প্রার্থনা করে। আর সে লোকদেরকে তাঁর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর সুন্নাহ থেকে ভিন্নমুখী করে দিয়েছিল, এভাবে তাদেরকে এসকল মন্দ আবেগ এবং প্রবৃত্তির উপর অবিচল থাকার দিকে পরিচালিত করেছিল।

কোনো লোকের পক্ষে কোনো একটি ফিরকার মধ্যে বিদ্যমান সকল ঘটনা সত্যতা যাচাই করা অসম্ভব ছিল যদি বিদ্বান লেখক এ বইয়ের বিষয়গুলো না লিখতেন, যার জন্য আমরা এ ভূমিকা লিখছি। শীঘ্রই পাঠক নিজেই দেখতে পাবেন এবং বিচার করবেন। আল্লাহই সঠিক পথে পরিচালনাকারী।

যখন ঔপনিবেশিকরা তাদের দেশ ছেড়ে গেছে এবং তাদের সাথে সংযোগ বন্ধনে ছেদ পড়েছে, এ উপলক্ষে আমি এ দলের নিকট যেখান থেকে তারা শুরু করেছিল সেই স্থানে ফিরে আসার জন্য এবং যে ফিকহী মাযহাব তারা অনুসরণ করে সেদিকে পুনরায় ফিরে তাকানোর জন্য আবেদন করছি, এ মাযহাবের ইমাম, আবু হানীফা রহিমাহুল্লাহ যে আকীদা পোষণ করতেন সে আকীদার দিকে ফিরে আসার জন্য, বিশেষত তাঁর মহান কর্ম, ফিকহুল আকবার, যাতে আকীদাসমূহ বিদ্যমান রয়েছে সেদিকে তাদের লক্ষ্য করা উচিত। আল্লাহর কিতাব, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর সুন্নাহ এবং ইসলামের প্রাথমিক যুগের সালাফগণের রীতি-পদ্ধতির দিকেও তাদের লক্ষ্য করা উচিত। যাতে করে এর মাধ্যমে আল্লাহ তাদের অন্তদৃষ্টিকে আলোকিত করতে পারেন, তাদের বক্ষসমূহকে উন্মুক্ত করতে পারেন এবং তাদের সঠিক পথে পরিচালিত করতে পারেন। তিনি সকল কিছুর উপরে ক্ষমতাবান।

আতিয়্যা মুহাম্মদ সালিম

বিচারক, আইন পরিষদ, মদীনা মুনাওয়ারাহ এবং শিক্ষক, মসজিদে নববী।

শায়খ ইহসান ইলাহী যহীর রহিমাহুল্লাহর সংক্ষিপ্ত জীবনী

(১৩৬৩ হি./১৯৩৬ খ্রি. – ১৪০৭ হি./১৯৮৬ খ্রি.)

জন্ম: শায়খ ইহসান ইলাহী যহীর বিন যুহুর ইলাহী বিন আহমাদুদ্দীন বিন নাযম বিন আলতাফ 'সীথি' বংশের লোক। তিনি পাকিস্তানের পাঞ্জাবের শিয়ালকোটে ১৩৬৩ হিজরীতে জন্মগ্রহণ করেন।

শিক্ষাজীবন: তিনি নয় বছর বয়সে কুরআনের হাফেয হন, একই সাথে ইবতেদায়ী মাদ্রাসার পড়া শেষ করেন। অতপর তিনি বিভিন্ন আলেমদের নিকট দীনের বিভিন্ন বিষয়ে জ্ঞান অর্জন করেন।

শায়খ ইহসান মদীনা ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ে জ্ঞানার্জনের উদ্দেশ্যে যান এবং ১৯৬১ সনে সেখানে ভর্তি হন। যখন তিনি মদীনাতে স্নাতক শেষ করেন, তখন ভালো ফলাফলের জন্য তাকে ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকতা করার প্রস্তাব দেয়া হয়। কিন্তু তিনি এ প্রস্তাব ফিরিয়ে দিয়ে বলেন, "আমাকে আমার নিজের দেশের বেশি প্রয়োজন।"

দেশে ফিরে তিনি পাঞ্জাব বিশ্ববিদ্যালয়ে (كلية الحقوق والعلوم السياسية) এ বিষয়ে ভর্তি হন ও অনার্স শেষ করেন। একই সাথে তিনি লাহোরের আহলে হাদীস বড় মসজিদে খুতবা দিতেন।

তিনি পাঞ্জাব বিশ্ববিদ্যালয় থেকে (الشريعة، واللغة العربية، والفارسية، والأردية، والسياسة) এ ৫ টি বিষয়ে এবং ও করাচি বিশ্ববিদ্যালয় থেকে (الحقوق) এ ১ টি বিষয়ে মাস্টার্স ডিগ্রী অর্জন করেন।

বাতিল ফিরকার বিরুদ্ধে সোচ্চার:

তিনি বাতিল বিভ্রান্ত বিভিন্ন দল যেমন কাদিয়ানী, হাদীস অস্বীকারকারী, সমাজতন্ত্রী ইত্যাদি খণ্ডন করেন। তিনি সারাজীবন আল্লাহর পথে দাওয়াহ'র কাজে ব্যয় করেছেন। সেটা বই লেখা, লেকচার, কনফারেন্স, পত্রিকা প্রকাশ, রাজনীতি করা, খুতবা দেওয়া, বিতর্ক বাহাস করা অথবা যে মাধ্যমেই হোক না কেন, সবই ছিল সঠিক আকীদা-বিশ্বাস তথা সালফে সলেহীনদের আকীদা ও মানহাজ অনুসরণে কুরআন সুন্নাহর দিকে আহ্বান। তিনি হলেন আল আল্লামা আদ দাইয়্যাহ আল মুজাহিদ। আল্লাহ তাকে রহম করুন, সর্বোচ্চ

পুরস্কার দিন তার প্রচেষ্টার জন্য এবং আরও বাড়িয়ে দিন নিজের পক্ষ থেকে। আমীন।

দাওয়াহ ইলাল্লাহ:

তিনি তার জীবনের অধিকাংশ সময় নিয়োজিত করেছিলেন দাওয়াহ ইলাল্লাহ'র জন্য। তিনি খুতবা, বক্তৃতা, বিতর্ক-বাহাস ইত্যাদির জন্য পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্ত সফর করেছেন। যেমন আফ্রিকা, আরব বিশ্ব, মধ্য প্রাচ্য, ইউরোপ ও এশিয়া। লেকচার বা বক্তব্য প্রদানের জন্য যেসকল দেশ সফর করেছেন তার মধ্যে রয়েছে, কুয়েত, সৌদি আরব (বহু বার), ইরাক (বহু বার) ও আমেরিকা। তিনি রাজনীতিতে প্রবেশ করেছিলেন এবং বহুবার বন্দী হয়েছেন বিভিন্ন সরকারের আমলে তার অনমনীয়তার জন্য এবং সৎকাজের আদেশ ও অসৎকাজের নিষেধের ক্ষেত্রে তিনি বড়-ছোট বাছ-বিচার করতেন না। শায়খ বেরেলভী ও তাদের আকীদা বিশ্বাস সম্পর্কে লিখেছেন এবং নিঃসন্দেহে এ বইটি নেতাদের এবং রাজনীতিবিদদের সঙ্গে তার আপসহীনতার একটি দৃষ্টান্ত, কারণ অধিকাংশ লোকই তখন বেরেলভী মতাবলম্বী ছিল।

শায়খ ছিলেন একজন সদাচারী, নেককার, দয়ালু, দৃঢ় ঈমানের অধিকারী, দীনের ব্যাপারে অত্যন্ত দৃঢ়, সত্যকে রক্ষার ক্ষেত্রে বলিষ্ঠ, যিনি প্রায়ই দীন রক্ষার ব্যাপারে তা দেখিয়েছেন। তিনি সৎকাজের আদেশ এবং অসৎকাজে নিষেধ করেছেন এবং বক্তব্য ও লেখনীর দ্বারা পাকিস্তানে সঠিক আকীদা ও ইসলামী শরীয়াত প্রয়োগের দিকে আহ্বান করার ক্ষেত্রে সাহসী ভূমিকা পালন করতেন এবং একে অত্যন্ত গুরুত্ব দিতেন।

একটি সংগ্রাম, জিহাদ, জ্ঞান অন্বেষণ, শিক্ষা গ্রহণ এবং পৃথিবীর বিভিন্ন অংশে যেমন- মসজিদ, মজলিস, কনফারেন্সে আল্লাহর পথে দাওয়াহ ইত্যাদি কাজ আঞ্জাম দেওয়া শেষে তার মৃত্যু হয়।

শায়খের লেখনী:

١ الشيعة والسنة (١٣٩٣هـ).

٢ الشيعة وأهل البيت (١٤٠٣هـ) وهي الطبعة الثالثة.

٣ الشيعة والتشيع فرق وتاريخ.

٤ الإسماعيلية تاريخ وعقائد (١٤٠٥هـ).

٥ البابية عرض ونقد.

٦ القاديانية (١٣٧٦هـ).

٧ البريلوية عقائد وتاريخ (١٤٠٣هـ)

٨ البهائية نقد وتحليل (١٩٧٥م).

٩ الرد الكافي على مغالطات الدكتور علي عبدالواحد وافي (١٤٠٤هـ).

١٠ التصوف، المنشأ والمصادر الجزء الأول (١٤٠٦هـ).

١١ دراسات في التصوف وهو الجزء الثاني.

١٢ الشيعة والقرآن (١٤٠٣هـ).

١٣ الباطنية بفرقها المشهورة.

١٤ فرق شبه القارة الهندية ومعتقداتها.

١٥ النصرانية.

١٦ القاديانية باللغة الإنجليزية.

١٧ الشيعة والسنة بالفارسية.

١٨ كتاب الوسيلة بالإنجليزية والأوردية.

١٩ كتاب التوحيد.

٢٠ الكفر والإسلام بالأوردية.

٢١ الشيعة والسنة بالفارسية والإنجليزية والتايلندية.

শায়খের মৃত্যু:

২৩ শে রজব ১৪০৭ হিজরীতে লাহোরের নাদওয়াতুল উলামাতে বক্তৃতা চলাকালে বোমা মেরে তাকে হত্যার চেষ্টা করা হয়। সে সময় ৭ জন আলেম মারা যান ও **শায়খ ইহসান ইলাহী যহীর রহিমাহুল্লাহ** গুরুতর আহত হন। উন্নত চিকিৎসার জন্য শায়খ ইবনে বায রহিমাহুল্লাহর সুপারিশে বিশেষ বিমানে সউদী আরবে নিয়ে যাওয়া হয়। ১লা শাবান ১৪০৭ হিজরীতে সউদী আরবের রিয়াদে মারা যান। বিমান যোগে মদীনা মুনাওয়াতে নিয়ে আসা হয় এবং বাকী কবরস্থানে দাফন করা হয়।

লেখকের ভূমিকা

বিস্‌মিল্লাহির্‌ রহ্‌মা-নির রহীম

সকল প্রশংসা মহান আল্লাহর জন্য যিনি ব্যতীত সত্য কোনো উপাস্য নেই এবং তিনি একক ও অদ্বিতীয়। সালাত ও সালাম বর্ষিত হোক সর্বশেষ নবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর প্রতি, যার পরে আর কোনো নবী নেই, আর তাঁর পরিবার-পরিজনের প্রতি, তাঁর সম্মানিত সাহাবীগণের প্রতি এবং কিয়ামত পর্যন্ত যারা তাঁর প্রতি আনুগত্য ও বিশ্বস্ততা প্রদর্শন করবে তাদের প্রতিও।

অতঃপর আমি পাঠকদের সামনে পাক-ভারত উপমহাদেশের বিভিন্ন ফিরকার মধ্যে একটি নতুন ফিরকা সম্পর্কে একটি নতুন বই উপস্থাপন করছি। আর তা হলো বক্ষমান বই "আল-বেরেলভীয়্যাহ: আকাইদ ওয়াত তারিখ" বা "বেরেলভী মতবাদ: আকীদা বিশ্বাস ও ইতিহাস"।

এর সূচনা ও আকীদা বিশ্বাসের ক্ষেত্রে এ ফিরকা এখন উপমহাদেশের অন্যতম ফিরকা যা অনেকগুলো বিদআতী এবং অন্ধবিশ্বাসী বা কুসংস্কারাচ্ছন্ন ফিরকার জন্ম দিয়েছে যেগুলো বিভিন্ন নামে এবং বিভিন্ন আকৃতিতে মুসলিম বিশ্বে ছড়িয়ে পড়েছে। এজন্য ভাবলাম যে, এদের উপর আমি আরবী ভাষায় একটি বই লিখব, যেভাবে আমি সঠিক পথ থেকে বিচ্যুত অন্যান্য ফিরকা সম্পর্কে লিখেছি।

যেকোনো দেশের কোনো পাঠক যখন এ বইটিতে তাদের আকীদা বিশ্বাস ও তাদের শিক্ষা-উপদেশাবলি পড়বে, তখন তার মনে হবে যেন সে তার নিজের দেশে কিংবা সারা মুসলিম বিশ্বে বিভিন্ন নামে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে থাকা ফিরকা। যেমন: তিজানিয়্যাহ, সানুসিয়্যাহ, মালিদাবিয়্যাহ, কাদরিয়া, চিশতিয়া, রিফাঈ এবং অন্যান্য ফিরকাসমূহের সম্পর্কেই সে পড়ছে।

(১) এসকল দেশের কিছু অধিবাসীরা বংশানুক্রমিকভাবে তাদের পূর্বপুরুষদের থেকে প্রাপ্ত সামান্য কিছু রসম-রেওয়াজ ও আচার-অনুষ্ঠান ছাড়া ইসলাম সম্পর্কে কিছুই জানে না।

(২) তারা কষ্টসাধ্য ইবাদত পালন এবং দীনের ফরয, ওয়াজিব দায়িত্ব হতে অব্যহতি লাভ হিসেবে অজ্ঞাত ওলী ও সুফী শায়খদের নিকট নযর-মানত, কুরবানী করাকে অবলম্বন করেছে।

(৩) অথবা প্রত্যেক বৃহস্পতিবার এবং বছরের নির্দিষ্ট কিছু দিনে তারা যাদেরকে ওলী ও সৎব্যক্তি মনে করে তাদের কবর (মাজার) যিয়ারত করে, কবরে ‘উরস’ বা মৃত্যুদিবস পালন করে, মীলাদ বা জন্মদিবস উদযাপন করে এবং অনুরূপ অন্যান্য মন্দ আচার অনুষ্ঠান পালন করা যা পার্শ্ববর্তী অমুসলিম দেশ যেমন- হিন্দু, মাজুসী-অগ্নিপূজক এবং মূর্তিপূজারীদের থেকে মুসলিম সমাজে অনুপ্রবেশ করেছে। ইতিহাসে সুপরিচিত সবচেয়ে জঘন্য সাম্রাজ্যবাদ তথা ইংরেজ ক্রুসেডারদের কিছু কিছু দেশের উপর আধিপত্য লাভের পরে সেসকল দেশ এসকল শয়তানী আচার-অনুষ্ঠান তাদের থেকে উত্তরাধিকার সূত্রে লাভ করেছে।

(৪) সামান্য জ্ঞানসম্পন্ন লোকও জানে যে, ইসলাম আমলের ধর্ম, কিন্তু সাধারণ মুসলিমদেরকে আমল ও আকীদা বিশ্বাস থেকে দূরে রাখা হয়েছে, কেবল সেই ব্যক্তি বাদে ‘যে স্বীয় রবের সামনে দাঁড়ানোকে ভয় করে এবং কুপ্রবৃত্তি থেকে নিজকে বিরত রাখে’।

(৫) তাই তাদের কোনো আমলও নেই, কোনো আকীদা বিশ্বাসও নেই। তারা দীনকে সংক্ষেপ করে নিয়েছে, এতে পরিবর্তন সাধন করেছে এবং তারা আমলের পরিবর্তে কুসংস্কার, গতানুগতিক আচার-অনুষ্ঠান ও উৎসব-উদযাপনকে আঁকড়ে ধরেছে।

পাঠকরা এ বইতে সেসকল বিষয়ের বিস্তারিত আলোচনা দেখতে পাবেন যা আসল নির্ভরযোগ্য উৎসসমূহ থেকে প্রমাণিত, যেভাবে এসকল বিষয়াবলি তিনি তাদের বাস্তব অনুশীলনে বিদ্যমান দেখতে পাবেন।

বাতিল ফিরকা ও স্বার্থান্বেষী দলসমূহ যেমন কাদিয়ানী, বাবী, বাহাঈ, বাতিনী এবং শিয়াদের সম্পর্কে লেখার পরে বেরেলভীদের সম্পর্কে লেখার কোনো ইচ্ছা আমার ছিল না, কারণ আমি ভেবেছিলাম যে, এ ফিরকাটি হলো অজ্ঞতার ফলশ্রুতি। জ্ঞান যতই ছড়িয়ে পড়বে, অজ্ঞতা দূরীভূত হবে এবং গুণী সম্প্রদায় আলোকিত হবে, ততই তাদের আমলের তিক্ততা এ আবেগকে প্রশমিত করবে, তাদের প্রচেষ্টা ততই সংকুচিত হয়ে আসবে এবং তাদের অবস্থা উল্টে যাবে। তাদের এবং মুসলিম বিশ্বের অনুরূপ অন্যন্য ফিরকার এ অবস্থা ঘটবে। কিন্তু আমি লক্ষ্য করলাম যে, তাদের কাজ-কর্ম বেড়েই চলছে এবং বহিঃদেশসমূহে একই আকীদা-বিশ্বাস পোষণকারী তাদের ভ্রাতৃবৃন্দের সহযোগিতায় তাদের প্রচেষ্টা বৃদ্ধি পাচ্ছে যাতে তারা তাদের বাতিল ও মিথ্যা আকীদা-বিশ্বাস ছড়িয়ে দিতে পারে এবং ইসলামের সুপ্রাচীন শুভ্র চেহারাকে বিকৃত করতে পারে।

কিচ্ছা-কাহিনী, নির্বোধ ও ভিত্তিহীন আকীদা-বিশ্বাস, কথাবার্তা, ধোঁকাবাজি; যেমন নবী ও ওলীগণের অলৌকিক ক্ষমতা, পীর ও সুফীদের কর্তৃত্ব-ক্ষমতা, ফিদইয়া ও নযর মানতকে সালাত, যাকাত ও হাজ্জের বিকল্প হিসেবে বিবেচনা করা এবং এভাবে সাধারণ লোকদের কে সঠিক পথ থেকে বিচ্যুত করার মাধ্যমে তারা এ কাজ চালিয়ে যাচ্ছে।

যারা কুরআন সুন্নাহর অনুসারী এবং আল্লাহর একত্বের দিকে আহ্বান করে, আল্লাহকে তাঁর প্রতিপালনে ও সার্বভৌম ক্ষমতায় (রুবুবিয়াতে) একত্বের পবিত্রতায় বিশ্বাস রাখে এবং মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম -এর নবুয়াতের একত্বে বিশ্বাস রাখে এবং যারা কঠোরভাবে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর সুন্নাহর অনুসরণ করে এবং মুসলিমদেরকে ওলী ও সুফী শায়খদের বাণীর পরিবর্তে কুরআন ও সুন্নাহকে আঁকড়ে ধরে থাকার জন্য উদ্বুদ্ধ করে, তাদের সাথে এরা প্রতারণা করে এবং তাদের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করে।

যে ব্যক্তি আমল করার এবং কুরআন সুন্নাহকে দৃঢ়ভাবে অবিচল থাকার দিকে আহ্বান করে, এমন প্রত্যেক ব্যক্তিকেই তারা ‘ওয়াহাবী’ ও ‘নবী-ওলীদের অসম্মানকারী’ বলে বিষোদগার করে।

উপরন্তু, যারা তাদের কুসংস্কারসমূহে বিশ্বাস করে না এবং মূর্তিপূজারী, বহু ঈশ্বরবাদী (মুশরিক) ও হিন্দুদের থেকে আগত মিথ্যা ও বাতিল কল্পনাবৃত্তি ও আকীদা বিশ্বাসের উপর নির্মিত তাদের মতামতের এবং মুসলিমদেরকে অজ্ঞতা ও নির্বুদ্ধিতার দিকে আহ্বানকারী শিক্ষাবলির যারা বিরোধিতা করে, তাদেরকে তারা ‘মুরতাদ’ ও ‘কাফির’ বলে ফতোয়া দিয়েছে।

তাছাড়া, তারা এ মিল্লাতের খ্যাত উলামায়ে কেরামকে আক্রমণ করেছে, যারা কুরআন সুন্নাহর শিক্ষা প্রসার ও এগুলো সংরক্ষণ করার মর্যাদায় আসীন হয়েছেন এবং বিদআতীদের বিদআতসমূহকে এবং যে সকল কিচ্ছা-কাহিনীকারগণ তাদের কিচ্ছা-কাহিনীসমূহ দ্বারা বৈষয়িক স্বার্থ হাসিল ও হীন শয়তানী আবেগ-অনুরাগের বহিঃপ্রকাশের উদ্দেশ্যে যেসকল কিচ্ছা-কাহিনীকে কুরআন-সুন্নাহর বিকৃত ব্যাখ্যা দ্বারা সমর্থন করেছে, তাদের কল্প-কাহিনীসমূহকে যারা খণ্ডন করার কাজ আঞ্জাম দিয়েছেন। যেসব বিদআতী আলেম ওহীভিত্তিক আইন-বিধান ও তা বাস্তবায়ন করাকে স্থগিত করার চেষ্টা করেছে, হকপন্থী আলেম তাদেরকে প্রত্যাখ্যান করেছেন।

তাদের সঠিক অবস্থান সম্পর্কে অজ্ঞতা এদের সম্পর্কে লেখালেখি থেকে আমাকে বিরত রেখেছিল, কারণ আমি ভাবতাম এবং আমার মত অনেকেই

ভাববে- যে, তারা সঠিক পথ থেকে এবং সালফে সালেহীনদের পরিষ্কার আকীদা বিশ্বাস থেকে পথভ্রষ্ট হয়েছে, তার কারণ প্রকৃত ইলম থেকে দূরে থাকা ও অজ্ঞতা।

কিন্তু যখন আমি শিয়াগণ ও তাদের আকীদা বিশ্বাস সম্পর্কে লিখলাম এবং সেগুলো নিয়ে যাচাই বাছাই করলাম, দেখলাম যে, তারাও তাদের আকীদাগুলোকে সেই অবাস্তব উৎসসমূহ থেকে গ্রহণ করেছে: 'আহলুস সুন্নাহ' নামে কথিত বেরেলভীদের থেকে এবং অতীত ও বর্তমানে তাদের মত অন্যান্যদের থেকে। কিন্তু আহলুস সুন্নাহ ও এ সকল ফিরকার মাঝে বিরাট ব্যবধান রয়েছে। তারা এক উপত্যকায় আর আহলুস সুন্নাহ অন্য উপত্যকায় রয়েছে। তাই, আতঙ্কিত হই- পাঠক ও আতঙ্কিত হবেন- যখন আমি এ সকল লোকদের আকীদা বিশ্বাস তাদের আসল উৎসসমূহ থেকে পড়ি। এসকল আকীদা বিশ্বাসের সাথে ইসলামের কোনো সম্পর্ক নেই, বরং এ হলো সেই আকীদা বিশ্বাস, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম -এর আসার পূর্বে জাহেলী যুগের আরবের মুশরিকরা যে আকীদা-বিশ্বাস পোষণ করতো। এমনকি এ ফিরকা কর্তৃক আল্লাহর সাথে শিরক করার ক্ষেত্রে এ ধরনের বাড়াবাড়ি, অতিরঞ্জন ও সীমাতিরিক্ততা এবং আল্লাহর কর্তৃত্ব ও ক্ষমতা খর্ব করা যা আরব পৌত্তলিক যুগেও ছিল না।

তাদের কথিত ওলী, পীর ও আকাবীরদেরকে প্রদত্ত মর্যাদা, শিরকের বিভিন্ন ধরণ এবং কিচ্ছা-কাহিনী বানানো, হাদীস বানানো বা জালকরণ এবং তাদের গুজবসমূহ তৈরী করা- এ সকল কিছুই তাদের জালিয়াতি ও বিদআতের চূড়ান্ত প্রমাণ। মিথ্যার প্রমাণ মিথ্যাই। ইসলামপূর্ব আরব মুশরিক ও পৌত্তলিকদের সাথে এ বেরেলভীদের কোনো তুলনাই চলে না, কারণ বেরেলভীরা বৈচিত্র ও সংখ্যাধিক্যের দিক থেকে তাদেরকে অনেক দূর ছাড়িয়ে গেছে।

দ্বিতীয়ত আমি তাদের সম্পর্কে বিশেষভাবে আরবীতে লেখা থেকে বিরত ছিলাম, কারণ প্রথমে আমি ভেবেছিলাম ভারত-পাকিস্তান উপমহাদেশের বাইরে এ ফিরকার কোনো অস্তিত্ব নেই। যদিও এ অঞ্চলে বহু সংখ্যক মুসলিম থাকার কারণে এদের আমল, আকীদা ও বিশ্বের এ অঞ্চলে মুসলিমদের মতামতের সাথে পরিচিত হওয়ার মুসলিম বিশ্বের প্রয়োজন রয়েছে। পাকিস্তান, বাংলাদেশ, ভারত ও পাশ্ববর্তী অন্যান্য দেশের মুসলিম মিলিয়ে মুসলিমের সংখ্যা ৩০ কোটি ছাড়িয়ে গিয়েছে। কিন্তু আমার এ অনুমান দীর্ঘস্থায়ী হয়নি, যখন আমি দেখলাম সেই একই আকীদা, অন্ধবিশ্বাস-গোঁড়ামী, বাজে কথাবার্তা, পৌরাণিক কল্পকাহিনী, কুরআনের আয়াতের অপব্যাখ্যা এবং

প্রক্ষিপ্তকরণ, হাদীস অবমাননা, কুরআন-সুন্নাহ থেকে বিচ্যুতি, অবাস্তব-অসম্ভব ঘটনাবলির উপর ভিত্তি করে যুক্তি প্রদান এবং কথিত অলৌকিক কাণ্ডসমূহ, সুদূর পূর্ব হতে সুদূর পশ্চিমের দেশ আফ্রিকা হতে এশিয়া পর্যন্ত ছড়িয়ে পড়েছে।

আল্লাহর নিকট সাহায্য কামনা করে এবং সফলতা প্রার্থনা করে আমি এগিয়ে এলাম এবং এ কাজটি শুরু করলাম। আমার এ মত পোষণ করতে আমাকে মোটেও বেগ পেতে হয়নি যে, তাদের সম্পর্কে উপমহাদেশের মুসলিমদের ভাষা উর্দুর সাথে সাথে আরবীতেও লিখব- কারণ এ ফিরকাটি তার সকল ধ্যান-ধারণা, আকীদা-বিশ্বাস এবং মতবাদসহ অন্যান্য মুসলিম দেশেও অঞ্চলভিত্তিক ভিন্ন ভিন্ন স্থানীয় রং-এ বিভিন্ন নামে অবস্থান করছে।

যারা মুসলিমদের বিষয়াদিতে জড়িত এবং তাদের সংস্কারে নিয়োজিত এবং যারা ইসলামী কর্মক্ষেত্রে কাজ করতে চায় এবং শিরক, বিদআত, সঠিক পথ থেকে বিচ্যুতি ইত্যাদির বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার জন্য ভয়ানক অস্ত্রে সুসজ্জিত হতে চায়, তারা মন্দ কামনা-কুবাসনার অনুসারীদের বাতিল-মিথ্যা আকীদা এবং প্রতারকদের যুক্তির সাথে পরিচিত হওয়ার মাধ্যমে এ বই থেকে উপকৃত হবে। অনুরুপভাবে, সাধারণ পাঠকরাও তাদের গ্রন্থ ও পুস্তিকাদিতে লুকায়িত সত্য ও গোপন বিষয়াদির সাথে পরিচিতির দ্বারা উপকৃত হবে।

এটা অপরিহার্য্য যে, আমাদের কে আল্লাহর কিতাব ও তাঁর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর সুন্নাহর প্রতি প্রত্যাবর্তন এবং এর আলোকে আমাদের আকীদা বিশ্বাস সংশোধনের মাধ্যমে ঐক্যবদ্ধ হতে হবে এবং আমাদেরকে অতি গোঁড়ামী, (কুরআন-সুন্নাহর পরিবর্তে অন্যান্য) লোকদের কথা বা বাণী এবং সুফীদের তরীকা ও তাদের অন্ধবিশ্বাসসমূহে দৃঢ়ভাবে লেগে থাকাকে পরিত্যাগ করতে হবে। উল্লেখ্য যে, শুরুতে এবিষয়গুলো খুব হালকা ও সহজ মনে হয়, কিন্তু অবশেষে এগুলো ইসলাম এবং এর শিক্ষা ও পদ্ধতি থেকে পথভ্রষ্টতার দিকে নিয়ে যায়। পাঠক এ বিষয়গুলোর বিস্তারিত বিশ্লেষণ এ বইতে পাবেন।

এ বই লিখতে আমার সর্বাত্মক প্রচেষ্টা নিয়োগ করেছি এবং বোধ ও জ্ঞান শূন্য ৩০০'র ও বেশি পুস্তিকা ও গ্রন্থ পড়ার আপ্রান চেষ্টা করেছি। এ বিষয়ে যে জড়িত রয়েছে কেবল সে ব্যক্তিই এ বিষয়টি সবচেয়ে ভাল বুঝবে। কিন্তু যখন আমি নিজের জন্য অপরিহার্য্য করে নিলাম যে, যে ফিরকার খণ্ডন করতে যাচ্ছি তাদের উৎসসমূহ হতে এ বইয়ের প্রত্যেকটি বিষয় উল্লেখ করব, আমার জন্য জরুরী হলো আমার ধৈর্য্য ও অধ্যবসায় থাকা। আমি বিশ্বাস করি আল্লাহ আমাকে এর বিনিময় দেবেন।

আমাকে লিখতে দিন যে, কিছু মুদ্রণ ভ্রম ও যত্নের অভাব সত্ত্বেও এ বইটি এত সুন্দর সাজে প্রকাশিত হতে পারতো না- যদি না মদীনা ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের আমার কিছু শুভানুধ্যায়ী ও শিক্ষক এবং এখানকার কর্তৃপক্ষ এর দায়িত্ব না নিতেন।

তাঁদের প্রত্যেকেই আমাকে দিতে চেষ্টা করেছেন আমার কিসের প্রয়োজন এবং এমনকি আমার কি প্রয়োজন নেই। তাদের প্রচেষ্টার ফলে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর শহরের একটি প্রেসে এ বইটি মুদ্রণ আমার জন্য সম্ভব হয়েছে। আমি এ সকল জালিমদের বিরুদ্ধে জিহাদ করছি এবং তাদের আক্রমণ করছি সুন্নাহকে সমুন্নত করা ও তাঁর শিক্ষাকে সংরক্ষণ করার উদ্দেশ্যে। আমার কৃতজ্ঞতা রইল মদীনায় মাতাবি'-আর রাশীদ এর ভাইদের প্রতি যারা এ কাজটি অতি সংক্ষিপ্ত সময়ে সম্পন্ন করার জন্য সর্বোচ্চ প্রচেষ্টা করেছেন। আল্লাহ তাঁদের সবাইকে পুরস্কৃত করুন।

মধ্যরাত্রিতে বিশ্বের পবিত্র স্থানে মসজিদে নববীর সম্মুখে আমি যে মুহূর্তে এ লাইন কয়টি লিখছি, এ মুহূর্তে নিজেকে খুব গর্বিত অনুভব করছি। আমি আশা করি যে, সর্বশক্তিমান আল্লাহ আমার এ বিনীত খেদমত আমার থেকে গ্রহণ করবেন এবং তাঁর নিজের জন্য একে খালিস ও পবিত্র করবেন এবং তাঁর একত্ব, মুখাপেক্ষীহীনতা, ক্ষমতা এবং মহত্ত্বকে রক্ষা করতে এবং তাঁর মনোনীত পুরুষ, নবী মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর সুন্নাহকে সংরক্ষণ করতে আমাকে সাহায্য করবেন, যতক্ষণ আমি জীবিত থাকি, যতক্ষণ আমার হাত নড়াচড়া করে, আমার জিহবা কথা বলে এবং হৃৎপিণ্ড স্পন্দিত হয়। তিনি সর্বশ্রোতা ও কবুলকারী। আল্লাহ তা'আলার শান্তি ও রহমত বর্ষিত হোক সাইয়্যেদিনা মুহাম্মদ খাতামান নাবিয়্যিন ওয়া সাইয়্যেদুল মুরসালীন ওয়া ইমামুল মুত্তাকীন-এর উপর এবং তাঁর সাহাবীগণ, যাদের ললাট আলোকিত এবং যারা পবিত্র, তাঁদের উপর এবং তাঁদের অনুসারী (তাবিঈ) গণের উপর এবং কিয়ামত পর্যন্ত যারা পুরোপুরি তাঁদের অনুসরণ করেন এবং যারা দীনের মধ্যে নতুন (বিদআত) সৃষ্টিকারী নন, তাদের উপর।

ইহসান ইলাহী যহীর

আল-মদীনা আল মুনাওয়ারাহ্, বৃহস্পতিবার রাত্রি, ২৩ শে মার্চ, ১৯৮৩।

১২ই জুমাদাল আখিরাহ, ১৪০৩ হিজরী

প্রথম অধ্যায়

বেরেলভী মতবাদঃ ইতিহাস এবং এর প্রতিষ্ঠাতা

১. বেরেলভী মতবাদের ইতিহাস এবং এর প্রতিষ্ঠাতা আহমাদ রেযাঃ

পাকিস্তানে হানাফী মাযহাবের অনুসারী অনেকগুলো ফিরকার মাঝে বেরেলভী একটি ফিরকা। যে সকল আকীদাকে বেরেলভীরা আঁকড়ে ধরে আছে, সে আকীদাসমূহ বেরেলভী মতবাদের অনুসারীগণের মুজাদ্দিদ, আহমাদ রেযা বেরেলভী কর্তৃক রচনা করা ও তা সুবিন্যস্ত করার কাজ সম্পাদিত হয়েছে। বেরেলভী নামকরণের পিছনে কারণও সেটাই।

জনাব আহমাদ রেযা ভারতের উত্তর প্রদেশের 'বেরেলী' শহরে[১] জন্মগ্রহণ করেন।[২]

বেরেলভীরা ছাড়াও হানাফী মাযহাবের অন্যান্য ফিরকার মধ্যে দেওবন্দী, নাদাবী, তাওহীদী ইত্যাদি।

বেরেলভীদের নেতা, তাদের মুখপাত্র, নির্মাতা ও প্রতিষ্ঠাতা আহমাদ রেযা একটি শিক্ষিত পরিবারে জন্মগ্রহণ করে। তার পিতা নক্বী আলী এবং তার দাদা রেযা আলী উভয়কে হানাফীদের মধ্যে খ্যাত আলেম হিসেবে বিবেচনা করা হত।[৩]

তিনি ১৪ই জুন, ১৮৬৫ খ্রিষ্টাব্দে, ১০ শাওয়াল, ১২৭২ হিজরীতে জন্মগ্রহণ করেন।[৪] তার নাম রাখা হয় মুহাম্মাদ। তার মা তার নাম রাখেন আম্মান মিয়া। তার পিতা তার নাম রাখে আহমাদ মিয়া এবং তার দাদা তার নাম রাখে আহমাদ রেযা।[৫]

কিন্তু জনাব আহমাদ রেযা এ সকল নামের কোনোটাতেই সন্তুষ্ট ছিলেন না এবং (তাই) তিনি নিজের নাম রাখেন 'আব্দুল মুস্তফা'।[৬]

---

[১] দায়িরাহ আল মা'আরিফ ৪র্থ খণ্ড, পৃ-৪৮৭

[২] 'আলা হযরত বেরেলভী, বাস্তাওয়ী পৃ-২৫, আরও দেখুন, হায়াত আলা হযরত, জাফরুদ্দীন বিহারী রিযভী, করাচীতে প্রকাশিত।

[৩] তাযকিরাতু উলামায়ে হিন্দ, পৃ-৬৪।

[৪] হায়াত আলা হযরত, জাফররুদ্দীন বিহারী রিযভী, ১ম খণ্ড, পৃ- ১।

[৫] আলা হযরত, বাস্তাওয়ী, পৃ-২৫।

[৬] দ্রষ্টব্যঃ মান হুয়া আহমাদ রেযা, শুজা'আত কাদরী, পৃ-১৫।

আর সে তার লেখনী ও চিঠি পত্রে এ নাম ব্যাপকভাবে ব্যবহার করে। তার গায়ের রং ছিল অত্যন্ত কালো। তার চেহারা কৃষ্ণবর্ণ হওয়ার কারণে তার বিরোধিরা প্রায়ই তাকে ঠাট্টা-বিদ্রূপ করতো। তার বিরুদ্ধে লেখা একটি বইয়ের নাম দেয়া হয়েছিল "(আত তীনুল লাযিব আলা আসওয়াদিল কাযিব (কৃষ্ণকায় মিথ্যাবাদীর চেহারার ময়লা)"।[৭]

তার ভ্রাতুষ্পুত্রও একথা সত্য বলে দৃঢ়ভাবে সমর্থন করেছে। সে লিখেছে, "জীবনের প্রারম্ভে তার গায়ের রং ছিল উজ্জ্বল শ্যামলা। কিন্তু অবিরাম কাজ ও শারীরিক পরিশ্রম তার রং এর উজ্জ্বলতা ও দীপ্তি বিদূরিত করে দেয়।[৮]

জনাব আহমাদ রেযা হাল্কা-পাতলা গড়নের ছিল।[৯] সে কিডনীর ব্যথা ও অন্যান্য রোগে ভুগছিল যা তাকে দুর্বল করে দিয়েছিল।[১০] তার পিঠে বিরামহীন ব্যথা ছিল।[১১]

অনুরূপভাবে সে প্রায়ই মাথা ব্যথা ও জ্বরে আক্রান্ত হত।[১২] তার ডান চোখে ত্রুটি ছিল। তা সর্বদা রোগে আক্রান্ত হতো এবং অবিরাম পানি পড়ার ফলে তার দৃষ্টিশক্তি হারিয়ে যায়। দীর্ঘদিন যাবৎ সে এর চিকিৎসা করে কিন্তু তা আর সারেনি।

একবার তার সামনে খাবার রাখা হয়। সে খাবার খেল কিন্তু 'চাপাতি'[১৩] স্পর্শও করল না। তার স্ত্রী তাকে জিজ্ঞাসা করল, "ব্যাপার কি? আপনি কেবল ভাতই খেলেন কেন? চাপাতি খেলেন না কেন?" সে জবাবে বলল যে, সে তা দেখতে পায়নি। যদিও সেগুলো খাবারের পাশেই রাখা ছিল।[১৪]

জনাব বেরেলভী স্মৃতিভ্রমে কষ্ট পান। তার স্মৃতি দুর্বল হয়ে যায়। এমনকি তাকে তার ছাত্র ও মুরীদরা যা বলতো তা তিনি ভুলে যেতেন। তার অভ্যাস

---

[৭] এ বইয়ের লেখক মাওলানা মুর্তজা হাসান দেওবন্দী।

[৮] আলা হযরত, বাস্তাওয়ী, পৃ-২০

[৯] হায়াত আলা হযরত, জাফরুদ্দীন বিহারী রিযভী, ১ম খণ্ড, পৃ- ৩৫

[১০] মাজমূন হাসনাইন রাযা দারজ শাদাহ্ আলা হযরত বেরেলভী, পৃ- ২০-২১ দ্রষ্টব্য।

[১১] 'আলা হযরত, বাস্তাওয়ী, পৃ-২৮।

[১২] মালফুযাত আলা হযরত, পৃ-৬৪

[১৩] চাপাতি: গমের তৈরি এক ধরনের ভাজা রুটি।

[১৪] আনোয়ার রেযা, পৃ-৩২০।

অনুযায়ী পড়া ও লেখার সময় চশমা ব্যবহার করতেন। তার দৃষ্টিশক্তি দুর্বল থাকায় চশমা ছাড়া লিখতে ও পড়তে পারতেন না। কখনো কখনো তিনি তার চশমাকে কপালে রাখতেন। এরকমই একদিন লেখার সময় কিছু লোক তার নিকট আসে। তিনি তার চশমা কপালে রাখেন ও তাদের সাথে কথা বলায় ব্যস্ত হয়ে যান। পুনঃরায় যখন লেখার ইচ্ছে করেন তখন তিনি তার চশমা খুঁজতে লাগলো। সে চশমাটি খুঁজে পাচ্ছিল না এবং সে ভুলে গিয়েছিল যে, সেটি সে তার কপালে রেখেছে। তিনি হয়রান ও দিশেহারা হয়ে হাত দিয়ে মুখ মুসতে গিয়ে তার হাত কপালে লাগে এবং চশমাটি তার নাকের উপর যথাস্থানে পড়ে। অতঃপর সে বুঝতে পারলো যে চশমাটি তার কপালেই ছিল।[১৫]

একবার সে দ্রুত সংক্রামক প্লেগ রোগে আক্রান্ত হয়েছিল এবং রক্ত বমি করেছিল।[১৬]

সে বদ মেজাজী ছিল।[১৭] সে খুব দ্রুত রেগে যেত। তার মুখের ভাষার ব্যাপারে সে ছিল অতি অসতর্ক।[১৮]

সে অহরহ অভিশাপ দিত এবং বিদ্রূপ করতো। সে ব্যাপকভাবে অশ্লীল ভাষা ব্যবহার করতো। এ ব্যাপারে সে মাঝে মাঝে সীমা ছাড়িয়ে যেত এবং এমন কথা বলতো যে, তার মুখ থেকে যা বের হতো তা কোনো জ্ঞানী ব্যক্তির জন্য শোভা পায়না, এমনকি কোনো সাধারণ লোকের জন্যও নয়।

তার এক অনুসারী ও বলতে বাধ্য হয়েছে যে, "তিনি তার বিরোধিদের প্রতি অতি কঠোর মেজাজী ছিলেন এবং এক্ষেত্রে তিনি শারঈ সীমালংঘন করে যেতেন।[১৯]

এ হলো সেই কারণ যার জন্য লোকজন তার প্রতি ঘৃণা পোষণ করতে শুরু করেছিল। তার এ অভ্যাসের জন্য তার ভাল বন্ধুদের অনেকেই তাকে পরিত্যাগ করেছিল। তাদের মধ্যে রয়েছে মৌলভী মুহাম্মদ ইয়াসীন, যিনি

[১৫] হায়াত আলা হযরত, পৃ-৬৪।

[১৬] প্রাগুক্ত, পৃ-২২।

[১৭] আনোয়ার রেযা, পৃ- ৩৫৮।

[১৮] আল-ফাযিল আল-বেরেলভী, মাসুদ আহমাদ, পৃ-১৯৯।

[১৯] মুকাদ্দিমাহ মুকালাত রেযা, কুতাব, পৃ-৩০ লাহোরে প্রকাশিত।

মাদ্রাসা 'ইশা'আতুল উলুম'-এর অধ্যক্ষ ছিলেন এবং যিনি আহমাদ রেযা কর্তৃক তার শিক্ষক হিসেবে গণ্য হতেন। এমনকি তিনিও তাকে পরিত্যাগ করেন।[২০]

আর তার পর সে 'মিসবাহ উত-তাহযীব' মাদরাসার উপর তার প্রভাব হারাতে থাকলো, যেটি তার পিতা কর্তৃক নির্মিত হয়েছিল। তার বিকৃত বুদ্ধি, বদমেজাজ, রূঢ় ভাষা এবং মুসলিমদের তাকফীর করা[২১] এবং এর ব্যবস্থাপনা করা তাকে আলাদা করে দেয়। (এখানে কয়েকটি শব্দ বাদ দেয়া হয়েছে)। এ অবস্থা এমন পর্যায়ে পৌঁছেছিল যে, বেরেলভীয়্যার কেন্দ্রে আহমাদ রেযার দলের সাথে একটি মাদরাসা ও আর অবশিষ্ট ছিল না। তা সত্ত্বেও 'আলা হযরত তার সকল কার্যক্রম সহ সেখানে উপস্থিত ছিল।[২২]

বেরেলভীদের বিষয় হলো, তারপর অন্যান্য বাতিল ফিরকার মত তাদের ইমামগণের ও আকীদার শ্রেষ্ঠত্ব বর্ণনার সময় তারাও অনেক মিথ্যা কাহিনী ও ভিত্তিহীন গল্প উদ্ভাবন করল। তারা লক্ষ্য করেনি যে, যে মিথ্যাসমূহ তারা উদ্ভাবন করেছে, তা তাদের মর্যাদা ও শা'ন উন্নত করার পরিবর্তে তাদের মর্যাদাহানীর বা তাদেরকে উপহাসের পাত্র বানানোর কারণ হবে।

ফলে তার (আহমাদ রেযা) সম্পর্কে বলা হয় যে, "তার বুদ্ধিমত্তা/ মেধা এবং ধীশক্তি এমন ছিল যে, যখন তার বয়স মাত্র ৪ বছর, যখন অন্যান্য শিশুরা তাদের নিজেদের প্রতি খেয়ালই করে না, সে সময় তিনি পুরো কুরআন পড়া শেষ করেছিলেন। প্রচলিত 'বিসমিল্লাহ খাওয়ানি'র অনুষ্ঠান উপলক্ষে একটি ঘটনা ঘটেছিল, যা লোকদেরকে (একই সাথে) বিস্মিত এবং ব্যথিত করেছিল। তাকে 'বিসমিল্লাহির রহমানীর রহীম' শিখানোর পর তার উস্তাদ তাকে 'আলিফ' 'বা' 'তা' শিখানো শুরু করলেন। 'লাম আলিফ' বলার সময় যখন 'লাম' এলো, তখন সে চুপ করে থাকল। শিক্ষক তাকে পুণরায় বললেন, "বল, 'লাম আলিফ'।" তখন হুজুর (আহমাদ রেযা) বলল, "আমরা তো ইতোমধ্যে এগুলো পড়েছি, তবে পুনরাবৃত্তি কেন? এ কথা শুনে তার দাদা শ্রদ্ধেয় মাওলানা রেযা আলী খাঁন সাহেব বললেন, "হে বৎস! শিক্ষককে মান্য কর।" হুজুর তার দিকে তাকালো। তার দাদা ইলহামের মাধ্যমে জানতে পারলেন যে, এটি যে হুরুফে মুফারিদাহ'র[২৩] বর্ণনা সে সম্পর্কে এ বালকের সন্দেহ রয়েছে। তাহলে

---

[২০] হায়াত আলা হযরত, পৃ-২১১

[২১] তাকফীর: মুসলিমদের কাফির ঘোষণা দেয়া।

[২২] প্রাগুক্ত, পৃ-২১১।

[২৩] সরল বা একক, যৌগিক নয়।

এর মধ্যে মুরাক্কাব[২৪] অক্ষর কেন? বালকের বয়সের দিকে লক্ষ্য করে দাদা ভাবলেন যে, এ বালকটি ধীশক্তি ও জ্ঞানের সূর্য হিসেবে বেড়ে উঠতে যাচ্ছে এবং বিশ্বের দিগন্ত সীমা পেরিয়ে যাবে। ফলে তিনি বললেন, "হে বৎস! তোমার কথা ঠিক। কিন্তু আসলে যে 'আলিফ' টি তুমি পূর্বে পড়ে এসেছ, সেটি ছিল একটি 'হামযাহ' এবং আসলে এটিই হলো 'আলিফ'। কিন্তু 'আলিফ' সর্বদা 'সাকিন হয় এবং যেহেতু শুরুতে 'সাকিন' হওয়া সম্ভব নয়, এজন্য 'লাম' অর্থের একটি অক্ষর এর সম্মুখে নিয়ে আসা হয়েছে এবং এর সম্পূর্ণ করা বা সমাপ্ত করাই এর উদ্দেশ্য।" অতঃপর এর জবাবে হুজুর বললেন, যেকোনো অক্ষরই যখন এর জন্য যথেষ্ট হতো, তখন নির্দিষ্টভাবে 'লাম' এলো কেন? 'বা' 'তা' 'দাল' কিংবা 'সীন' ও শুরুতে ব্যবহার করা যেতো।" দাদা তাকে আনন্দের আতিশয্যে জড়িয়ে ধরলেন এবং তার জন্য অন্তর থেকে দুআ করলেন। অতঃপর বললেন, "'লাম' এবং 'আলিফে'র মাঝে আপাতভাবে এক বিশেষ সম্পর্ক রয়েছে এবং প্রকাশ্যভাবে বা খোলাখুলিভাবে এ উভয়ের লেখার সময় আকৃতি সাদৃশ্যপূর্ণ হয়। 'লা' অথবা 'আল' এর কারণ হলো 'লাম' এর 'কালব'[২৫] হলো 'আলিফ' এবং 'আলিফ' এর কালব হলো 'লাম'।

এ অর্থহীন কাহিনীটি বিশ্লেষণ করুন! চিন্তা করুন, 'আহমাদ রেযার মেধা ও যোগ্যতা প্রমাণ করতে কী ধরনের জ্ঞান ভিত্তিক যুক্তি এবং অদ্ভুত নিয়ম-কানুন ও বিধি-বিধানকে ভিত্তি হিসেবে ব্যবহার করা হচ্ছে।

এমনকি আরবী ভাষা ভাষী কোনো লোকেরও এরূপ পুরোপুরি উদ্ভট অযৌক্তিক নিয়ম বোঝার এবং ব্যাখ্যা করার যোগ্যতা নেই। কিন্তু এ সকল আযমী (অনারবী)'রা 'লাম' ও 'আলিফ' এর আকার-আকৃতি ও প্রকৃতির উপর ভিত্তি করে সেগুলোর মাঝের উদ্ভট সম্পর্কটি বুঝে ফেলেছে এবং তা ব্যাখ্যাও করেছে!!

আসলে এই বেরেলভীরা শুধু যে তাদের ইমাম ও নবী রাসূলগণের মাঝে সাদৃশ্যের ধারণা দিতে চায়, তা-ই নয়, বরং তারা তাদের ইমামদেকে নবী রাসূলগণেরও উপরে প্রাধান্য দিতে চায়। আর তারা একথা প্রতিষ্ঠা করতে চায় যে, তাদের ইমাম ও প্রতিষ্ঠাতা অন্যকারো থেকে জ্ঞান অর্জনের মুখাপেক্ষী ছিল না। বরং আল্লাহ তার অন্তরকে জ্ঞান-বিজ্ঞানের কেন্দ্র বানিয়েছেন। আর এসব জ্ঞান তার প্রতি ওহী করা হয়েছে।

---

[২৪] যৌগিক।

[২৫] আনুভূমিকভাবে কিংবা খাঁড়াভাবে বাঁকানো।

এ বিষয়টি নাসিম বাস্তাওয়ীর বিবরণী থেকেও ব্যাখ্যা করা যেতে পারে, যেখানে তিনি লিখেছেন, “আল্লাহ আপনার অন্তরকে সৃষ্টি করেছেন, তাকে জ্ঞান-বিজ্ঞানের ভাণ্ডার বানিয়েছেন। আপনার মন, মস্তিষ্ক ও অন্তরকে ঈমান ও ইখলাসের এবং পবিত্র অনুভূতি ও চিন্তায় পরিপূর্ণ ও সমৃদ্ধশালী করেছেন এবং আয়না বানিয়েছেন। কিন্তু যেহেতু প্রত্যেক মানুষকে দুনিয়াতে কাজকর্ম করতে হয় ও সম্পর্ক রক্ষা করতে হয়, এজন্য বাহ্যিকভাবে আহমাদ রেযাকে জ্ঞান চর্চার পথে বের হতে হয়েছিল।[২৬]

এ দ্বারা বোঝা যায় যে, বাহ্যিকভাবে জনাব আহমাদ রেযা সাহেব তার শিক্ষকের নিকট জ্ঞান আহরণ করেছিল, কিন্তু আসলে এর কোনো প্রয়োজন তার ছিল না, কারণ তার শিক্ষক স্বয়ং আল্লাহ!

জনাব বেরেলভী তার নিজের সম্পর্কে লিখেছে, “মাথা ব্যথা ও জ্বর হলো সেই বরকতপূর্ণ রোগ যা নবী আলাইহিমুস সালামগণের হতো।” আরো সামনে এগিয়ে সে লিখেছে, আলহামদু লিল্লাহ যে, আমারও বারবার জ্বর ও মাথাব্যথা হয়েছে।”

জনাব আহমাদ রেযা এ চিত্র ফুটিয়ে তুলতে চেয়েছেন যে, তার দৈহিক অবস্থা ও নবীগণের দৈহিক অবস্থার মধ্যে মিল রয়েছে। তার পবিত্রতা প্রমাণ করতে সে লিখেছে, “আবজাদী পদ্ধতিতে আমার জন্ম তারিখ কুরআনের সেই আয়াত হতে এসেছে যেখানে বলা হয়েছে

أُولَئِكَ كَتَبَ فِي قُلُوبِهِمُ الْإِيمَانَ وَأَيَّدَهُمْ بِرُوحٍ مِنْهُ

এরাই, যাদের অন্তরে আল্লাহ ঈমান লিখে দিয়েছেন এবং তাঁর পক্ষ থেকে রূহ দ্বারা তাদের শক্তিশালী করেছেন।”[২৭],[২৮]

আবার, তার অনুসারী কর্তৃক তার শিশুকাল সম্পর্কে লেখা হয়েছে, যখন তার বয়স চার বছরের কম ছিল, “তার শিক্ষক একটি নির্দিষ্ট আয়াতে বারবার ‘ফাত্‌হাহ্’ (যবর) দিয়ে পড়ছিলেন এবং সে কাস্‌রাহ (যের) দিয়ে পড়ছিল। এ দেখে তার দাদা তাকে ডাকলেন এবং কুরআনের মুসহাফ চাইলেন। দেখলেন যে, মুসহাফে হারকাতে ভুল আছে। অর্থাৎ হুজুর সাইয়্যেদীর মুখ থেকে যে কাসরাহ’ বের হচ্ছিল, তা সঠিক ছিল; এবং তখন তিনি তাকে

[২৬] আনোয়ার রেযা, পৃ-৩৫৫; বাস্তাওয়ী, পৃ-২৭

[২৭] (সূরা মুজাদালাহ ৫৮:২২)

[২৮] হায়াত আলা হযরত, বিহারী পৃ-১।

জিজ্ঞেস করলেন, "তুমি কেন সেভাবে তেলাওয়াত করছ না যেভাবে মৌলভী সাহেব তেলাওয়াত করছেন? তিনি জবাবে বলেন, "তিনি যেভাবে তেলাওয়াত করছেন আমিও সেভাবে তেলাওয়াত করার ইচ্ছা করছি কিন্তু আমি আমার জিহবাকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারছি না।"[২৯]

ফলাফল হলো ' আহমাদ রেযা ' "ভুল-ত্রুটি হতে রক্ষিত"- এর স্থান অর্জন করেছেন তার শিশুকাল থেকেই। বেরেলভীরা যে শুধু এমন ঘটনা বর্ণনার মাধ্যমে উপসংহারে পৌঁছতে চান, তাই নয় বরং তারা তাদের ইমাম ও প্রতিষ্ঠাতার ব্যাপারে পরিষ্কারভাবে তাদের এ আকীদার ঘোষণা দিয়েছে। অনুরূপ আব্দুল হাকীম কাদরী লিখেছে, "আহমাদ রেযার কলম এবং জিহবা সকল প্রকার বিচ্যুতি ও ভুল হতে রক্ষিত, যদিও জানি যে, একজন আলিম সর্বদা কোনো না কোনো প্রকারের ভুলের মধ্যে পতিত হন, কিন্তু আহমাদ রেযা থেকে একটি ক্ষেত্রেও এমনকি একটি ভুলও সংঘটিত হয়নি।"[৩০]

অপর একজন লিখেছেন, "আহমাদ রেযা বেরলভী তার মুখ দিয়ে কখনো শরীয়া বিরোধী কোনো কথা উচ্চারণ করেননি। আল্লাহ তাকে সকল প্রকার বিচ্যুতি ও ভুল থেকে হেফাজত করেছেন।"[৩১]

আবার, "আহমাদ রেযা শিশুকাল হতেই ভুল-ত্রুটি হতে মুক্ত। সরল পথের অনুসরণ তার মধ্যে একটি বিশ্বস্ততা তৈরি করেছে।"[৩২]

'আনওয়ার রেযা'-র লেখক এতে লিখেছেন, "আল্লাহ তার কলম ও মুখকে সকল প্রকার ভুল থেকে মুক্ত রেখেছেন।"[৩৩]

আরও বলা হয়েছে: "আহমাদ রেযা গাওসে আযমের হাতে তেমনি, একটি কলম একজন লেখকের হাতে যেমন এবং গাওসে আযম রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর হাতে তেমনি, একটি কলম একজন লেখকের হাতে যেমন। আর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ওহী ব্যতীত নিজের থেকে কোনো কথা বলতেন না।"[৩৪]

---

[২৯] বাস্তাওয়ী, পৃ-২৮; হায়াত আলা হযরত, পৃ-২২।

[৩০] ইয়াদ আলা হযরত, আবদুল হাকীম শরফ আলকাদরী, পৃ-৩২

[৩১] মুকাদ্দমা আল-ফতোয়া আর-রিয্ভীয়া, ২য় খণ্ড, পৃ-৫, মুহাম্মদ আসগর আলী

[৩২] আনওয়ার রেযা, পৃ-২২৩

[৩৩] প্রাগুক্ত, পৃ-২৭১।

[৩৪] প্রাগুক্ত, পৃ- ২৭০।

আহমাদ রেযা সম্পর্কে একজন বেরেলভী লেখক বলেন-

"আল্লাহর সন্তুষ্টি আল্লাহর রসূলের সন্তুষ্টিতে

রসূলের সন্তুষ্টি বেরলভীর সন্তুষ্টিতে।"[৩৫]

অপর একজন অনুসারী লিখেছে: "আহমাদ রেযার আবির্ভাব আল্লাহর নিদর্শনাবলি হতে একটি অন্যতম নিদর্শন।"[৩৬]

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর সাহাবীগণের বিদ্রুপকারীদের একজন তার ইমাম ও পীর সম্পর্কে লিখেছে, "আহমাদ রেযার যিয়ারত (সাক্ষাত) সাহাবাগণের যিয়ারতের আকাঙ্ক্ষা কমিয়ে দিয়েছে।"[৩৭]

এসব বাতিল বাড়াবাড়ি করতে তারা মিথ্যা কল্পকাহিনী তৈরি করেছে, এগুলো মিথ্যা ছাড়া কিছুই নয়। বেরেলভীর এক অনুসারী এ বিষয়ের প্রমাণ দিতে গিয়ে লিখেছে: "একদা মাত্র সাড়ে তিন বছর বয়সে (তিনি) তার মসজিদের নিকটে উপস্থিত ছিলেন এবং আরবীয় পোশাকে একজন লোক এলেন এবং আরবীতে তার সাথে কথা বললেন। তিনি তার সাথে অনর্গল আরবীতে কথা বললেন। তারপর তাকে (আরবী পোশাক পরা লোকটিকে) আর কখনও দেখা যায়নি।"[৩৮]

অপর একজন লিখেছে: "একদিন তার শিক্ষক বললেন, হে আহমদ! তুমি কি মানুষ, না জ্বিন! তোমার কাছে আসতে আমার সময় লাগে, কিন্তু তোমার শিখতে কোনো সময়ই লাগে না। ১০ বছর বয়সে, তার বাবাও তাকে শিক্ষা দিতেন। তিনি বলেন "তুমি আমার কাছ থেকে শিক্ষা নিও না, বরং (আমাকে) শিক্ষা দাও।"[৩৯]

এখানে উল্লেখযোগ্য যে, তার শিক্ষক মির্জা গোলাম কাদের বেগ গোলাম আহমদ কাদিয়ানীর ভাই ছিল।[৪০]

---

[৩৫] বাগে ফেরদৌস, আইয়ুব রিজভী, পৃ-৭

[৩৬] আনওয়ার রেযা, পৃ-১০০।

[৩৭] ওসীয়াত শরীফ, পৃ-২৪।

[৩৮] হায়াতে আলা হযরত, বিহারী, পৃ-২২।

[৩৯] মুকাদ্দিমা ফাতোয়া রিযভিয়া, ২য় খণ্ড, পৃ-৬।

[৪০] বাস্তাওয়ী, পৃ-৩২।

বাস্তাওয়ী সাহেব তার ইমামের শ্রেষ্ঠত্ব বর্ণনা করে লিখেন, "তিনি ১৪ বছর বয়সে ডিগ্রী এবং দাস্তর[৪১] -এর সম্মান অর্জন করেন এবং একইদিনে তিনি তার সম্মানিত পিতাকে একটি দুধপানের মাস্‌আলার উত্তর প্রদান করেন। আর উত্তরটি সম্পূর্ণ সঠিক ছিল। এ থেকে তার সম্মানিত পিতা তার বুদ্ধিমত্তা ও তার মেধার পরিচয় পেয়েছিল এবং সেই দিন থেকে তিনি ফতোয়া প্রদানের দায়িত্ব নেন।"

এর পূর্বে তার ৮ বছর বয়সে উত্তরাধিকার প্রসঙ্গে একটি জওয়াব লিখেন। যা ঘটেছিল তা হলো, তার সম্মানিত পিতা শহরের বাইরে ছিলেন, একটি প্রশ্ন এসেছিল এবং তিনি এর জওয়াব দিয়েছিলেন। তার সম্মানিত পিতা ফিরে আসার পর তিনি তাকে এটা দেখিয়েছিলেন। এটি দেখে তিনি বলেছিলেন, মনে হচ্ছে উত্তরটি আম্মান মিয়া কর্তৃক লেখা হয়েছে। তার এত আগেই লেখা উচিত নয়। কিন্তু একই সময়ে তিনি মন্তব্য করেছিলেন যে, যদি কোনো মুরব্বী এমন উত্তর লিখত তবে এটি যথাযোগ্য হতো।"[৪২]

এ বক্তব্য প্রমাণ করে যে, আলা হযরত ৮ বছর বয়সেই ফতোয়া দেওয়া শুরু করেছিলেন, কিন্তু আহমাদ রেযা নিজে লিখেন, "আমি ১ম ফতোয়াটি দেই ১২৮৬ হিজরীতে যখন আমার বয়স ছিল ১৩ বছর এবং একই দিনে সালাত এবং অন্যান্য আহকাম আমার উপর ফরয হয়েছিল।"[৪৩]

এর মানে বাস্তাওয়ী সাহেব বলছেন যে, আহমাদ রেযা মাত্র ৮ বছর বয়সে উত্তরাধিকারের মত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে ফতোয়া দেয়া শুরু করেছিল কিন্তু 'আহমাদ রেযা' নিজেই তার বিরোধিতা করেছে এবং বলেছে যে, ১৩ বছর বয়সে সে প্রথম ফতোয়া দেয়।

আরো অসম্ভব হলো বেরেলভীরা দাবি করে যে, সে তার লেখাপড়া শেষ করে এবং সে তার 'সনদ ফারেগাহ' (ফাইনাল ডিগ্রী) অর্জন করে যখন তার বয়স মাত্র ১৪ বছর।[৪৪]

আরো অনেক বার তারা নিজেরাই মতবিরোধ করেছে এবং তাই "হায়াতে আলা হযরত"- এর লেখক জাফরুদ্দীন বিহারী লিখেছে, "আহমাদ রেযা

---

[৪১] দাস্তর: (আলিমকে তার মাথায় পাগড়ী পড়ানোর দ্বারা সম্মানিত করার অনুষ্ঠান)।

[৪২] আলা হযরত বেরেলভী, পৃ-৩২।

[৪৩] আলা হযরত বেরেলভী, পৃ-৩২।

[৪৪] হায়াতে আলা হযরত, বিহারী, পৃ-৩৩ দ্র. আরও দেখুন, আনওয়ার রেযা, পৃ-৩৫৭ এবং অন্যান্য।

মাওলানা আব্দুল হক খারাবাদি থেকে কিছু বিশেষ জ্ঞান শিখতে চেয়েছিলেন কিন্তু তিনি তাকে শেখাতে রাজি হননি। তিনি কারণ উল্লেখ করেছেন যে, আহমাদ রেযা তার বিরোধিদের উপর রূঢ় ভাষা প্রয়োগ করেন।"[৪৫]

বাস্তাওয়ী বলেন যে, যখন এ ঘটনা ঘটেছিল, তার বয়স তখন ২০ বছর।[৪৬]

অনুরূপভাবে বেরেলভী সাহেবের এক অনুসারী লিখেছে, " আহমাদ রেযা সাইয়েদ আর রাসুল শাহ-এর সম্মানিত ছাত্র হয়েছিলেন ১২৯৪ হিজরীতে এবং তার কাছ থেকে হাদীসের উপর সনদ এবং অন্যান্য জ্ঞান লাভ করেছিলেন।[৪৭]

জাফর বিহারী সাহেব বলে, তিনি সাইয়্যেদ আর রাসুল শাহ'র পুত্র আবুল হুসাইন আহমেদের নিকট হতে অনেক (বিষয়ে) জ্ঞান লাভ করেছিলেন ১২৯৬ হিজরীতে।[৪৮]

যাহোক, একদিকে বেরেলভীরা ফুটিয়ে তুলতে চেয়েছে যে, আহমাদ রেযা তের বা চৌদ্দ বছর বয়সে তার পড়ালেখা শেষ করে এবং অপরদিকে তারাই আবার এ বিষয়ে মতবিরোধ করে। এখন কে না জানে যে, ১২৭২ হিজরীতে যখন আহমাদ রেযা জন্মগ্রহণ করে, তখন থেকে ১২৯৬ হিজরী ২৬ বছর সময়। যদি ১২৯৬ হিজরীতে তখনও সে কিছু জ্ঞান অর্জন করতে থাকে, তবে এর দ্বারা কী বুঝায় যে, যখন তার বয়স ১৪ বছর তখন সে তার সনদে ফারেগাহ লাভ করে? কিন্তু কোনো একজন ব্যক্তি বেশ আগে বলেছিলেন, লা যাকিরাহ লিল কাযযাব অর্থাৎ মিথ্যাবাদীর কোনো স্মৃতি শক্তি নেই।

২. বেরেলভীর বংশ, পরিবার ও পেশা:

আহমাদ রেযার পরিবার সম্পর্কে কেবল এতটুকু জানা যায় যে, তার পিতা ও দাদাকে হানাফি আলেমদের মধ্যে গণ্য করা হতো।

যদিও আহমাদ রেযার বিরোধিরা অভিযোগ করে যে, তার পরিবার শিয়া ছিল এবং সে 'তাকিয়া'[৪৯] করতো এবং তার পুরো জীবনে প্রকৃত সত্য প্রকাশ

---

[৪৫] বিহারী পৃ-৩৩; আনওয়ার রেযা, পৃ-৩৫৭।

[৪৬] নাসীম বাস্তাওয়ী, পৃ-৩৫।

[৪৭] আনওয়ার রেযা, পৃ-৩৫৬।

[৪৮] হায়াত আলা হযরত, পৃ. ৩৪-৩৫।

[৪৯] তাকিয়া: শিয়া আকীদার স্বতন্ত্র অংশ যেখানে কোনো ব্যক্তি তার প্রকৃত বিশ্বাসকে লোকদের থেকে লুকিয়ে রাখে এবং বাহ্যিকভাবে কোনো বিষয়ে সম্মতি দেখায়।

করেনি যাতে সে ‘আহলুস সুন্নাহ’র মাঝে বসবাস করতে পারে এবং শিয়া আকীদা-বিশ্বাস প্রচার করতে পারে।

তার বিরোধিরা এর (শিয়া বিশ্বাস প্রচারের) যে সকল প্রমাণ উপস্থাপন করেছেন সেগুলো নিচে দেওয়া হলো:

১. আহমাদ রেযার পিতা, দাদা ও তাদের পূর্ববর্তীগণের নাম শিয়াদের মাঝে পাওয়া নামের সাথে মিলে যায়। তার বংশ তালিকাসহ তার পূর্ণ নাম হলো- আহমাদ রেযা বিন নকী আলা বিন রেযা আলী বিন কাজিম আলী।[৫০]

২. বেরেলভী আহমাদ রেযা সাহাবী আবু বকর সিদ্দিক (রাদিয়াল্লাহু আনহু) ও উম্মুল মু'মিনীন আয়শা (রাদিয়াল্লাহু আনহা) এর বিরুদ্ধে এমন কিছু অসঙ্গত উক্তি করেছিল, যা মুখে উচ্চারণ করার মতো নয়।

৩. শিয়া মতবাদ হতে গৃহীত কিছু ভ্রান্ত আকীদা, রীতিনীতি প্রচারে সে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করে, ইতঃপূর্বে যা আর কেউ করেনি।[৫১] যেমন, নবীদের গায়েব জানা, যা হবে ও যা হয়েছে এমন জ্ঞান নবীরা জানেন বলে বিশ্বাস করা, ইচ্ছা, শক্তি ইত্যাদি।

৪. জনাব আহমাদ রেযা সাহেব তার অনেক লেখায় সেই সকল বর্ণনা (হাদীস) ব্যবহার করেছিল যা শিয়াদের বিশিষ্ট বর্ণনা এবং এসকল বর্ণনা (হাদীস) আহলুস সুন্নাহর আকীদার সাথে কোনোই সম্পর্ক নেই।

উদাহরণস্বরূপ:

ক. আলী (রাদিয়াল্লাহু আনহু) কিয়ামত দিবসে জাহান্নাম বিতরণ করবেন।[৫২]

খ. ফাতিমা (রাদিয়াল্লাহু আনহা) এর এ নাম রাখা হয়েছিল কারণ আল্লাহ তাঁকে এবং তাঁর বংশধরদেরকে আগুন হতে রক্ষা করেছেন।”[৫৩]

গ. শিয়াদের ইমামগণকে পবিত্র ঘোষণা করে এ আকীদার বিস্তারিত বর্ণনা দিয়েছে যে, আগওয়াস (গাওস এর বহুবচন। অর্থ সাহায্যকারী, ত্রাণকর্তা)

---

[৫০] হায়াতে আলা হযরত’ পৃ-২।

[৫১] ফতওয়া বেরেলভীয়া, পৃ-১৪।

[৫২] আলামান ওয়াল আলী, আহমাদ রেযা বেরেলভী, পৃ-৫৩।

[৫৩] খতমে নবুয়াত, আহমাদ রেযা, পৃ-৯৭।

আলী (রাদিয়াল্লাহু আনহু) এর মাধ্যমে শুরু হয়েছে এবং হাসান আসকারী পর্যন্ত চলেছে। যার মধ্যে শিয়াদের ১১ জন ইমাম আছে।”[৫৪]

ঘ. আহমাদ রেযা সকল সাহাবীগণকে পরিত্যাগ করেছে এবং আলী (রাদিয়াল্লাহু আনহু) কে ‘মুশকিল কোশা’ (বিপদ দূরকারী) বলে ঘোষণা করেছে। সে বলেছে: “যে বিখ্যাত সাইফী দুআ (যা শিয়াদের আকীদা প্রতিফলিত করে) দ্বারা প্রার্থনা করবে, তার বিপদ দূর হয়ে যাবে।”

সাইফী দুআটি হলো: “আলীকে ডাকো, যিনি ‘কারামত’ (অলৌকিক কার্য) দেখিয়েছেন। তুমি তাঁকে সাহায্যকারী হিসেবে পাবে। হে আলী! আপনার বেলায়েতের (ওলীত্বের) মধ্যস্থতায় সকল দুঃশ্চিন্তা দূর হয়ে যায়।”[৫৫],[৫৬]

ঙ. অনুরূপভাবে, সে ‘পাক পাঞ্জাতন’ পরিভাষাটি কে সুবিদিত করেছে এবং এ কবিতা ব্যাপকভাবে (সবার মাঝে) ছড়িয়ে দিয়েছে।

“এমন পাঁচজন ব্যক্তি রয়েছেন, যাদের বরকত সকল দুঃখ -কষ্ট দূর করে দেয়। (তাঁরা হলেন) মুহাম্মদ মুস্তফা, আলী, হাসান, হুসেইন ও ফাতিমা।”[৫৭]

চ. শিয়াদের আকীদার সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ একটি প্রবন্ধ “জাফর” কে দৃঢ়ভাবে সমর্থন ঘোষণা করে তার বই ‘খালিসুল ইতিকাদ’ এ সে লিখেছে: ‘জাফর’ হলো চামড়া দিয়ে তৈরি একটি বই, যা ইমাম জাফর কর্তৃক “আহল-

---

[৫৪] মালফুযাত, পৃ-১১৮।

[৫৫] আল আমান ওয়াল আলী, পৃ-১২-১৩

[৫৬] এটি শিয়াদের বানানো একটি জাল হাদীস যা এ বেরেলভীগণ ও তার অনুসারী কবরপূজারী যেমন দেওয়ানবাগী, মাইজভাণ্ডারী, আটরশী, রাজারবাগী, সুরেশ্বরী, চন্দ্রপাড়া, বারো শরীফ ইত্যাদির দোসররা সমাজে ব্যাপকভাবে প্রচলন করেছে। একে এরা দলীল বানিয়ে এসব বিভ্রান্তিকর শিরকী আকীদা প্রচার করছে। যেমন- মোল্লা আলী কারী বলেন, শিয়াদের বানানো একটি ঘৃণ্য জাল ও মিথ্যা কথা:

“আলীকে ডাক, সে আশ্চর্য কর্মাদি প্রকাশ করে, তাকে তুমি বিপদে আপদে তোমার সহায়ক পাবে। হে মুহাম্মদ, আপনার নবুয়াতের ওসীলায়। হে আলী, আপনার বেলায়েতের ওসীলায়।” (মোল্লা আলী কারী, আল-আসরার, পৃ- ২৬৫-২৬৬; আজলুনী, কাশফুল খফা ২/৪৮৯) উল্লেখ্য যে, আল্লাহকে বাদ দিয়ে অন্য যে কোনো মৃত বা অনুপস্থিত ব্যক্তিকে ডাকা বা তার কাছে দুআ করা বড় শিরক। (ড. খোন্দকার আব্দুল্লাহ জাহাঙ্গীর, হাদীসের নামে জালিয়াতি, পৃ-৪০৯-৪১১)

[৫৭] ফতোয়া রিযভিয়্যাহ, ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃ-১৮৭।

বাইত” এর জন্য লেখা হয়। এতে প্রয়োজনীয় সকল জিনিসের উল্লেখ আছে। অনুরূপভাবে, কিয়ামত পর্যন্ত যেসকল ঘটনা ঘটবে, তার সবকিছু এতে উল্লেখ করা আছে।”[৫৮],[৫৯]

ছ. অনুরূপভাবে, সে শিয়াদের পরিভাষা “আল-জামিয়াহ” উল্লেখ করে লিখেছে যে, আল-জামিয়াহ হলো সেই সহীফা (বই) যাতে আলী (রাদিয়াল্লাহু আনহু) বিশ্বের সকল ঘটনা বর্ণমালার ক্রম অনুযায়ী লিখেছেন। তার সন্তানদের ইমামগণও এ সকল ঘটনাবলি সম্পর্কে অবগত ছিলেন।”[৬০]

জ. জনাব বেরেলভী শিয়াদের আরেকটি বর্ণনা উল্লেখ করেছে যে, “ইমাম রেযা (শিয়াদের ৮ম ইমাম)-কে এমন একটি দুআ শিক্ষা দিতে বলা হয়েছিল যা তারা আহলে বাইতের কবরের কাছে পাঠ করবে। তখন তিনি বলেছিলেন যে, ‘কবরের কাছে যাও এবং চল্লিশবার ‘আল্লাহু আকবার পড় এবং বল, ‘আস্‌সালামু আলাইকুম ইয়া আহলে বাইত।’ হে আহলে বাইত! আমি আল্লাহর সামনে তোমাদেরকে ওয়াসীলা বানাচ্ছি আমার সমস্যা ও আমার অসুস্থতার জন্য আমি মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর আহলে বাইতের শত্রুদের থেকে নিজেকে মুক্ত ঘোষণা করছি।”[৬১]

তার মানে সে এমন সব বর্ণনা (হাদীস) কে পরিচিত (মাশহুর) করেছে যাতে মুসলিমদের নিকট শিয়াদের ইমামদেরকে সাদরে গ্রহণীয় করে বর্ণনা করতে পারে এবং তাদেরকে সাহাবীগণ ও আহলুস সুন্নাহর আলেমগণের চেয়ে উত্তম হিসেবে ঘোষণা করতে পারে। যদিও শিয়াদের ইমামদের শাজরানামার সাথে এবং এসকল (জাল) বর্ণনার সাথে আহলুস সুন্নাহ’র কোনো সম্পর্ক নেই।

ঝ. জনাব আহমাদ রেযা “শিয়াদের তাজিয়াহ” কে গ্রহণযোগ্য করার উদ্দেশ্যে তার বইতে লিখেছে যে, হুসাইনের কবরের হুবহু নকল (রেপ্লিকা)

---

[৫৮] খালিসুল ইতিকাদ, আহমাদ রেযা, পৃ-৪৭।

[৫৯] এটিও শিয়াদের বানোয়াট বর্ণনার অন্যতম। যেমন “আবূ আবদিল্লাহ (জাফর সাদিক) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: আমি অবশ্যই আসমান ও যমীনে যা কিছু আছে, তা জানি এবং আমি আরও জানি জান্নাত ও জাহান্নামে যা কিছু আছে। আর যা হয়েছে এবং যা হবে, তাও আমি জানি।” (আল্‌-কুলাইনী, উসূলুল কাফী, পৃ-১৬০; হাদীসের নামে জালিয়াতি দ্র.)

[৬০] খালিসুল ইতিকাদ, আহমাদ রেযা, পৃ-৪৭।

[৬১] হায়াতুল মুওয়াত (শব্দ অস্পষ্ট), ফতোয়া রিজভীয়্যাহ, আহমাদ রেযা, ৪র্থ খণ্ড, পৃ-২৯৯।

তোমার ঘরে রাখাতে কোনো দোষ নেই, যেনো তুমি তা থেকে বরকত হাসিল করতে পার।"[৬২]

এরকম আরো অনেক উদাহরণ তার বই ও লিখনীতে পাওয়া যাবে।

আহমাদ রেযার বাইয়াতের ধারাবাহিকতা শিয়া ইমামদের মধ্যস্থতায় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম পর্যন্ত পৌঁছাত, তা তিনি নিজেই আরবীতে উল্লেখ করেছেন।:[৬৩]

اللهم صل و سلم وبارك على سيدنا مولانا محمد المصطفى رفيع المكان المرتضا على الشان الذى رجيل من امته خير من رجال من السالفين وحسين من زمرته أحسن من كذا وكنا حسنا من السابقين السيد السجاد زين العابدين باقر علوم الانبياء والمرسلين ساقى القوثر ومالك تسنيم وجعفر الذى يطلب موسى الكيلم رضاريه بالصلاة عليه–

এমনকি সাধারণ জ্ঞান সম্পন্ন আলিমই এর আনাড়িপনা, (শব্দের) অসংগতি এবং উদ্দেশ্যহীনতা বুঝতে পারবে। এ ধরনের লোকের জন্য এ দাবি করা যে, 'তিন বছর বয়স থেকে সে অনর্গল আরবীতে কথা বলতো' পুরোপুরিই অবাস্তব!! নিচের বাক্যাংশের গঠন কতই না অসংগত!

وحسين من زمرته أحسن من كذا وكنا حسنا من السابقين

يطلب مسى الكليم رضاريه بالصلاة عليه- এর মধ্যে - موسى الكليم

দ্বারা কাকে বোঝানো হয়েছে? যদি মূসা কাজিম উদ্দেশ্য হয়; তবে 'কালিম' দ্বারা কী বুঝায়? যদি নবী মূসা আলাইহিস সালাম উদ্দেশ্য হয়ে থাকে, তবে কি মূসা (আলাইহিস সালাম) (মা'যা আল্লাহ) ইমাম জাফর সাদিকের উপর দরূদ পাঠাতেন এবং আল্লাহর সন্তুষ্টি প্রত্যাশা করতেন? উভয় দিক দিয়েই এ অনুচেছদটি পুরোটাই শব্দের অসংগত ব্যবহার এবং পুরো অর্থহীনতা ছাড়া আর কিছুই নয়।

---

[৬২] রিসালাহ বদরুল আনোয়ার, পৃ-৫৭।

[৬৩] আনওয়ার রেযা, পৃ-২৭।

এ যুক্তির সারমর্ম হলো, আহমাদ রেযা নির্দিষ্ট ক্রমানুসারে শিয়া ইমামগণের উল্লেখের মাধ্যমে মুসলিমদেরকে শিয়া রাফিজীদের অধিকতর নিকটে আনার চেষ্টা করেছে।

৬. জনাব বেরেলভী ভারতীয় উপমহাদেশে (প্রকৃত) আহলুস সুন্নাহর আলেমদের উপর তাকফীর করেছে এবং ফতোয়া জারি করেছে যে, তাদের মসজিদ ও বাড়ি-ঘরের হুকুম একই এবং সেগুলোকে (মসজিদগুলোকে) আল্লাহর ঘর মনে করা ঠিক নয়।[৬৪]

অনুরূপভাবে সে (প্রকৃত) আহলুস সুন্নাহদের সাথে বসা এবং তাদের বিবাহ করা হারাম ঘোষণা করেছে। এরপর বিপরীতে, যখন শিয়ারা প্রথম ইমাম বাড়া'[৬৫] তৈরী করে, তখন শিয়ারা বেরেলভীতে এসে তার কাছে এর একটি নাম রাখার আবেদন করে। তখন সে আবজাদী পদ্ধতি অনুসারে নাম রাখার সুপারিশ করে।[৬৬]

৭. আহমাদ রেযা বেরেলভীর প্রতি অভিযোগ রয়েছে যে, সে ছিল একজন শিয়া রাফেযী। কারণ সে শিয়াদের মতই শিয়াদের ইমামগণের প্রশংসায় অনেক অতিরঞ্জিত কাসীদা (কবিতা) রচনা করেছে।[৬৭]

৩. আয়ের উৎস

আহমাদ রেযা বেরেলভীর পেশা সম্পর্কে অনেকগুলো ভিন্ন ভিন্ন বর্ণনা রয়েছে। বলা হয়েছে যে, তার পরিবার ছিল কৃষিনির্ভর পরিবার। পরিবারের খরচের জন্য বাৎসরিক পরিমাণে অর্থ গ্রহণ করতেন, যা দিয়ে সে ব্যয় নির্বাহ করতো।[৬৮]

মাঝে মাঝে বাৎসরিক অর্থের পরিমাণ অপর্যাপ্ত হতো এবং তাকে ঋণের আশ্রয় নিতে হতো, কারণ (মাঝে মাঝে) তার পোষ্টাল স্ট্যাম্প কেনার মত অর্থ থাকতো না।[৬৯]

---

[৬৪] মালফুযাত, পৃ-১০৪ দ্র.।

[৬৫] ইমাম বাড়া: শিয়াদের মুহাররম অনুষ্ঠানের তীর্থস্থান।

[৬৬] ইয়াদ আলা হযরত, পৃ-২৯।

[৬৭] হাদায়িক বাকশীশ, আহমাদ রেযা, বহু পৃষ্ঠায় এর প্রমাণ দেখুন।

[৬৮] আনোয়ার রেযা, পৃ. ৩৬০।

[৬৯] হায়াতে আলা হযরত, পৃ-৫৮।

আরো উল্লেখ করা হয়েছে যে, ঊর্ধ্বতন (অলৌকিক) দাতা হতেও সে অর্থ-সম্পদ পেত। জাফর উদ্দীন বিহারী কর্তৃক বর্ণিত হয়েছে যে, বেরেলভী সাহেবের একটি তালাবদ্ধ সিন্দুক ছিল সেটি কেবল প্রয়োজনের সময়ই খুলতো এবং যখনই এটা খুলতো তখন পুরোটা খুলতো না। সে এর ভেতরে হাত ঢুকিয়ে গলিয়ে দিত এবং অর্থ, গহনা, কাপড়-চোপড় অথবা যা ইচ্ছা বের করতো।”[৭০]

জনাব বেরেলভীর পুত্র বলেন যে, আহমাদ রেযা প্রায়ই তার বন্ধু-বান্ধব ও অন্যান্য লোকদের মাঝে অলংকার ও অন্যান্য জিনিস বিতরণ করতো। আর এ সবগুলো জিনিসই তিনি এ ছোট সিন্দুক হতে নিত। আমরা আশ্চর্য হতাম যে, এত জিনিস এটা থেকে কিভাবে আসে।[৭১]

তার বিরোধিরা অভিযোগ করে যে, কোনো দৈব হাত (দাতা) ও তালাবদ্ধ সিন্দুক বলে কিছু ছিল না। এটা ছিল ইংরেজ সাম্রাজ্যের হাত যা মুসলিমদের মাঝে বিভক্তি ও ফাটল সৃষ্টি ও অন্যান্য উদ্দেশ্য পূরনের জন্য তাকে এসকল সম্পদ প্রদান করতো।[৭২]

আমার অভিমত এই যে, তার অধিকাংশ সম্পদ ছিল দান ও আমানত রাখা অর্থ, যেমন এখানে এ প্রথাটি সাধারণভাবে পরিলক্ষিত হয় যে, গ্রামবাসীরা তাদের মধ্যকার শিক্ষিত/জ্ঞানী ব্যক্তির নিকট তাদের সহায়-সম্পদ ও মূল্যবান জিনিসপাতি আমানত রাখত এবং তাদের জন্য এটি ছিল জীবনধারনের উপায়।

তার এক অনুসারী বলেছে, “একদা (আহমাদ রেযা) এক ‘ডাম্‌ডী[৭৩] খরচ করার মত ও কোনো অর্থ তার কাছে ছিল না। সে সারা রাত চিন্তিত ছিল। সকালে একজন ব্যবসায়ী এসে গেল এবং তাকে ৫১ রুপি দান করল।[৭৪]

একবার তার হাতে এমনকি পোষ্টাল স্ট্যাম্প কেনার মতোও কোনো অর্থকড়ি ছিল না এবং তার একজন মুরীদ তাকে ২০০ রুপী পাঠালেন।[৭৫]

---

[৭০] আলা হযরত বাস্তাওয়ী পৃ-৭৫, আনওয়ার রেযা, পৃ-৫৭।

[৭১] হযরত আলা হযরত, পৃ-৫৭।

[৭২] সামনের পৃষ্ঠাগুলোতে এর বিস্তারিত বিবরণ আসছে।

[৭৩] ডামডি: মূদ্রার ক্ষুদ্রতর একক (যেমন আনা, পয়সা)

[৭৪] হায়াতে আলা হযরত, পৃ-৫৬।

[৭৫] প্রাগুক্ত, পৃ-৫৮।

জমিদারী এবং তালাবদ্ধ সিন্দুকের ব্যাপার হলো, এর কোনো সত্যতা নেই। কোনো সূত্রের মাধ্যমেই প্রমাণিত নয় যে, তার পরিবার কৃষিকাজের সাথে জড়িত ছিল, অলৌকিক কর্মের এবং সিন্দুকের কিচ্ছা-কাহিনী তার অনুসারীরা তার মান-মর্যাদা বাড়াতে বানোয়াটভাবে তৈরী করেছে। এসবই ভিত্তিহীন কথা। তাহলে এটি কিভাবে ব্যাখ্যা করা যেতে পারে, সিন্দুক থাকা সত্ত্বেও সে অর্থ ধার নিয়েছে এবং তার অনুসারীদের নিকট হতে অর্থ গ্রহণ করতে হয়েছে?

৪. অভ্যাস ও আচরণ

বেরেলভী আহমাদ রেযা প্রায়ই পান চিবাত এবং তা এতই অধিক পরিমাণে ছিল যে, রমযানে ইফতারের পরে সে কেবল পানের উপরেই সন্তুষ্ট হয়ে যেতো।[৭৬]

আবার সে হুক্কা খেত। অন্যান্য খাদ্য ও পানীয়ের উপর সে হুক্কাকে প্রাধান্য দিত এবং এখানে সচরাচর যাদেরকে দেখা যায়, এধরনের সেকেলে ও অসভ্য লোকদের মতো সে হুক্কা দিয়ে অতিথি আপ্যায়ন করতো।[৭৭]

মজার বিষয় জানা যায় যে, বেরেলভী আহমাদ রেযা কর্তৃক বর্ণিত যে, “আমি হুক্কা পানের সময় বিসমিল্লাহ বলতাম না যাতে শয়তানও এতে আমার সাথে অংশীদার হতে পারে।[৭৮]

তার একটা অভ্যাস ছিল লোকদের পদচুম্বন করা। তার এক মুরীদ লিখেছে, “সে হযরহ আশরাফী মিয়ার পদচুম্বন করতেন।[৭৯]

একটি বর্ণনানুযায়ী, কোনো ব্যক্তি হজ্জ সমাপন করে ফিরে এলে, সে তার পদচুম্বন করতো।[৮০]

৫. তার বাচনভঙ্গি

তার বিরোধিরা ছোট-খাট কোনো বিষয়েও যদি তার বিরোধিতা করতো, তাহলে সে তাদের বিরুদ্ধে কঠোর ভাষা ব্যবহার করতো। এ ব্যাপারে সে কোনো বাছ-বিচার করতো না। সে খুব রূঢ় ভাষা ব্যবহার করতো। যে সকল

---

[৭৬] আনোয়ার রেযা, পৃ-২৫৬।

[৭৭] হায়াতে আলা হযরত, পৃ-২৭।

[৭৮] মালফুযাত।

[৭৯] আযকার হাবীব রেযা... (শব্দগুলো অস্পষ্ট) পৃ-২৪।

[৮০] আনওয়ার রেযা, পৃ-৩০৬।

শব্দের দ্বারা সে তার বিরোধিদের সম্বোধন করতো, সেগুলোর মধ্যে ছিল 'কুকুর', 'শুয়োরের বাচ্চা/শুয়োর', ইবলিস, কাযযাব, কাফির, ফাজির', মুরতাদ (ধর্মত্যাগী) এবং অনুরূপ আরো অনেক শব্দ। সে কোনো ভয় বা অনুশোচনা ছাড়াই এ শব্দগুলো ব্যবহার করতো। তার কোনো বই এ ধরনের বাচনভঙ্গী থেকে মুক্ত নয়।

তার 'মধুর বাণী' পূর্বেই কিছু উল্লেখ করেছি। নমুনা হিসেবে তার লিখনী হতে অংশ বিশেষ উদ্ধৃত করবো যা পাঠকদেরকে তার কথা বলার ভঙ্গিমা বুঝতে সাহায্য করবে।

সে দেওবন্দীদের সম্পর্কে লিখেছে:[৮১]

তোমাদের ইমাম ও শিক্ষকদের কথা অনুযায়ী একজন মহিলা যেনা করতে সক্ষম। সুতরাং তোমাদের ইলাহর যেনা করার সক্ষমতা থাকা দরকার। দেওবন্দীরা তাকে বলেছে, কিভাবে তুমি উলুহিয়্যাহর দাবী করতে পারো অথচ আমরা যা করতে সক্ষম তা করতে তুমি সক্ষম নও। তখন সে তাদেরকে বলে, তাহলে তো তোমাদের ইলাহর একটি লজ্জাস্থান থাকার দরকার, তাছাড়া কিভাবে সহবাস করবে?[৮২] (আল ইয়াযু বিল্লাহ!)

চিন্তা করুন, লেখার এ ধরন কি একজন দীনের আলেমের জন্য উপযোগী হতে পারে? তার উপর আবার মুজাদ্দিদ হওয়ার দাবি!!

'দীনের সম্মানে' এ ধরনের ভাষা ব্যবহারের প্রমাণ কোনো হাদীস হতে পাওয়া যায়?! যদি তাকে 'দীনী আলেম' বলার জন্য নাছোড়বান্দা হও, তবে বলতে পার, কিন্তু তাকে 'মুজাদ্দিদে দীন' বলতে অন্তত তোমার কিছুটা হলেও ইতঃস্তত করা উচিত।

এ সম্পর্কিত বিষয়ের একটি উদাহরণ হলো যখন বেরেলভী সাহেব কোনো এক ব্যক্তির নিকট জ্ঞানার্জনের জন্য গেল। শিক্ষক তাকে জিজ্ঞাসা করলেন, তার পেশা কী? সে উত্তরে বলেছিল ওয়াহাবীদের পথভ্রষ্টতা ও কুফর উন্মোচন করাই তার কাজ। তার শিক্ষক বললেন যে, এ ধরনের আচরণ ভাল নয়। সে সেস্থান ত্যাগ করে চলে গেল[৮৩] এবং তার থেকে শিক্ষা গ্রহণ করতে

---

[৮১] সুবহান আস সাবুহ, আহমাদ রেযা বেরেলভী, পৃ-১৪২।

[৮২] প্রাগুক্ত।

[৮৩] হায়াতে আলা হযরত, জাফরুদ্দীন বিহারী।

অস্বীকৃতি জানাল, কারণ তিনি তাওহীদপন্থিদের কাফির ঘোষণা দেওয়া করা থেকে বিরত থাকতে বলেছিলেন।

ভাষা ব্যবহারের ক্ষেত্রে সর্বদা সে জটিল ও দ্ব্যর্থবোধক অভিব্যক্তির শব্দ ব্যবহার করতো। অর্থহীন শব্দাবলি ও বাক্যাংশ ব্যবহারের দ্বারা সে বোঝাতে চাইত যে জ্ঞান-বিজ্ঞানের শাখা প্রশাখায় তার অনেক দক্ষতা রয়েছে। কারণ এখানে (ভারতীয় উপমহাদেশে) দীনী আলেমদের যাকে বোঝা যতো কঠিন, যার কথা যত অবোধ্য, সে ততোবেশী 'উচ্চ শ্রেণির আলিম বলে গণ্য হয়।

তার এক অনুসারী লিখেছে যে, আহমাদ রেযার কথা বোঝার জন্য তাকেও জ্ঞানের সাগর হওয়া প্রয়োজন।[৮৪]

তার ভাষায় বুৎপত্তি ও সাবলিলতার ঘাটতি ছিল। ফলে সে বক্তব্য দেওয়া থেকে নিজেই নিজেকে প্রত্যাহার করে নিত। ঈদে মিলাদুন্নবী অথবা তার 'আল রাসুল শাহ'র উরস উপলক্ষে সে মাঝে মধ্যে কিছু কথা-বার্তা বলতো।[৮৫]

৬. রচনাবলি ও লিখনী

আহমাদ রেযার লিখনীর উল্লেখ করার পূর্বে পাঠকদের এ ঘটনার প্রতি মনোযোগ আকর্ষণ করতে চাই যে, বেরেলভী ফিরকার নিকট অতিরঞ্জন অত্যন্ত প্রিয়। আর অতিরঞ্জনের সময় মিথ্যা বর্ণনা ব্যবহার করা তাদের সহজাত অভ্যাস। তার রচনাবলি সম্পর্কেও তারা ব্যাপকভাবে এটি ব্যবহার করেছে এবং তার শত শত বই গণনা করেছে চোখ বন্ধ করে। কিন্তু প্রকৃত সত্য হলো এর বিপরীত। তাদের স্ববিরোধি কথা বার্তার কিছু নমুনা নিচে দেওয়া হলো -

তার বর্ণনাকারীদের একজন লিখেছে, "আহমাদ রেযার রচনাবলির সংখ্যা ২০০-এর কাছাকাছি।[৮৬]

আরেক বর্ণনায় এক ৩৫০'র কাছাকাছি বলা হয়েছে।[৮৭]

অপর বর্ণনায়, প্রায় ৪৪০ বলে উল্লেখ করা হয়েছে।[৮৮]

---

[৮৪] [আনোয়ার রেযা, পৃ-২৮৪]

[৮৫] [হায়াতে আলা হযরত, জাফরুদ্দীন বিহারী

[৮৬] [মুকাদ্দামাহ আল দাউলাহ আল মাক্কিয়াহ]

[৮৭] [প্রাগুক্ত]

[৮৮] (আল মুজমাল আল মাদাদ তালিফাত আল মুজাদ্দিদ, জাফর বিহারী)

আরো এক ব্যক্তি বলেছেন যে, তা ৫০০ কে ছাড়িয়ে যাবে।[৮৯]

কেউ কেউ বলেন যে, সেগুলো সংখ্যায় ৬০০ এর অধিক।[৯০]

অপর এক ব্যক্তি সবাইকে ছাড়িয়ে গেছে এবং বলেছে যে, তা সংখ্যায় এক হাজারেরও বেশি।[৯১]

কিন্তু প্রকৃত ঘটনা হলো তার বইয়ের সংখ্যা, যাকে বই বলা যেতে পারে, তা ১০টির বেশি নয়। সম্ভবত এটিকেও তারা অতিরঞ্জিত করেছে।

বেরেলভী আসলে কোন কিতাবই লিখেননি, বরং তিনি কিছু মানুষের জানতে চাওয়া প্রশ্নের উত্তর ও ব্যখ্যা লিখেছেন, সেটিও করতেন তার নিকটে এই কর্মে নিয়োজিত থাকা কিছু ব্যক্তির সাহায্যে। তারা ফিকহের কিতাবগুলো থেকে মানুষদের প্রশ্নের উত্তর খুঁজে সেগুলো একত্রিত করে দিতেন। কখনো কখনো উত্তর না পেয়ে, প্রশ্নগুলো অন্য শহরে পাঠানো হতো, কেননা তাদের নিকটে কিছু কিতাব আছে যেখানে এর উত্তর পাওয়া যেতে পারে, সেখানে তার সহযোগিরা উত্তরগুলো খুঁজে বের করে লিপিবদ্ধ করে বেরেলভীর নিকটে পাঠাতেন, বেরেলভী সেগুলো কোন প্রকার যাচাই বাছাই ছাড়াই একস্থানে একত্রিত করতেন , ফলে তার এই লেখার মধ্যে অনেক জটিলতা, অস্পষ্টতা ও দুর্বোধ্য বিষয় পাওয়া যায়। এজন্য পাঠক তার এই লেখা পড়তে যেয়ে হয়রান হয়ে যেত , বিশৃঙ্খলার মধ্যে পড়ে যেত। যারা প্রশ্ন করেছে তাদের নিকটে উত্তরগুলো পাঠানোর আগেই বেরেলভী সেগুলো একটি উপযুক্ত নাম ও অন্য কোন তারিখ দিয়ে তারপর পাঠাতেন। আর এটাকেই বই হিসেবে মূদ্রণ করতেন। কখনো কখনো এমন হত, যিনি ফাতোয়া চেয়েছেন তার নিকটে উক্ত ফাতোয়া পৌঁছানোর আগেই পুস্তিকা বা রিসালাহ হিসেবে মুদ্রণ হয়ে যেত। আর এটা তার অভ্যাস ছিল। তার ফাতোয়াসমূহের মধ্যে সাধারণত থাকতো একনিষ্ঠ তাওহীদপন্থি, কিতাব ও সুন্নাতের অনুসারীদের খণ্ডন। এজন্য অধিকাংশ সময়ই পাঠকমহল দেখতেন তার লেখনির মধ্যে থাকতো বিতর্কৃত ও কল্পকাহীনি সম্পন্ন লেখা। আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামাআতের বিরোধীতায় যেসকল নাম দিয়ে লিখতেন। যেমন,

১। নাবী-রাসূলগণ ও সালেহীন ব্যক্তিরা কি গায়েব জানে?

---

[৮৯] (প্রাগুক্ত)

[৯০] [হায়াত আল বেরেলভী, পৃ-১৩]

[৯১] [মান হুয়া আহমাদ রেযা, পৃ-২৫]

২। নাবী-রাসূলগণ কি অন্য মানুষের মত মাটির নাকি নূরের? তাদের মৃত্যুর পরে তারা কি দুনিয়ার জীবনের মত জীবিত? সেখান থেকে তারা গায়েবের খবর রাখে কি না। তাদের স্বাধিনতা ও শক্তি আছে কিনা। তাদের কবরে বরকত হাসিল করা যাবে কিনা, তাদের মূর্তি ও ভাষ্কর্য্য তৈরি করা যাবে কি না ইত্যাদি মাসআলা।

আর এজন্য বলা যায় বেরেলভী কোন কিতাব লিখেনি। যদিও এসকল ফাতোয়ার বিরাট অংশ তার নিজের গবেষণা না তবুও তার হাতের আঙ্গুলগুলো এই সকল বিষয়ের ফাতোয়াগুলো নাড়াচাড়া করছে। সারমর্মের দিক থেকে একিভুত হয়েছে।

আমরা উপরে যা বললাম সেগুলোর প্রমাণ নিচের কথাগুলোর মাধ্যমে পেশ করছি।

(১) বেরেলভীরা বলে বেরেলভীর কিতাব হাজারেরও উপরে এটি প্রমাণ বিহীন কথা। কেননা কিতাব শব্দটিতে যা কিছু অন্তর্ভুর্ক্ত হয় তা তার মূদ্রিত ফাতোয়াগুলো ছোট বড় দিয়ে আট খণ্ড। আর এছাড়া বাকিগুলো বিভিন্ন পুস্তিকা, প্রবন্ধ যেগুলোকে কিতাব বলা যায় না। আবার ঐ সকল ফাতোয়ার কিতাবগুলোকেও কোন কিতাব বলা যায় না। কেনন ঐ আট খণ্ডে এই পুস্তিকা ও রিসালাহগুলোই একত্রিত করা হয়েছে। আপনি মনযোগ দিয়ে দেখলেই বুঝতে পারবেন পুস্তিকা ও রিসালাগুলোর বিশাল অংশ এই আট খন্ডে রয়েছে, যদিও সব পুস্তিকাগুলো নেওয়া হয়নি। যেমন, আট খণ্ডের মধ্যে প্রথম খণ্ড হলো আল ফাতাওয়া আল রিদ্বাইয়া এর মধ্যে ৩১ টি পুস্তিকা অন্তর্ভুর্ক্ত করা হয়েছে। যা আমরা একবার দেখে গুনে ফেলেছি। এসকল পুস্তিকার নামগুলো হলো,

১.আল জুদ ওয়াল হুলু ২. তানবিরুল ক্বনদীল ৩. আখার মাসাইল ৪. আন নামিক্বাতুল আনক্বা ৫. রহবুস সাআহ ৬. হিবাতুল হামীর ৭. মাসাইলে আখর ৮. ফাছলুল বি’র ৯. বারিক্বুন নুর ১০. ইরতিফাউ’ল হাজব ১১. আত তারসুল মু’দাল ১২. আত ত্বলাবাতুল বাদিআ’হ ১৩. বারাকাতুস সামাই ১৪. আত্বাউন নাবী ১৫. আন নুর ওয়ানাওয়ারক ১৬. সামউন নাদর ১৭. হুসনুত তাআম্মুম ১৮. বাবুল আক্বাইদ ১৯. ক্বাওয়ানিনুল উলামা ২০. আল জাদ্দুস সাঈদ ২১. মাজাল্লিশ শুমআ ২২. তিবইয়ানুল উদ্বু ২৩. আদদিক্বাতু ওয়াত তিবইয়ান ২৪. আন নাহয়ু ওয়ান নামীর ২৫. আযুফরু লি কওলি যাফারিন ২৬. আল মাত্বারুস সাঈদ ২৭. লামউল আহকাম ২৮. আল মুআল্লিমুত ত্বারাজ

২৯. নাব্বাহুল ক্বওম ৩০. আজলীল আ'লাম ৩১. আল আহকাম ওয়াল ই'লাল।

এই সকল পুস্তিকা কোনটি মাত্র ৬ পৃষ্ঠা যেমন তানবীরুল ক্বানদীল। আবার কোনটি মাত্র ৭ পৃষ্ঠা যেমন ত্বিবইয়ানুল উদ্বু। আবার কোনটি মাত্র ৮ পৃষ্ঠা যেমন লামঊ'ল আহকাম এবং হিবাতুল হামীর। এই হলো এদের আসল চেহারা, এই হলো বেরেলভীর বিশাল কিতাবের সংখ্যা যার কিছু সংখ্যা আমি উল্লেখ করলাম।

(২) ওমুক হাজার হাজার কিতাব লিখেছে, দুই হাজার বা আরো বেশি কিতাব লিখেছে এগুলো মুখে বলা খুব সহজ, যা বলতে কোন পরিশ্রম করা লাগে না, কোন কষ্ট করা লাগে না। কিন্তু এটা প্রমাণ করা অনেক কঠিন। এমনই হলো এরা। বেরেলভী নিজেই উল্লেখ করেছে সে মাত্র ১১ টা পুস্তিকা রচনা করেছে আর ঐ সময়ই সেটি ২০০ কিতাব হয়ে গিয়েছিল। তার ছেলে ওহাবীদের বিরুদ্ধে তার কিতাবের তাআ'লীক করে সেগুলোর সংখ্যা ৪০০ তে গিয়ে পৌঁছে ছিল। এর মধ্যে ছিল ১২ টি বিশাল ফাতওয়া।[৯২] এরপরে তার ছাত্র ও খলিফা আলবাহারী ৩৫০ খানা পুস্তিকা সেখানে যুক্ত করে ফলে এগুলো সব আলাদা আলাদা কিতাব গন্য করেও সর্বোচ্চ ৫৪৮ টি কিতাব হয়।

তাদের হাস্যকর দাবী ও মজার বিষয় স্পষ্ট করার জন্য নিম্নে তাদের গণনাকৃত কিছু কিতাবের নাম দেওয়া হলো।

হাশিয়াতু সহীহিল বুখারী, হাশিয়াতু সহীহ মুসলিম, হাশিয়াতুন নাসাঈ, হাশিয়াতু ইবনি মাজাহ, হাশিয়াতুত তাক্বরিব, হাশিয়াতু মুসনাদি ইমামিল আযাম, হাশিয়াতু মুসনাদিল ইমাম আহমাদ, হাশিয়াতুত তাহাবী, হাশিয়াতু খাছাইছি কুবরা, হাশিয়াতু কাংযিল উম্মাল, হাশিয়াতু কিতাবি আসমাই ওয়াস সিফাত, হাশিয়াতুল ইছাবা, হাশিয়াতু মাউদ্বু আতিন কাবীর, হাশিয়াতু শামসিন বাঝিগাত, হাশিয়াতু উমদাতুল ক্বারী, হাশিয়াতু ফাতহিল বারী, হাশিয়াতু নাছবির রাইয়া, হাশিয়াতু ফাইুদ্বিল ক্বদ্বীর, হাশিয়াতু আশআতিল লুমআত, হাশিয়াতু মাজমাঈ বিহারিল আনওয়ার, হাশিয়াতু তাহযিবুত তাহযিব, হাশিয়াতু মুসামারাতিন ওয়া মুসাইরাহ, হাশিয়াতু তুহফাতুল ইখওয়ান, হাশিয়াতু মিফতাহিস সাআদাহ, হাশিয়াতু কাশফুল গুম্মাহ, হাশিয়াতু মিযানিশ শারীয়া ইত্যাদ।

---

[৯২] তার কিতাবের সংখ্যার বিশালতা সম্পর্কে আমরা আলোচনা করেছি।

এসকল কিতাব যা তারা উল্লেখ করাকে সবগুলো বেরেলভী পাঠাগারে আছে, যেগুলোর কোনটিতে তিনি হয়তো চোখ বুলিয়েছেন, অথবা এক বা দুই পৃষ্ঠা টিকা লিখেছেন ব্যস সেটিকেই তারা তার কিতাব বলে গন্য করেছে। এর জন্য এগুলোর কোন পুস্তিকাও বের হয়নি। যদি এত সহজ বিষয় হত তাহলে প্রত্যেক ব্যক্তিই দাবি করে বলতো আমার হাজারের উপরে কিতাব আছে। আমাদের উদাহরণ স্বরুপ যে সকল কিতাব যেমন আল ফিরাক্ব ওয়াল আদইয়ান , আরুদুদ আ'লা ফিরাকিল বাতিলাতিল মুনহারিফা আন ছিরাতিল মুসতাক্বীম, ওয়াঝ জাইগাতু আন জাদ্দাতিছ ছাওয়াব। যদি তারা এগুলো একটু দেখতো ও সামান্য সমালোচনা করতো তাহলে তারা বলতো ৫ হাজারের উপরে কিতাব রয়েছে। কেননা আমি তাদের দাবী করা ৩০০ এর অধিক কিতাব পড়েছি এবং এর প্রত্যেকটি কিতাবে আমি টিকা লিখেছি তাহলে ওগুলো কি আমার কিতাব? এই হলো তাদের অবস্থা, তাহলে এত গর্ব কি নিয়ে?

আমাদের আলোচনার পূর্ণতার জন্য আমরা তাদের পরস্পর বিরোধী কথাগুলো উল্লেখ করছি যা তারা কিতাব গণনার ক্ষেত্রে উল্লেখ করেছে।

১. বেরেলভীর দাবি তার কিতাব ২০০ টি

২. তার খলিফা ও ছাত্রের দাবি তার কিতাব ৩৫০ টি

৩. তার ছেলের দাবি তার কিতাব ৪০০টি

৪. আনওয়ারুর রিদ্বার লেখকের দাবি, তার কিতাব ৫৪৮টি

৫. আল বাহারীর দাবী তার কিতাব ৬০০ বা ১০০০টি ।

(৩) বেরেলভীর জীবদ্দশা থেকে আজ পর্যন্ত তার নামে যত রিসালাহ বা পুস্তিকা দাবি করা হয়ে থাকে সেগুলো মুদ্রণ করলে ২৫০০ এর বেশি হবে না, যা আনওয়ারুর রিদ্বার লেখক উল্লেখ করেছে। আর এসব পুস্তিকা তার ঐ ফাতোয়া যা আমরা পূর্বে উল্লেখ করেছি।

(৪) আমরা আহমাদ রেযা খান বেরেলভীর লেখালেখি ও রচনাবলি সম্পর্কে বেরেলভীদের মিথ্যাচার ও বাড়াবড়ি উপরে উল্লেখ করলাম। এমনকি হযরত বুরহানুল মিল্লাতি ওয়াদ দীন মাওলানা আল মুফতি মুহাম্মাদ বুরহানুল হক আল কাদিরী, আর রিদ্বাবী, আল মুফতিউল আযম আল জাবাল পুরী লিখেছেন, হযরত বেরেলভী একজন মুজাদ্দীদ ছিলেন তার প্রমাণ হলো, তিনি এমন সব ফাতাওয়া লিখেছেন যা পূর্ববর্তী এবং পরবর্তী কারো কিতাবে পাওয়া

যায় না। আর তার ফাতাওয়াগুলো বড় বড় ১২ টি খণ্ডের মধ্যে একত্রিত করা হয়েছে। আর এক এক খণ্ডের পৃষ্ঠা সংখ্যা হাজারেরও উপরে।

আমরা একটু মনযোগ দিয়ে দৃঢ়দৃষ্টিতে এই ফাতওয়ার কতটা মুল্যবান তা পাঠকের নজরে এই স্পষ্ট মিথ্যুক ও নোংরা দলের মিথ্যা সমূহ দেখেছি।

লক্ষ্য করুন, মুফতি সাহেব লিখলেন, তার ফাতাওয়ার কিতাবগুলো বড় বড় ১২ টি খণ্ডের মধ্যে একত্রিত করা হয়েছে। অথচ বাস্তবতা হলো আজ পর্জন্ত আট খণ্ডের বেশি মূদ্রিত হয়নি, যার মধ্যে একটি খণ্ড বড় বাকিগুলো সবই ছোট।

তিনি আরো লিখেছেন, এগুলোর এক একটির পৃষ্ঠা সংখ্যা নাকি হাজারেরও উপরে, অথচ এর যেটি সবচেয়ে বড় খন্ড সেটির পৃষ্ঠা সংখ্যা হলো ৬২৪ টি আর বাকি গুলোর পৃষ্ঠা সংখ্যা হলো ৫০০, ৬০০ পৃষ্ঠা করে। আবার একটির পৃষ্ঠা সংখ্যা মাত্র ৩২৫টি, এর একটিরও পৃষ্ঠা সংখ্যা হাজারের সংখ্যাতে পৌঁছায়নি।

আমরা এই ফের্কার লেখালেখি সম্পর্কে বিস্তারিত বর্ণনা করে যা দেখালাম তা হলো, এই ফের্কা প্রতিষ্ঠিত হয়ে আছে, মিথ্যা, বাড়াবাড়ি ও অতিরঞ্জনের উপরে।

(৫) এই সকল ফাতাওয়ার লেখক হলেন, বেরেলভীর অসংখ্য সাহায্য ও সহযোগিতাকারী, তার অনুসারী ও ছাত্রগণ। এমনকি আলবাহারী বেরেলভীর জিবনীতে উল্লেখ করেছেন, যখন তার কাছে কোন ফাতওয়া আসতো তখন তিনি লেখকদের মাঝে ভাগ করে দিতেন, এর উত্তর লেখার জন্য। যেমনটি বেরেলভী নিজেই তার একটি চিঠিতে সমসাময়িক একজনের কাছে লিখেছিলেন, আমি তোমাদের নিকটে এমন একজন ব্যক্তিকে পাঠিয়েছি, যিনি আমার মাদ্রাসার একজন শিক্ষক ও আমার ফাতওয়া লেখার সাহায্যকারী।

তিনি আরো একটি চিঠিতে লিখেছেন, আমার নিকটে কিছু তাফসীরে বর্ণনা পৌঁছেছে, আমার বাকিগুলোও প্রয়োজন, আমাকে বলবে তাফসীরে রুহুল মাআনী কি? কে এই আলুসী আল বাগদাদী? আমি তাকে চিনিনা, তোমার নিকটে এই বিষয়ে কোন কিতাব বা তার জীবনী থাকলে আমাকে জানাবে। হাওয়ামিশুল মাদরাকের বর্ণনাগুলোও আমার দরকার।

আরো একটি চিঠিতে লিখেছেন, খেযাবের মাসআলার পূর্ণ বর্ণনা আমার লাগবে, নিম্নের কিতাবগুলো থেকে, যদি তোমার নিকটে কিতাবগুলো থাকে

তাহলে তো খুবই ভাল, আর যদি না থাকে তাহলে গ্রন্থাগারে যেয়ে নিয়ে আসবে, কিতাবগুলো হলো, আত তাতারখানিয়্যা, যাদুল মাআদ, আকদুল ফারীদ লিইবিন আব্দির রববিহ, নুঝহাতুল মাজালিস, ছাররাহ, ক্বামুস, তাজুল উরুস, খালিকু ঝামাখশারী, মাগরিবু মাত্বরাণী, মিছবাহুল মুনীর, মুখতারুছ ছহহাহ, নিহাতু ইবনিল আসীর, মাজমাউল বিহার, মিরক্বাত, ইশআতুল লুমআত, ফাতহুল বারী, উমদাতুল ক্বারী, ইরশাদুস সারী, শরহু মুসলিম লিন নববী, শারহু শারঈ শামাইলে তিরমিযি, শারহু শারআতিল ইসলাম, শারহু মাশারিক্বীল আনওয়ার, তাইসির, আস সিরাজুল মুনীর, শারহুল জামীইস সাগীর।[৯৩]

এই সকল কিছু প্রমাণ করে সে নিজে কোন ফাতওয়া লিখেনি, বরং তার সাহায্য ও সহযোগিতাকারীরা এই সকল ফাতাওয়া লিখে তাকে দিত, তখন তিনি তা নিজের নামে প্রশ্নকারীর নিকেট পাঠাতেন।

৭. জিহাদের বিরোধিতা এবং ইংরেজ উপনিবেশ-এর সমর্থন দান

আহমেদ রেযার যুগ ছিল ইংরেজ উপনিবেশিক শাসনের যুগ। ফেতনা-ফেসাদ ঘাত-প্রতিঘাত মুসলিম জাতিকে গ্রাস করেছিল। তাদের শাসন অবসান ঘটেছিল। ব্রিটিশরা মুসলিমদের নির্মূল করতে চেষ্টা করেছিল। মুসলিম আলেমগণকে ফাঁসিকাষ্ঠে ঝুলাবার আদেশ দেওয়া হয়েছিল। সাধারণ মুসলিম জনগণ চরমপন্থা ও জুলুমের লক্ষ্যবস্তুতে পরিণত হয়েছিল। তাদের সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করা হয়েছিল। তাদের বন্দী করা হয়েছিল এবং কালাপানিতে অন্যান্য কারাগারে কারারুদ্ধ করা হয়েছিল ও তারা মর্যাদাপূর্ণ ও সম্মানজনক অবস্থান হারিয়ে ফেলেছিল। বৃটিশ উপনিবেশিকরা ভারতীয় উপমহাদেশ থেকে মুসলিমদের অস্তিত্বই মুছে ফেলতে চেয়েছিল। তাদের এ যুগে যদি কোনো একদল লোক তাদের বিরুদ্ধে গলা চড়িয়ে প্রতিবাদ করতো এবং সর্বশক্তি ও সাহস নিয়ে তাদেরকে প্রতিরোধ করতো, তবে তাদেরকেই ওয়াহ্হাবী[৯৪] বলা হতো।

যারা জিহাদের আদর্শকে তুলে ধরেছিল, তাদের সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত হয়েছিল। তাদেরকে কালা পানির শাস্তি ভোগ করতে হয়েছিল। তারা তাদের

---

[৯৩] হায়াতু আলা হযরত পৃ ২৮১।

[৯৪] ওয়াহাবী: ওয়াহাবী শব্দটি আহলে হাদীসকে বোঝাতে সর্বপ্রথম ব্রিটিশরাই এটি ব্যবহার করেছিল যাতে তারা তাদের (আহলে হাদীসের) মানহানি করতে পারে। ওয়াহাবী শব্দটি একজন বিদ্রোহীর সমার্থক হিসেবে ব্যবহৃত হত, নিঃসন্দেহে ওয়াহাবীগণ ব্রিটিশদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহী ছিল।]

জীবন বিলিয়ে দিয়েছিল। কিন্তু ব্রিটিশ উপনিবেশকে মানতে পারেনি। সে যুগের ওয়াহাবীরা চেয়েছিল যে, ভারতীয় উপমহাদেশের মুসলিমরা রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিকভাবে শক্তিশালী হোক।

একসঙ্গে প্রতিরোধ ও যুক্ত করা, এক পতাকার নিচে একত্রিত হওয়া ও বৃটিশ উপনিবেশের অবসান ঘটানোর জন্য সেই সময়ে প্রয়োজন ছিল ঐক্য ও বোঝাপড়ার, কিন্তু উপনিবেশীরা তা চাইত না। তারা মুসলিমদেরকে একে অপরের মুখোমুখি দাঁড় করাতে চাইত। তারা মুসলিমদের একে অপরের বিরোধী দেখাতে চাইত। এ লক্ষ্য অর্জনে তাদের কিছু লোকের প্রয়োজন ছিল যারা তাদের (ব্রিটিশদের) অনুচর হিসেবে কাজ করবে এবং মুসলিমদের মাঝে বিভক্তি ও বিরোধ ঘটাবে এবং তাদেরকে একে অপরের বিরূদ্ধে লাগার জন্য উসকে দেবে। তারা তাদের ঐক্যকে ধবংস করবে এবং তাদের শক্তি ও অবস্থাকে দুর্বল করে দেবে। এ উদ্দেশ্যে ব্রিটিশরা কিছু লোককে বাছাই করল এবং তাদেরকে প্রতিষ্ঠিত করল। যাদের মধ্যে ছিল গোলাম আহমাদ কাদিয়ানী এবং জনাব বেরেলভীর বিরোধিদের মতে, জনাব আহমাদ রেযা খান বেরেলভীর নাম ছিল সেই তালিকায় সবার শীর্ষে।[৯৫]

গোলাম আহমাদ কাদিয়ানীর কর্মকাণ্ড কারো নিকট লুকায়িত নেই। কিন্তু আহমাদ রেযা সাহেবের বিষয়ে ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ প্রয়োজন। আহমাদ রেযা ব্রিটিশ উপনিবেশ বিরোধী ওয়াহাবীদেরকে তার গালাগালি, বিদ্বেষ, ব্যঙ্গ-বিদ্রুপ হাসি তামাশার লক্ষ্যস্থল বানিয়েছিল। যে সকল ওয়াহাবীরা ব্রিটিশ উপনিবেশিকদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেছিল এবং তাদের বিরুদ্ধে জিহাদরত ছিল তাদের বিরুদ্ধে ব্রিটিশ উপনিবেশিকরা তাদের গ্রামগুলোর উপর দিয়ে বুলডোজার চালিয়েছিল।[৯৬] শুধু বাংলাতেই এক লক্ষ ওয়াহাবী আলেম ও সাধারণ মানুষকে ফাঁসি দিয়ে হত্যা করেছিল।[৯৭]

এ ঘটনার সত্যতা নিশ্চিত করে ইংরেজি লেখক তার বইতে লিখেছে:

(ভারতে) আমাদের শাসনের ব্যাপারে মুসলিমদের মাঝে আমাদের কোনো বিপদ ছিল না। যদি কোনো বিপদ থেকেই থাকে, তবে তা হলো

---

[৯৫] [বেরেলভী ফতোয়া, তাকফীরী আকসানী, আইনাহ সাদাকাত, মুকাদ্দিমা আশ শিহাবুস সাকিব, মুকাদ্দিমা বাসাইল চামদপুরী, ফাযিল বেরেলভী ইত্যাদি গ্রন্থসমূহ দ্রষ্টব্য।]

[৯৬] [তাজকিরাহ সাদেক, আব্দুর রহিম]

[৯৭] ["ওয়াহাবী ট্রায়াল্‌স" (ওয়াহাবীদের বিচার") দ্রষ্টব্য]

একটা ক্ষুদ্র মুসলিম দল ওয়াহাবীদের পক্ষ হতে, কারণ একমাত্র তারাই সেই দল, যারা আমাদের বিরুদ্ধে জিহাদ করছিল।”[৯৮]

১৮৫৭ সালের মুক্তিযুদ্ধের পরে, ওয়াহাবীগণের প্রধান প্রধান ব্যক্তিদেরকে ফাঁসিতে ঝুলানো হয়।

১৮৬৩ সাল পর্যন্ত সময়টা ছিল তাদের জন্য খুবই কঠিন। এ সময়ে ব্রিটিশরা তাদের উপর যে ধরনের নৃশংসতা চালিয়েছিল, ভারতীয় ইতিহাস এর সাক্ষী হয়ে আছে।

ওয়াহাবীগণের প্রধান প্রধান আলেমগণ যারা বন্দীত্ব ও কারাবরণের যন্ত্রণা ভোগ করেছিলেন, তারা হলেন-

১. মাওলানা জাফর থানিশ্রী

২. মাওলানা আব্দুর রহিম

৩. মাওলানা আব্দুল গাফফার

৪. মাওলানা ইয়াহইয়া আলী সাদিকপুরী

৫. মাওলানা আহমাদুল্লাহ এবং তাদের সবার শায়খ,

৬. মাওলানা নাযির হুসাইন মুহাদ্দিস দেহলবী (রহমাতুল্লাহ আলাইহিম)।

ওয়াহাবী মুজাহিদগণের সম্পদ বাজেয়াপ্ত করার একটি আদেশ প্রদান করা হয়েছিল।[৯৯] তাদের বাড়ি ঘর সমান করে দেওয়া হয়েছিল এবং এমনকি তাদের পারিবারিক কবরস্থান পর্যন্ত উল্টে দেওয়া হয়েছিল।[১০০] তাদের বাড়িঘরের উপর বুলডোজার চালানো হয়েছিল।[১০১] ওয়াহাবী আলেমদের গ্রেফতার করা হয়েছিল এবং শাস্তি প্রদান করা হয়েছিল। এ বিষয়ে শায়খ সাইয়্যেদ নাযির হুসাইন এর গ্রেফতার খুবই বিখ্যাত।[১০২]

ব্রিটিশ উপনিবেশকরা তাদের সুপরিচিত “ভাগ কর এবং শাসন কর’ (Divide and Rule) পলিসি ব্যবহার করে এ ওয়াহবীগণের বিরুদ্ধে আহমাদ

[৯৮] (ইণ্ডিয়ান মুসলিম্‌স, পৃ-৩২)

[৯৯] [ওয়াহাবী তেহরীক, পৃ-২৯২]

[১০০] [তাযকিরাহ সাদিক]

[১০১] [প্রাগুক্ত]

[১০২] [ওয়াহাবী তেহরীক, পৃ-৩১৫]

রেযা বেবেলভীকে ব্যবহার করেছিল; উদ্দেশ্য ছিল মুসলিমদের মাঝে দলাদলি বিভক্তি ও দ্বন্দ্ব-সংঘাত সৃষ্টি এবং তাদের ঐক্যকে চিরতরে ধ্বংস করা।

যখন ব্রিটিশ উপনিবেশকদের বিরোধিরা তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধরত ছিল এবং তাদের বিরুদ্ধে জিহাদে নিয়োজিত ছিল। ঠিক তখনই আহমাদ রেযা বেবেলভীকে ব্যবহার করেছিল; উদ্দেশ্য ছিল মুসলিমদের মাঝে দলাদলি, বিভক্তি ও দ্বন্দ্ব সংঘাত সৃষ্টি এবং তাদের ঐক্যকে চিরতরে ধ্বংস করা।

যখন ব্রিটিশ উপনিবেশকদের বিরোধিরা তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধরত ছিল এবং তাদের বিরুদ্ধে জিহাদে নিয়োজিত ছিল। ঠিক তখনই আহমাদ রেযা বেরেলভী মুসলিম নেতাদের মধ্যে যারা স্বাধীনতা সংগ্রামে কোনো না কোনো ভাবে অংশ গ্রহণ করেছিলেন, তাদের নামোল্লেখ করে তাদেরকে তাকফীর (কাফির ঘোষণা) করে।

ওয়াহাবীগণ ছাড়াও যে সকল গ্রুপভারতীয় স্বাধীনতা সংগ্রামে অংশ গ্রহণ করেছিল, তাদের মধ্যে মুসলিমদের মধ্য থেকে জামায়াতে ওলামায়ে হিন্দ, মাজলিস ইহরার, তেহরিক খিলাফাত, মুসলিম লীগ এবং হিন্দুদের মধ্য থেকে আযাদ হিন্দু ফৌজ এবং গান্ধির কংগ্রেস উল্লেখযোগ্য ছিল।

জনাব বেরেলভী স্বাধীনতা আন্দোলনের গ্রুপগুলো থেকে শুধু যে দূরে ছিল, তা-ই নয় সে তাদের এবং তাদের নেতৃবৃন্দকে তাকফীর (কাফির) ঘোষণা করেছিল, তাদেরকে গালাগাল করা ও তাদের বিরুদ্ধে বিদ্বেষ ছড়ানোর কাজে নিজেকে নিয়োজিত রেখেছিল এবং তাদের সাথে যোগ দেওয়াকে না-জায়েয ফতোয়া দিয়েছিল।

জনাব বেরেলভী তেহরীক খিলাফাহ এর সময়ে মারা যায় কিন্তু তার পরে তার অনুসারীরা মিশনকে এগিয়ে নিয়ে গিয়েছিল এবং তারা ওয়াহাবী ছাড়াও মুসলিম লীগেরও বিরোধিতা করেছিল এবং মুসলিম লীগের খ্যাত ব্যক্তিবর্গকে কাফির (মুরতাদ) ঘোষণা করে ফতোয়া জারি করেছিল এবং ব্রিটিশদের ক্ষমতাকে শক্তিশালী করেছিল। আহমাদ রেযার নেতৃত্বে বেরেলভীয়াহ আকাবিরগণ এ সকল আন্দোলন হতে মুসলিমদের দূরে সরিয়ে রাখতে অনড় ছিল এবং মারাত্মকভাবে জিহাদের বিরোধিতা করেছিল। যখন শরীয়াতের ভিত্তিতে স্বাধীনতার জিহাদ এ বিষয়ের উপর নির্ভরশীল ছিল যে, ভারত ছিল দারুল হারব এবং মুসলিম মিল্লাতের আকাবিরগণ ভারতকে ইতিমধ্যে 'দারুল হরব' ঘোষণা করেছিলেন, তখন আহমাদ রেযা বেরেলভী এ ফতোয়ার ভিত্তিতে জিহাদকে নস্যাৎ করার চেষ্টা করেছিল যে, সে ফতোয়া দিয়েছিল যে, ভারত (ছিল) 'দারুল ইসলাম'। আর এ বিষয়ে সে একটি ২০ পৃষ্ঠার ছোট পুস্তিকা

লিখেছিল যার নাম, اعلام الاعلام بان هندوستان دار الإسلام জনাব বেরেলভী এ পুস্তিকার শুরুতে যার উপর জোর দিয়েছিল তা হলো ওয়াহাবীরা কাফির এবং মুরতাদ, তাদেরকে (ওয়াহাবীদেরকে) ক্ষমা করা না জায়েয। এমনকি তাদের কাছে জিযিয়া নেওয়ার পরে ও অনুরূপভাবে তাদের আশ্রয়দান, তাদেরকে বিয়ে করা, তাদের জবেহ করা (প্রাণী) খাওয়া তাদের (পেছনে) সালাত আদায় করা জায়েয নয়, এমনকি তাদের সাথে সম্পর্ক রাখা অথবা ব্যবসায়ীক লেনদেন করাও জায়েয নয় বরং তাদের নারীদের দাসী বানানো উচিত এবং তাদেরকে সামাজিকভাবে বয়কট (একঘরে) করা উচিত। পরিশেষে সে লিখেছে - قاتلهم الله أني يؤفقون অর্থাৎ আল্লাহ তাদের ধ্বংস করুন, তারা কোথায় ফিরে মরছে?" (সূরা মুনাফিকুন ৬৩:৪)[১০৩]

আহমাদ রেযার আসল চেহারা উন্মোচনের জন্য এই ক্ষুদ্র পুস্তিকাটিই যথেষ্ট। এর মাধ্যমে তার প্রতারণা প্রকাশ হয়ে পড়েছে কিভাবে সে মুজাহিদগণের বিরোধিতা করেছিল এবং ব্রিটিশ ঔপনিবেশিকদের শক্তিশালী করেছিল এবং মুসলিমদেরকে একে অপরের বিরুদ্ধে লাগিয়ে দেওয়ার মাধ্যমে কিভাবে সে মুসলিমদের এবং তাদের দীনের শত্রুদের শক্তিতে পরিণত হয়েছিল।

তুর্কী সালতানাত ভেঙ্গে যাওয়ার পর যখন সারা বিশ্বব্যাপী মুসলিমগণ ব্রিটিশদের বিরুদ্ধে তাদের প্রতিবাদী কণ্ঠস্বর উচ্চ করেছিল এবং মাওলানা মুহাম্মদ আলী জাওহার এর নেতৃত্বাধীনে মুসলিম খিলাফত, নিরাপত্তা ও সংবিধানের জন্য ব্রিটিশদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করছিল, ঠিক সে সময় আহমাদ রেযা ব্রিটিশদের জন্য লাভজনক কাজে ব্যস্ত এবং সর্বদা লেগেছিল।

নিঃসন্দেহে, খিলাফত আন্দোলন ব্রিটিশদেরকে তাদের প্রতারণার জন্য শাস্তি প্রদানে কার্যকর প্রমাণিত হয়েছিল। সকল মুসলিম একই পতাকাতলে সমবেত হয়েছিল। আলেমগণ এবং সাধারণ মুসলিমগণ উভয়েই এ আন্দোলনে সমর্থন ছিল। একজন বেরেলভী লেখক ও এটা স্বীকার করেছে এবং লিখেছে, "১৯১৮ সালে ১ম বিশ্ব যুদ্ধ শেষ হলো। জার্মানী ও তাদের মিত্র তুর্কি ও অষ্ট্রিয়া পরাজিত হলো। ভারতীয় স্বাধীনতার বিষেয়ে তখন তুরস্ক থেকে একটি চুক্তি হয়। কিন্তু ব্রিটিশরা তাদের প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করেছিল। তাই তারা তাদের বিরুদ্ধে চলে গিয়েছিল। রাজনৈতিক ব্যক্তিবর্গ মনে করছিল যে, কোনোভাবে ব্রিটিশদের তাদের প্রতিশ্রুতি ভঙ্গের জন্য শাস্তি পাওয়া উচিত। তাই তারা মুসলিমদের অনুপ্রাণিত করেছিল যে, খিলাফত রক্ষা করা ফরয ও অবশ্যই

[১০৩] [ইলাম আল ইলাম বান হিন্দুস্তান দারুল ইসলাম, পৃ-১৯-২০ দ্র.]

কর্তব্য। ফলে এর উপর ভিত্তি করে খিলাফত আন্দোলন প্রতিষ্ঠিত হয় এবং মুসলিমদের মাঝে একটি বিরাট ঝড় উঠে।”[১০৪]

আর কার্যত **১৯১৯** সালে মুসলিম নেতৃবৃন্দ ও আলিমগণের নেতৃত্বে শুরু হয়ে খিলাফত আন্দোলনে ব্রিটিশদের বন্দীদশা ও শৃংখাবদ্ধতার বিরুদ্ধে লোকদের অনুপ্রাণিত করে চলছিল। এভাবে তাদের উৎসাহ খিলাফত আন্দোলন ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের অবসানকে অবশ্যম্ভবী করে তুলেছিল। আহলে হাদীস আলেমে দীন ইমামুল হিন্দ মাওলানা আবুল কালাম আযাদ এ ব্যাপারটি ব্যাখ্যা করেছেন।”[১০৫]

বেরেলভী মতাদর্শের ইমাম ও তাদের মুজাদ্দিদ ব্রিটিশবিরোধী এ আন্দোলনের প্রভাব এবং এর ফলাফল অনুভব করেছিল এবং তাদের (ব্রিটিশদের) সাথে তার বন্ধুত্বের প্রমাণ দিয়েছিল। আর এ আন্দোলনকে ক্ষতিগ্রস্ত করার উদ্দেশ্যে সে دوام العيش নামে আরেকটি ক্ষুদ্র পুস্তিকা রচনা করেছিল। এর মধ্যে সে বলেছিল যে, শারঈ খিলাফতের জন্য পূর্বশর্ত হলো খলীফা হতে হবে কুরাইশ বংশ হতে, ভারতীয়দের তুর্কীদের সহায়তার করার প্রয়োজন নেই, কারণ তারা কুরাইশ নয়। এর ভিত্তিতে সে ব্রিটিশ বিরোধী আন্দোলনের বিরোধিতা করার জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করেছিল এবং ব্রিটিশ ঔপনিবেশকদের শক্তির কারণ হয়েছিল।

আহমাদ রেযা খান সাহেব এ আন্দোলনের সম্ভ্রান্ত মুসলিম ব্যক্তিবর্গের সমালোচনা করে লিখেছিল: “তুর্কিদের পক্ষ অবলম্বন করা প্রতারণার ফাঁদ ছাড়া কিছুই নয়। আসল উদ্দেশ্য হলো, ‘খিলাফত’ ‘খিলাফত’ করে চিৎকার করা, জনগণকে ক্ষেপিয়ে তোলা এবং তাদের নিয়ন্ত্রণে (পক্ষে) নেওয়া, চাঁদা সংগ্রহ এবং গঙ্গা ও যমুনার পবিত্র ভূমিকে মুক্ত করা।”[১০৬]

জনাব বেরেলভী সাহেব ‘অসহযোগ আন্দোলন’-এর ও বিরোধিতা করেছিল কারণ সে ভেবেছিল যে, এটা ব্রিটিশদের পতনের একটি কারণ হতে পারে।

অসহযোগ আন্দোলনের উদ্দেশ্য ছিল ব্রিটিশদের পূরোপূরি বয়কট (বর্জন) করা- তাদের কোনো ট্যাক্স বা কর না দেওয়া, ব্রিটিশ কর্তৃক চালিত সরকারী অফিসে চাকুরী না করা। অর্থাৎ ব্রিটিশ শাসনকে পুরোপুরি প্রত্যাখ্যান

---

[১০৪] (মুকাদ্দিমা দাওয়াম আল আইশ, মাসুদ আহমেদ, পৃ-১৫)

[১০৫] (প্রাগুক্ত, পৃ-১৮)

[১০৬] (দাওয়াম আল আইশ, পৃ--২৩; অন্য সূত্র অস্পষ্ট)

করা- যাতে তারা ভারতীয় ভূমি হতে ফিরে যেতে বাধ্য হয়। এ উদ্দেশ্যে ১৯২০ খৃষ্টাব্দে মুসলিমরা ঐক্যবদ্ধ হয় এবং তারা নড়াচড়া আরম্ভ করে। গান্ধী ছাড়াও, আহমাদ রেযা এ আন্দোলনের ক্ষতি করতে চেষ্টা করেছিল এবং একটি পুস্তিকা রচনা করেছিল। আর এতে সে এ (আন্দোলনে)'র কঠোর সমালোচনা করেছিল এবং এ আন্দোলনের নেতৃবৃন্দের উপর 'কুফরী'র ফতোয়া জারী করেছিল।

তাই এ উদ্দেশ্যে লিখা المحجة المؤتمنة في أية الممتحنة নামক পুস্তিকা, যা তার ফতোয়ায় অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে, সেখানে সে নিশ্চিত করেছে যে, "এ আন্দোলনের উদ্দেশ্য হলো ব্রিটিশদের থেকে স্বাধীনতা লাভ করা।"[১০৭]

একই বইয়ে জিহাদের বিরুদ্ধে সে লিখেছে: "হিন্দ এর (ভারতের) মুসলিমদের জন্য জিহাদ ফরয নয়।[১০৮] ফলে যে ব্যক্তি এর ফরযিয়াতের উপর ঐকমত্য পোষণ করে সে মুসলিমদের বিরোধী এবং তাদের ক্ষতি করতে চায়।"[১০৯]

সে আরও লিখেছে: "হুসেইন (রদ্বিয়াল্লাহু আনহু)-এর জিহাদ দ্বারা যুক্তি দেওয়া সঠিক নয়। কারণ তাঁর উপর যুদ্ধ চাপিয়ে দেওয়া হয়েছিল এবং এ সময়ের শাসকদের আর যুদ্ধ ফরয নয়, যতক্ষণ তার কাফিরদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার ক্ষমতা না থাকে। তাই আমাদের উপর জিহাদ কিভাবে ফরয হতে পারে যখন আমরা ব্রিটিশদের মোকাবেলা করতে অসমর্থ?"[১১০]

জিহাদ হতে এবং ব্রিটিশ ঔপনিবেশিকদের বিরোধিতা করা হতে মুসলিমদেরকে বিরত রাখার উদ্দেশ্যে সে লিখেছে, "আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ عَلَيۡكُمۡ أَنفُسَكُمۡۖ لَا يَضُرُّكُم مَّن ضَلَّ إِذَا ٱهۡتَدَيۡتُمۡۚ إِلَى ٱللَّهِ مَرۡجِعُكُمۡ جَمِيعٗا فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمۡ تَعۡمَلُونَ﴾

"হে মুমিনগণ, তোমাদের উপর তোমাদের নিজেদের দায়িত্ব। যদি তোমরা সঠিক পথে থাক তাহলে যে পথভ্রষ্ট হয়েছে সে তোমাদের ক্ষতি করতে পারবে না। আল্লাহর দিকেই তোমাদের সকলের প্রত্যাবর্তন; তখন তিনি

[১০৭] (المحجة المؤتمنة في أية الممتحنة, আহমাদ রেযা, পৃ-১৫৫)

[১০৮] (একই ফতোয়া দিয়েছে গোলাম আহমদ কাদিয়ানী)

[১০৯] (المحجة المؤتمنة في اية الممتحنة পৃ-২০৮;)

[১১০] (প্রাগুক্ত, পৃ-২১০)

তোমরা যা আমল করতে তা তোমাদের জানিয়ে দেবেন।” (সূরা মায়িদাহ-৫:১০৫)[১১১]

অর্থাৎ প্রত্যেক মুসলিমের ব্যক্তিগতভাবে আত্মসংশোধন করা উচিত এবং সম্মিলিত জিহাদের কোনো প্রয়োজন নেই। এ বইয়ের শেষাংশে ব্রিটিশদের বিরোধী নেতৃবৃন্দ ও ‘অসহযোগ আন্দোলনের সমর্থকদের সকলের উপর সে কুফরী ফতোয়া জারী করে।[১১২]

তার বই, دوام العيش এ জিহাদকে নস্যাৎ করার ফতোয়া দিয়েছিল, যেখানে সে লিখেছে: ভারতীয় মুসলিমদের উপর কোনো জিহাদ ও কিতালের হুকুম নাই।[১১৩]

যা হোক, আহমাদ রেযা সাহেবের ব্যাপারে এটাই স্বাভাবিক যে, সে ইংরেজদের দালাল এবং সে ব্রিটিশ বিরোধী যে কোনো আন্দোলনের বিরোধিতা করতো।

বেরেলভী আহমাদ রেযার এক মুরীদ লিখেছে, “মুসলিমরা আহমাদ রেযার ব্যাপারে সন্দিহান হয়ে গিয়েছিল।”[১১৪]

অপর একজন লেখক লিখেছে: “খলিফার বিষয়ে তার ভিন্নমত ছিল।

তার খিলাফত বিরোধিতার কারণে মৃত্যুর নিকটবর্তী সময়ে মুসলিমরা তার বিরুদ্ধে সমালোচনা করছিল এবং তার ভক্ত ও মুরীদরা তার প্রতি বিরক্ত হয়ে গিয়েছিল।[১১৫]

যাহোক, ঠিক যখন ব্রিটিশ ঔপনিবেশিকদের বিরুদ্ধে সংগ্রামে মুসলিমদের একতাবদ্ধ হওয়ার প্রয়োজন ছিল, ঠিক তখনই আহমাদ রেযা সাহেব তাদের স্বার্থ রক্ষার জন্য কাজ করছিল। এমনকি যদি তাকে ব্রিটিশদের দালাল নাও বলা হয়, তখনও এটা দিবালোকের মত স্পষ্ট যে, তার সকল কার্যক্রম ছিল মুসলিমদের বিরুদ্ধে এবং ইংরেজদের পক্ষে। কারণ সে শুধু

---

[১১১] [প্রাগুক্ত, পৃ-২০৬]

[১১২] [প্রাগুক্ত, পৃ-২১১]

[১১৩] (دوام العيش, পৃ-৪৬)

[১১৪] (মুকাদ্দিমা, دوام العيش, পৃ-১৮)

[১১৫] [কিতাবীদ দুনইয়া মুকালা হাসান নিজামী, পৃ-২; মুকাদ্দিমা, دوام العيش পৃ-১৮]

মুসলিমদের বিরোধিতাই করেনি এবং সে ব্রিটিশদের সমর্থক হিসেবেই রয়ে গিয়েছিল।

ফ্রান্সিস রবিনস আহমাদ রেযা সম্পর্কে লিখেছে: "আহমাদ রেযা বেরেলভী ব্রিটিশদের একজন সমর্থক ছিল। সে ১ম বিশ্ব যুদ্ধেও ইংরেজ শাসনকে সমর্থন করেছিল। অনুরূপভাবে, ১৯২১ সালে খিলাফত আন্দোলনের সময় সে ব্রিটিশদের একজন মদদদাতা ছিল এবং সে বেরেলীতে উলামাদের একটি সভার আয়োজন করেছিল, যারা ছিল অসহযোগ আন্দোলনের বিরোধী।"[১১৬]

৮. আহমাদ রেযার মৃত্যু

সে বক্ষব্যাধী রোগে মারা যায়। তার মৃত্যুর পূর্বে সে অনেকগুলো ওসীয়ত করে যায়, যা ওসীয়ত শরীফ নামে একটি বই আকারে প্রকাশিত হয়।

আহমাদ রেযা তার মৃত্যুর পূর্বে বলে, সকল ফরযের মধ্যে বড় ফরয হলো আমার দীন ও মাযহাবের উপর কায়েম থাকা যা আমার কিতাবসমূহে পাওয়া যাবে।[১১৭]

সে আরো বলে: "হে প্রিয় ভাইয়েরা! আমি কতদিন তোমাদের মাঝে অবস্থান করবো, আমি জানিনা। তোমরা হলো মুস্তফা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর নিষ্পাপ মেষ। তোমরা চারিপাশ দিয়ে নেকড়ে দ্বারা পরিবেষ্টিত, যারা তোমাদেরকে (যার উপর তোমরা রয়েছ, তা থেকে) পথভ্রষ্ট করতে চায়। আর তোমাদেরকে দুঃখ- কষ্টের সময় গ্রাস করতে চায়। তাদের সম্পর্কে সতর্ক থাক এবং তাদের থেকে দূরে থাক - যেমন দেওবন্দীগণ ও তারা ব্যতীত অন্যান্যরাও।"[১১৮]

তার ওসীয়তনামার শেষে সে লিখেছে: যদি তোমাদের ইচ্ছা হয়, তবে নিম্নোক্ত জিনিসগুলো হতে কিছু জিনিস মানতের সময় সপ্তাহে দুইবার করে আমার নিকট পাঠিও।

গৃহে উৎপন্ন হিমশীতল ঠাণ্ডা বরফ (অথবা যদি সম্ভব হয়) মহিষের দুধ হলে ভাল হয়, বিরিয়ানী, পোলাও, গোস্তের শামী কাবাব, প্যারাঠি (তেল বা ঘি'-এ ভাজা পিঠা) এবং মাখন, ফিরনী, মসুরীর ডাল, আদা ও প্রয়োজনীয়

---

[১১৬] (Indian Muslims, p-443, Cambridge University)

[১১৭] [ওয়াসীয়াত শরীফ, পৃ-১০]

[১১৮] হায়াতে আলা হযরত বেরেলভী, বাস্তাওয়ী, পৃ-১০৫

অন্যান্য জিনিস, গোস্তের কাচরী [গোস্তের পুর দেওয়া ভাজা পিঠা, আপেলের রস, ডালিমের রস, সোডা বোতল, হিমশীতল দুধ।

যদি পার এগুলোর মধ্যে হতে প্রতিদিন একটি করে যোগাড় কর, অথবা যা সহজ হয় তাই কর।" আর পাদটীকায় উল্লেখ করা হয়েছে, "ছোট মাওলানা বললেন, আপনি পুনরায় হিমশীতল দুধের কথা উল্লেখ করলেন। 'হুজুর! আপনি ইতোমধ্যেই এটি উল্লেখ করেছেন।' তাই তিনি (আহমাদ রেযা) বললেন, "ওটা আবার লিখ। ইনশা আল্লাহ আমার রব আমাকে কেবল বরফই (বা তুষার) প্রদান করবেন।" এবং সে রকমই ঘটেছিল, দাফনের সময় এক ব্যক্তি বাড়িতে উৎপন্ন হিমশীতল দুধ এনেছিল।"[১১৯]

বেরেলভী ফিরকার আহমাদ রেযা ২৫শে সফর, ১৩৪০ হিজরী (১৯২১ খ্রি.) সালে ৬৮ বছর বয়সে মৃত্যুবরণ করে।[১২০]

মনে হয়, জনাব বেরেলভীর জানাযায় লোকের উল্লেখযোগ্য লোক সমাগম হয়নি। যাহোক, এ ব্যাপারে আমরা নিশ্চিতভাবে কিছু বলতে পারছিনা, কারণ কোনো প্রমাণ ব্যতীত কোনোকিছু উল্লেখ করা আমাদের লেখার পদ্ধতি বিরুদ্ধ (কাজ) বলে আমরা মনে করি। যাহোক, আনুষ্ঠানিক সাক্ষ্য- প্রমাণ থেকে এ সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায় যে, তার তীব্র/ বিদ্রুপাত্মক ভাষা, ছোট-খাট বিষয়ে তার কুফরী ফতোয়া জারী করা এবং তার ব্রিটিশ বিরোধিতার ঘাটতির কারণে লোক জন তার প্রতি বিরক্ত হয়ে গিয়েছিল।

এক বেরেলভী লেখক দৃঢ়তার সাথে ঘোষণা করেছে যে, মুসলিমগণ আহমাদ রেযার প্রতি বিরক্ত হয়ে গিয়েছিল।[১২১]

আবার, তার 'খিলাফত'-এর বিরোধিতার কারণে তার ভক্ত ও মুরীদগণ তার সম্পর্কে হতাশ হয়ে গিয়েছিল।[১২২]

যখন বেরেলভীদের ইমাম ও মুজাদ্দিদ (এর কথা) আসে তখন তার ভক্ত মুরীদরা যেকোনো একভাবে অতিরঞ্জন এবং বাড়াবাড়ি করে। এমনকি যদি তার জানাযা অন্যান্য দীনি আলেমদের মতো হতো, তবে তাদের বই পুস্তক এ ধরনের (ঘটনার) অতিরঞ্জনে পরিপূর্ণ থাকতো। কিন্তু তারা এর প্রতি কোনো রকম

---

[১১৯] (ওয়াসীয়াত শরীফ, পৃ-১০৮:১০৯)

[১২০] [বাস্তাওয়ী, পৃ-১১১]

[১২১] [মুকাদ্দিমা, " دوام العيش", মাসুদ আহমেদ, পৃ-৮]

[১২২] [প্রাগুক্ত]

মনোযোগ দেয়নি। যাহোক, তার জানাযার ব্যাপারেও তারা বাড়াবাড়ি করতে ছাড়েনি কেবল লোকদের উপস্থিতি ('র বিষয়টি) বাদে।

৯. বেরেলভীদের বাড়াবাড়ি ও অতিরঞ্জন

যদিও তেমন কিছুই না, তবুও এখানে অনেক কল্পিত কাহিনী আছে, যারা কল্পকাহিনীর দাস তারা কল্পকাহিনী আবিষ্কার করা ছাড়া আর কি করবে?

এক ভদ্রলোক লিখেছে, যখন আহমাদ রেযার লাশের খাটিয়া উঠানো হলো তখন কিছু লোক দেখেছিল যে, কিছু ফেরেশতা তা তাদের কাঁধে উঠিয়ে নিলো।[১২৩]

তারা তার সম্পর্কে আরো বলে থাকে, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সকল সাহাবীদেরকে নিয়ে বেরেলভীর আসার অপেক্ষায় বসে ছিলেন, যখন তাকে তার ও সাহাবীদের চুপ করে থাকার কারণ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হলো তখন তিনি বললেন আমরা বেরেলভী আসার অপেক্ষা করছি।

এর থেকেও তারা বাড়িয়ে বলে, বেরেলভীর গোসলের জন্য রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সুগন্ধি হাদিয়া পাঠিয়েছিলেন।

তাদের বাড়াবাড়ি ও অতিরঞ্জনগুলো উল্লেখ করতে গিয়ে আরো কিছুর তালিকা দিতে হচ্ছে:

১. আমি কিছু পীরদের বলতে শুনেছি যে, আহমাদ রেযাকে দেখার পর তাদের সাহাবীদেরকে দেখার আকাংখা কমে গেছে।[১২৪]

"বিগত দুই দশকের মধ্যে এমন আলিম (অর্থাৎ আহমাদ রেযার মত) কেউ দেখেনি।[১২৫]

২. তার পাণ্ডিত্যপূর্ণ ক্ষমতা ও কারামতের কোনো সীমা ছিল না। আহমাদ রেযা সাহেব তার জ্ঞান ও মতামতের নির্ভুলতা ব্যাপারে ছিলেন অদ্বিতীয়।"[১২৬]

---

[১২৩] [আনওয়ার রেযা, পৃ-২৭২; প্রাগুক্ত রূহু কী দুনিয়া, মুকাদ্দিমা, পৃ-২২]

[১২৪] [ওয়াসীয়াত শরীফ, তারতীব হুসনাইন রেযা, পৃ-২৪]

[১২৫] [প্রাগুক্ত]

[১২৬] [শারহ আল হাকুক, মুকাদ্দিমাহ, পৃ-৮]

৩. “আহমাদ রেযা ধর্মীয় জীবন ও শিক্ষার পুনুরুজ্জীবন দান করেছিলেন।”[১২৭]

৪. ফতোয়া রিয্ভীয়াহ-তে এমন হাজারও প্রসঙ্গ রয়েছে যা আলেমগণ (কখনো) শুনেননি।”[১২৮]

৫. “যদি আবু হানিফা রহিমাহুল্লাহ “ফতওয়া রিয্ভীয়াহ” কিতাবটি দেখতেন তবে তিনি এর লেখককে তাঁর সাথীদের মাঝে অন্তর্ভুক্ত করতেন।[১২৯]

৬. “আহমাদ রেযা তার যুগের ইমাম আবু হানীফা ছিলেন।”[১৩০]

৭. ”আহমাদ রেযা তার অন্তরে আবু হানীফার কিয়াসী বুদ্ধিমত্তা, আবু বকর রাজির বিচক্ষণতা এবং কাজী খানের স্মৃতি ধারণ করেছিলেন।”[১৩১]

৮. “আহমাদ রেযা, সত্যের ক্ষেত্রে সিদ্দিকে আকবার (আবু বকর (রাদিয়াল্লাহু আনহু)) এর প্রতিচ্ছবি ছিলেন, মিথ্যাকে আলাদা করার ক্ষেত্রে তিনি ফারুকে আযম (ওমর ফারুক (রাদিয়াল্লাহু আনহু))-এর বিস্ময়কর অনুলিপি ছিলেন; দানশীলতা ও দয়ার ক্ষেত্রে তিনি যুন্নুরাইন (উসমান (রাদিয়াল্লাহু আনহু))-এর ছায়া ছিলেন এবং মিথ্যা বিলুপ্তিকরণে তিনি হায়দার (আলী (রাদিয়াল্লাহু আনহু))-এর তরবারী ছিলেন।”[১৩২]

৯. আহমাদ রেযা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর মুজিযাসমূহের মধ্য হতে একটি মুজিযা ছিলেন।[১৩৩]

১০. ‘আহমাদ রেযা দুনিয়ায় আল্লাহর হুজ্জাত ছিলেন।

এ সকল অতিরঞ্জিত দাবিসমূহ থেকে একথাই প্রমাণিত হয় যে, খাঁন সাহেব বেরেলভী’র ভক্ত মুরীদরা তাকে পবিত্র বলে ঘোষণা করতে চেয়েছে এবং তা করতে গিয়ে তারা একে অপরকে ছাড়িয়ে যেতে চেষ্টা করেছে।

আমরা পূর্ববর্তী পাতাগুলোতে উল্লেখ করেছি যে, বেরেলভীগণ বিশ্বাস করতো যে, তাদের আহমাদ রেযা ভুল থেকে ‘মাহফুজ’ (রক্ষিত) (অর্থাৎ

---

[১২৭] [প্রাগুক্ত, পৃ-৭]

[১২৮] [বাহারে শরীয়াত, ‘১ম খণ্ড, পৃ-৩]

[১২৯] (মুকাদ্দিমা, ফাতওয়া রিযভীয়াহ, ১১ খণ্ড, পৃ-৪)

[১৩০] (মুকাদ্দিমা, ফতোয়াহ রিযভিয়্যাহ, ৫ম খণ্ড)

[১৩১] [আনওয়ার রাজা, পৃ-২১০]

[১৩২] [প্রাগুক্ত, পৃ-৩৬২]

[১৩৩] [প্রাগুক্ত, পৃ-২৯০]

ভুলের উর্ধ্বে) এবং পাপ হতে পবিত্র (মা'সুম) ; আর নিঃসন্দেহে এটা নবীগণের জন্য খাস এবং আর অন্য কোনো ব্যক্তি মা'সুম - এ কথা বিশ্বাস করা 'খতমে নবুয়াত' অস্বীকার করার শামিল। আল্লাহ আমাদের সবাইকে সঠিক পথ দেখান এবং এ ধরনের আকীদা থেকে মুক্ত রাখুন। আমীন।

কিছু মাত্রাতিরিক্ত বাড়াবাড়ি/অতিরঞ্জনের উল্লেখ করার পর আরও কিছু উদ্ধৃতি দিয়ে আমরা এ আলোচনা শেষ করতে চাই। বলা হয়েছে যে, যখন জনাব আহমাদ রেযার বয়স সাড়ে তিন বছর, তখন সে একটি বাজার অতিক্রম করছিল। সে কেবল একটি বড় কুর্তা পরিহিত ছিল। কিছু তাওয়াইফ (বাইজী/নর্তকী) তার দিকে আসছিল। সে তার কুর্তা উঁচু করল এবং এ দিয়ে তার চোখ ঢাকল। তাওয়াইফ বলল: "হে ক্ষুদে শিশু! তুমি তোমার চোখ ঢেকেছো ঠিকই কিন্তু তোমার সতর খুলে ফেলেছ। মাত্র সাড়ে তিন বছর বয়সে বেরেলভীদের প্রতিষ্ঠাতা বলেন, যখন দৃষ্টি ভ্রষ্ট হয়, তখন ক্বলবও ভ্রষ্ট হয়। যখন ক্বলব ভ্রষ্ট হয় (কেবল তখনই) সতর ভ্রষ্ট হতে পারে।"[১৩৪]

এখন কে তাদেরকে জিজ্ঞাসা করবে যে, সাড়ে তিন বছর বয়সে তার দিকে আগত সাথীরা যে নর্তকী ছিল তা সে কিভাবে জেনেছিল এবং ছোট শিশু, যে এখনও সতর ঢাকা-ই শুরু করেনি, সে কিভাবে দৃষ্টির 'ভ্রষ্ট হওয়া' এবং কলবের জন্য সতরের 'ভ্রষ্টতার কারণ হওয়া' সম্পর্কে জেনেছিল?

কিন্তু মিথ্যা বলার জন্য কোনো বুদ্ধি-জ্ঞানের দরকার পড়ে না।

"আহমাদ রেযার পাণ্ডিত্যের ভয়ে ইউরোপের জ্ঞানী-বিজ্ঞানীরা এবং এশিয়ার দার্শনিকগণ থর থর করে কাঁপতেন।"[১৩৫]

"আহমাদ রেযা তার বিস্ময়কর স্মৃতি শক্তির মাধ্যমে ১৪ শত বছর পর্যন্ত সকল কিতাবাদি মুখস্থ করেছিল। তার মহান খ্যাতির বর্ণনা করার মত ভাষা খুঁজে পেতে ভাষাবিদরাও অক্ষম ছিল।"[১৩৬]

"যখন আহমাদ রেযা হজ্জ করতে যান, মাসজিদে খাইফে তাকে মাগফিরাতের (ক্ষমার) সুসংবাদ প্রদান করা হয়।"[১৩৭]

[১৩৪] [সাওয়ানেহ আলা হযরত, বদরুদ্দীন, পৃ-১১০; আনোয়ার রেযা]

[১৩৫] (রূহু কী দুনিয়া, পৃ-২৬)

[১৩৬] [আনোয়ার রেযা, পৃ-২৬৫]

[১৩৭] [হায়াতে আলা হযরত জাফরুদ্দীন বিহারী, পৃ-১২; আনওয়ার রেযা, পৃ-২৩৫]

তিনি ছিলেন মুজাদ্দিদ, সাইয়্যিদ, ইমাম, মুরশিদ, মালেকি, শাফেঈ, তার দরজা রোগমুক্তির দরজা, তিনি চোখসমূহের জোতি্য, কর্ণসমূহের শ্রবণ, তিনি আল্লাহর নুরের চেরাক, মুছত্বফার সুন্দর আয়না, আল্লাহর সিংহ এছাড়াও আরো অনেক বাড়াবাড়ি রয়েছে। যেমন-

তিনি প্রয়োজন পূরণকারী, বিপদ দূরকারী, মুশকিল আসানকারি, কাওসারের পানি দানকারী, কবর, পুনরুত্থান ও হাশরের সাথি, তিনি গাওস, কুতুবুল আওলিয়া, তিনি মুসত্বফা ও খিযিরের খলিফা, হেদায়াতের সাগর, তিনি সব কিছু ও রিযিক দেনেওয়ালা।

এ হলো জনাব বেরেলভী এবং তার অনুসারীরা এবং এ হলো তাদের শিক্ষা যা তারা বিস্তারিতভাবে লিখে প্রচার-প্রসার করে থাকে। অতিরঞ্জনের ক্ষেত্রে তাদের কোনো জুড়ি নাই। যারা আসে, মনে হয় তারা প্রত্যেকেই যারা চলে যায় (মৃত্যুবরণ করে) তাদেরকে শিরকে পরিপূর্ণ এ ধরনের নোংরামির দ্বারা সম্মান ও মর্যাদা প্রদান করে। আল্লাহ তাদেরকে হেদায়েত দান করুন।

আবার, "আমার হৃদয় হলো একটি হৃদয় (পাত্র) এবং যদি যেকোনো জ্ঞানের বিষয়ে কোনো প্রশ্ন উত্থাপন করা হয়, তৎক্ষণাৎ তার একটি জবাব চলে আসে।[১৩৮]

একবার বেরেলভী খান সাহেবের পীর সাহেব তার নিরাপত্তার জন্য দুটি কুকুর সংগ্রহ করেন। তখন সে (আহমাদ রেযা) তার দুই ছেলেকে তার পীর সাহেবের নিকট নিয়ে আসে এবং বলে যে, "আমি আপনার নিকট সুন্দর ও ভাল জাতের দুটি কুকুর নিয়ে এসেছি। দয়া করে তাদের গ্রহণ করুন।"[১৩৯]

সুতরাং এ হলো আহমাদ রেযা খান সাহেবের ব্যক্তিত্বের দুটি রূপ। একদিকে তার বর্ণনা দেওয়া হয়েছে ইমাম, গাউস, কুতুব এবং বিপদ দূরকারী ইত্যাদি উপাধিসহ; আবার অপরদিকে সে একটি নীচু শ্রেণির নোংরা প্রাণীর (কুকুরের) সাথে নিজের তুলনা করে গর্ববোধ করে।

১০. বেরেলভীদের নেতৃবর্গ

বেরেলভীদের কিছু বড় বড় ব্যক্তিত্বের নাম উল্লেখ করার মাধ্যমে আমরা এ অধ্যায়টি শেষ করতে চাই, যারা বেরেলভী মতবাদ গঠন, প্রতিষ্ঠা ও এ

---

[১৩৮] [মুকাদ্দিমা শারহুল হুকুক]

[১৩৯] [আনোয়ার রেযা, পৃ-২৩৮]

মতবাদকে শক্তিশালী করতে এবং এ মতবাদের আকীদা, বিশ্বাস, মূলনীতি গঠন করতে সাহায্য করে। তাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য:

(১) নাঈমুদ্দীন মুরাদাবাদী। তার জন্ম জানুয়ারী ১৮৮৩ খ্রিষ্টাব্দে। তিনি জনাব বেরেলভী সাহেবের সমসাময়িক ছিলেন। সেও জনাব বেরেলভী সাহেবের মত তাওহীদ ও সুন্নাহর বিরোধিতা এবং শিরক ও বিদআতের সমর্থন করেছিল এবং সে শরীয়াত বিরোধী অনুষ্ঠান ও রসম - রেওয়াকে জনপ্রিয় করার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিল। তার একটি মাদরাসা ছিল যাকে 'মাদরাসা আহলুস সুন্নাহ' বলা হতো। অতঃপর তা 'জামিয়াহ নাঈমিয়াহ' তে পরিবর্তিত হয়েছিল। এ মাদরাসা হতে পাশ করা ছাত্রদেরকে 'নাঈমী' বলে ডাকা হয়। তার রচনাবলির একটি হলো, 'খাজাইন আল আরফান'', আহমাদ রেযা খানের কুরআনের তরজমার সাথে প্রকাশিত হয়েছিল। 'আত তাইয়েবুল বয়ান, যা শাহ ইসমাইল শহীদের 'তাকভীয়াতুল ঈমান' এর জবাবে লিখিত[১৪০] এবং আল কালিমাতুল' উলিয়্যা'' উল্লেখযোগ্য। তিনি ১৯৪৮ খ্রিষ্টাব্দে মৃত্যুবরণ করেন। বেরেলভীগণ তাকে 'সদরুল ফাযিল' উপাধিতে ভূষিত করে।

(২) আমজাদ আলী, যিনি ভারতের আযমগড় জেলায় ১৩২০ হিজরীতে জন্মগ্রহণ করেন এবং জৌনপুরের' মাদরাসা ই হানাফিয়্যাহ'-তে পড়াশোনা করেন। জনাব আমজাদ আলী কিছু সময়ের জন্য আহমাদ রেযার তত্ত্বাবধানেও ছিলেন। সে আহমাদ রেযার মতবাদ প্রতিষ্ঠায় বিরাট ভূমিকা পালন করে। তার বই "বাহারে শরীয়াত" বেরেলভী ফিকহের প্রামান্য গ্রন্থ, যাতে আহমাদ রেযার মতাদর্শের আলোকে ব্যাখ্যাকৃত ফতোয়া রয়েছে। তিনি ১৩৬৭ হিজরী, ১৯৪৮ সনে মারা যান।

(৩) সৈয়দ দীদার আলী। যিনি ১২৭০ হিজরীতে নওয়াবপুরে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি আহমাদ আলীর নিকট হতে শিক্ষা গ্রহণ করেন এবং ১২৯৩ হিজরীতে তার শিক্ষা সমাপ্ত করেন। তিনি স্থায়ীভাবে লাহোরে চলে যান।

তার সম্পর্কে বলা হয় যে, মাওলানা দীদার আলী লাহোরকে ওয়াহাবী এবং দেওবন্দী ফিতনা হতে রক্ষা করেন। তিনি ১৯৩৫ খ্রি. মৃত্যুবরণ করেন।"[১৪১] তার কর্মের মধ্যে "তাফসীর মিযান-আল-আদিয়্যান" এবং "আলামাতে ওয়াহাবীয়্যাহ" ছিল উল্লেখযোগ্য।

---

[১৪০] এ বইয়ের খণ্ডনে একই মুরাদাবাদের আহলুল হাদীসের আলেম মাওঃ আযিযুদ্দীন মুরাদাবাদী কর্তৃক লিখিত তার বই "আকমালুল বয়স ফী তা'ঈদ তাকবীয়াতুল ঈমান-এ নাঈমুদ্দীনের এর দাবিসমূহকে মিথ্যা প্রমাণ করেন।]

[১৪১] (প্রাগুক্ত, পৃ-৯৪; তাযকীরাহ উলামা-এ আহলুস সুন্নাহ)

(৪) হাশমত আলী। তিনি লাক্ষ্মৌ এ জন্ম নেন। তার বাবা ছিলেন সাইয়্যেদ 'আইন আল-কাদাহ'-এর মুরীদগণের অন্যতম। তিনি জনাব বেরেলভীর মাদরাসাহ 'মানজারে ইসলামে' পড়ালেখা করেন। তিনি আমজাদ আলীর অধীনেও লেখাপড়া করেন এবং ১৩৪০ হিজরীতে তার পড়ালেখা শেষ করেন। তিনি আহমাদ রেযার ছেলের নিকট হতে সনদ লাভ করেন এবং অতঃপর আহমাদ রেযার আকীদা বিশ্বাস প্রচার-প্রসারে আত্মনিয়োগ করেন। আহমাদ রেযার ছেলে তাকে "গাইযুল[১৪২] মুনাফিকীন" উপাধি দেন। ১৩৮০ হিজরীতে তিনি ক্যান্সারে আক্রান্ত হন। অতঃপর 'বীলী ভেট' এ মৃত্যু করেন।[১৪৩]

(৫) আহমাদ ইয়ার নাঈমী। সে বাদাইয়্যুন এ ১৯০৬ খ্রি. জন্মগ্রহণ করে। সে প্রাথমিকভাবে দেওবন্দী মাদরাসা 'আল মাদরাসাতুল ইসলামিয়্যাহ' -তে লেখাপড়া করেন। অতঃপর সে নাঈমুদ্দীন মুরাদাবাদীর নিকট গমন করে এবং তার নিকট থেকে লেখাপড়া শেষ করেন। অনেক শহর ঘুরে বেড়ানোর পরে সে অবশেষে গুজরাটে বসবাস শুরু করেন এবং সেখানে 'জামেয়া গাউসিয়া' নামে একটি মাদরাসা প্রতিষ্ঠা করেন। তার বই 'জা আল-হাক্ব'-এ জনাব বেরেলভীর মতবাদ জোরালোভাবে সমর্থন করেন এবং কুরআন ও সুন্নাহর বিরোধিতার উপর জোর দেন।

জনাব আহমাদ ইয়ার সাহেব আহমাদ রেযা খানের 'কুরআনের তরজমা'-এর জন্য নূর আল ইরফান একটি হাশিয়া লিখেন, যেখানে সে কুরআনের অনেক আয়াতের তা'বীল করে এবং অর্থের বিকৃতি সাধন করে। এ ধরনের নামের আরো একটি বই আছে। সে ১৯৭১ সালে মৃত্যুবরণ করেন।

এ হলো বেরেলভী মতাদর্শের নেতৃবৃন্দ (আকাবীগণ) যারা এ মাযহাবের মূলনীতি ও বিধি বিধানের ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ করেছে। এরাই আহমাদ রেযা কর্তৃক রোপিত চারা গাছের লালন-পালন ও পরিপুষ্টি সাধনের কাজ আঞ্জাম দিয়েছে। ইনশাআল্লাহ আমরা পরবর্তী অধ্যায়ে তাদের আকীদা-বিশ্বাসসমূহের (বিস্তারিত) ব্যাখ্যা করব।

---

[১৪২] [রাগ, ক্রোধ]

[১৪৩] [তাযকীরাহ উলামায়ে আহলুস সুন্নাহ, মাহমুদ বেরেলভী. পৃ-৮২, কানপুর]

দ্বিতীয় অধ্যায়

বেরেলভী মতবাদ ও তাদের আকীদা-বিশ্বাস

বেরেলভীদের আকীদা:

বেরেলভীদের সুনির্দিষ্ট কিছু বিশেষ আকীদা-বিশ্বাস রয়েছে যেগুলো তাদেরকে সাধারণভাবে ভারতীয় উপমহাদেশের হানাফী মাযহাবের অনুসারী ও অন্যান্য ফিরকা থেকে আলাদা করেছে। তাদের অনেক আকীদা বিশ্বাস শিয়াদের আকীদার অনুরূপ। এটা বলা অযৌক্তিক হবে না যে, বেরেলভীয়্যাহ (ফিরকা) আহলুস সুন্নাহর চেয়ে শিয়াদেরই অধিক নিকটবর্তী, তবে বলা যাচ্ছে না কে কার দ্বারা প্রভাবিত। আমরা তাদের আকীদাসমূহ বর্ণনা করার পূর্বে পাঠকের সামনে দুটো বিষয় উল্লেখ করতে চাই।

ক. যে সকল আকীদা-বিশ্বাস বেরেলভীগণ অবলম্বন করেছে এবং যেগুলো ভারতীয় উপমহাদেশে ব্যাপকভাবে প্রচারিত হচ্ছে, সেগুলো এমনই কাল্পনিক, অন্ধ তাকলীদী (অনুসরণীয়), কুসংস্কারাচ্ছন্ন ও অবাস্তব-উদ্ভট আকীদা বিশ্বাসের উপর ভিত্তি করে গড়ে ওঠেছে, যেগুলো বিভিন্ন সময়ে সুফীগণের ও কুসংস্কারাচ্ছন্ন ও সরল বিশ্বাসী লোকদের মাঝে সুবিদিত ছিল। আর ইসলামী হুকুম আহকামের সাথে এগুলোর কোনোই সম্পর্ক ছিল না। কিন্তু সেগুলো ইহুদী-খ্রিষ্টান ও কাফের-মুশরিকদের থেকে অতি সংগোপনে মুসলিমদের মাঝে প্রবেশ করেছে।

যুগে যুগে মুসলিম আলিম ও মুজতাহিদগণ এ সকল মিথ্যা-বাতিল আকীদা-বিশ্বাসের বিরুদ্ধে সারিবদ্ধভাবে যুদ্ধে অবতীর্ণ হয়েছেন। তাদের মাঝে এমন সব আকীদা বিশ্বাস রয়েছে যেগুলো ইসলাম-পূর্ব জাহেলী যুগের সাথে সম্পর্কিত এবং সেগুলোর খণ্ডন কুরআন ও রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর বাণীতেই পাওয়া যায়।

অতীব দুঃখের বিষয় যে, কিছু লোক বিশ্বাস করতে শুরু করেছে যে, এসকল অনৈসলামী আকীদা এবং জাহিলিয়্যাতের আকীদায় বিশ্বাস করা ফরয এবং এগুলো ইসলামের মৌলিক আকীদা বিশ্বাসের মধ্যে গণ্য, যেখানে আল্লাহ তা'আলা ও রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সেগুলোকে মিথ্যা বলে ঘোষণা করেছেন।

উদাহরণস্বরূপ, আল্লাহকে বাদ দিয়ে অন্যের নিকট কাকুতি মিনতি করে প্রার্থনা করা বা অভাব-অভিযোগ পেশ করা, নবী রাসূলগণের মানবত্বকে অস্বীকার করা, এ বিশ্বাস রাখা যে, কোনো ব্যক্তির গায়েবের জ্ঞান রয়েছে এবং

নবী রাসূল ও ওলীগণকে আল্লাহর ক্ষমতায় শরীক করা যেগুলো কেবল আল্লাহ তা'আলার জন্যই খাস এবং এরকম আরো অন্যান্য বিশ্বাস যেগুলো সামনের অনুচ্ছেদসমূহে আমরা উল্লেখ করব (ইনশা আল্লাহ)। এখানে যা বোঝানো হচ্ছে তা হলো, এসকল বিকৃত, কুফরী এবং কাল্পনিক উদ্ভট কিচ্ছা-কাহিনীসমূহকে আকীদার নামে নামকরণ করা হয়েছে, এমনকি যদিও এ বিকৃতি, এ বিদআতসমূহ, মুশরিকদের রীতি-রেওয়াজ এবং জাহিলিয়্যাতের কুসংস্কারসমূহ, ধ্যান-ধারণা ও আকীদা-বিশ্বাসসমূহ জনাব আহমাদ রেযা বেরেলভী সাহেবের ও তার অনুসারীদের সম্মুখে উপস্থিত ছিল। কিন্তু তারা এ সবগুলোকে একটি একক রূপ দান করেছে এবং কুরআন-সুন্নাহর অর্থ বিকৃতির সাহায্যে এবং জাল-জয়ীফ হাদীসকে ব্যবহার করে সেগুলোকে প্রাতিষ্ঠানিক রূপ দেয়ার অপচেষ্টা করেছে।

খ. দ্বিতীয় বিষয়টি যা আমরা এখানে ব্যাখ্যা করতে চাই তা হলো আমরা এ অধ্যায়ে কেবল সেই সকল বেরেলভী আকীদাসমূহ উল্লেখ করব যেগুলো জনাব আহমাদ রেযা বেরেলভী, তার সহযোগীরা এবং তার দলের সুপরিচিত ব্যক্তিগণ তাদের কিতাবাদিতে লিখেছে। যাদেরকে তাদের মতে মর্যাদাসম্পন্ন বা বিশ্বস্ত বলে গণ্য করা হয় না, কিংবা যারা বিতর্কিত ব্যক্তিত্ব, এমনকি যদিও তাদের লেখাগুলো ও বাড়াবাড়ি-অতিরঞ্জনে পূর্ণ, আমরা সেসকল লোকদের থেকে কোনো উদ্ধৃতি দেব না, যাতে আমাদের অবস্থানের মধ্যে কোনো দুর্বলতা অগোচরে প্রবেশ করতে না পারে।

১. আল্লাহ ছাড়া অন্যের নিকট আশ্রয় চাওয়া ও সাহায্য প্রার্থনা করা:

বেরেলভীরা এমনকিছু বলে যা ইসলামে নেই, বরং ইসলাম সেগুলোকে প্রত্যাখ্যান করেছে। যেমন-তারা বলে,

"আল্লাহর এমন কিছু বান্দা আছে যাদেরকে সৃষ্টির রোগ ও সমস্যা দূরীকরণের জন্য আল্লাহ বিশেষভাবে বাছাই করেছেন। লোকেরা তাদের সমস্যা এবং বিচার-আচার তাদের নিকট নিয়ে যাবে।"[১৪৪]

[১৪৪] আল আমান ওয়াল আলা, আহমাদ রেযা খান বেরেলভী, পৃ-২৯, দারুত তাবলীগ, লাহোর।

"আল্লাহ ছাড়া অন্যদের নিকট সাহায্য চাওয়া ও আশ্রয় প্রার্থনা করা জায়েয বা বৈধ এবং পছন্দনীয়। অহংকারী কিংবা একগুয়ে ব্যতীত কেউ এর বিরোধিতা করবে না।"[১৪৫]

"যার কাছে সাহায্য চাওয়া হবে বা আশ্রয় প্রার্থনা করা হবে সে জীবিত হোক বা মৃত উভয়ই সমান। তারা নবী হোক বা রাসূল হোক বা আউলিয়া হোক কোন পার্থক্য নেই। কেননা তারা সেগুলো (প্রয়োজন পূরণ করা, বিপদ দূর করা, রোগ মুক্ত করা, দুঃখ কষ্ট দূর করা) দেয়ার মালিক।

বেরেলভী বলে, "নবী, রাসূল, আউলিয়া, আলিমগণ এবং নেককারগণের নিকট সাহায্য চাওয়া বা তাদের কাছে দুআ করা জায়েয।[১৪৬] তিনি আরো বলেন, আল্লাহর রসূল বিপদ আপদ দূরকারী ও অনুগ্রহকারী।"

সে আরও লিখেছে: "জিবরাঈল আলাইহিস সালাম হলেন দুঃখ-কষ্ট দূরকারী; তাহলে হুজুরে আকদাস (রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কে বিপদ-মুসীবত দূরকারী ও রোগের আরোগ্যদাতা হিসেবে গ্রহণ করতে কে দ্বিধা করে যখন তিনি জিবরাঈলের বিপদও দূর করে দেন।"[১৪৭]

শুধু রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-ই স্রষ্টাসুলভ ক্ষমতার মালিক নন, উপরন্তু আলী (রাদিয়াল্লাহু আনহু) ও সকল ক্ষমতার মালিক। আরবী কবিতা দিয়ে যুক্তি পেশ করেছে,

"আলী মুর্তজাকে ডাক, কারামতের প্রকাশ, তুমি তাকে পাবে এভাবে যে বিপদে সাহায্য করে সকল দুঃশ্চিন্তা এবং দুঃখ-কষ্ট নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে, তার বেলায়েতের দ্বারা, হে আলী, হে আলী!"[১৪৮]

শায়খ আব্দুল কাদের জীলানীরও অনুরূপ বিপদ দূর করা, রোগের আরোগ্যদান করা, সাহায্য করার ক্ষমতা আছে। তার উপর মিথ্যা ও অপবাদ আরোপ করে বেরেলভী ভদ্রলোক তার থেকে উদ্ধৃতি দিয়েছে,

"যে দুঃখ-কষ্টে আমাকে আহ্বান করে, তার দুঃখ-কষ্ট দূর হয়ে যাবে এবং দুঃখ-কষ্টে যে আমার নাম ধরে ডাকে তার দুঃখ কষ্ট ম্লান হয়ে যাবে এবং

---

[১৪৫] রিসালা হায়াত আল মাউত ফী ফতোয়া রিযভিয়্যাহ, আহমাদ রেযা, ৪র্থ খণ্ড, পৃ-৩০০, পাকিস্তান

[১৪৬] প্রাগুক্ত।

[১৪৭] মালফুযাত, পৃ-৯৯, লাহোর।

[১৪৮] আল আমান ওয়াল আলা, পৃ-১৩।

যে ব্যক্তি যেকোনো প্রয়োজনে তার প্রভুর কাছে প্রার্থনা করে এবং আমাকে ওসীলা বানায়, তার প্রয়োজন পূরণ হবে।"[১৪৯]

এমনকি কাযায়ে হাজত' এর জন্য তাদের রয়েছে 'সালাতুল গাউসিয়া'। এর পদ্ধতি হলো- "প্রতি রাক'আতে সূরা ইখলাস **১১** বার, দরুদ ও সালাম **১১** বার, তারপর বাগদাদের দিকে **১১**টি 'জনাব শিমালী কদম' ফেলবে এবং প্রতি কদমে আমার নাম নিতে হবে এবং তার প্রয়োজনের কথা বলবে এবং এ পংক্তিটি আবৃত্তি করবে।"

"আমাকে কি কোনো দুঃখ-কষ্ট স্পর্শ করতে পারে যখন তুমি আমার সাহসের কারণ?

এবং দুনিয়াতে কোনো ক্ষতি আমাকে স্পর্শ করতে পারে কি যখন তুমি আমার সাহায্যকারী?"[১৫০]

একথা লেখার পর আহমাদ ইয়ার গুজরাটি লিখেছে যে, এখন জানা গেল যে, যারা মরে গেছে তাদের কাছ থেকে সাহায্য কামনা করা জায়েয এবং উপকারী। জনাব বেরেলভী মাঝে মাঝেই এ পংক্তিগুলো আবৃতি করতো[১৫১]

আল্লাহর ছায়া হে আব্দুর কাদের

আল্লাহর অংশ হে আব্দুল কাদের

দয়া কর দয়া কর দয়াময় আব্দুল কাদের

আমাদের বিপদ আপদ দূর করে দাও আব্দুল কাদের।

যেমন বেরেলভী লিখেছে,

মুসলিমদের আশ্রয়স্থল হলেন আব্দুল কাদের।

বেরেলভী আরো লিখেছে,

" আমি যখনই সাহায্য প্রার্থনা করেছি বা আশ্রয় চেয়েছি কেবল আব্দুল কাদেরের নিকটই প্রার্থনা করেছি বা আশ্রয় চেয়েছি, তখন 'ইয়া গাউস' ই বলি, কিন্তু একদিন অন্য একজন ওলী (মাহবুবে ইলাহী) কে আহ্বান করার

[১৪৯] বারকাতুল ইসতিমরায, বেরেলভী, রিসালা রিযভিয়্যাহ, ১ম খণ্ড, পৃ-১৮১; এবং ফতোয়া আফ্রিকা, বেরেলভী।

[১৫০] জা-আল হাক্ব, মুফতী বেরেলভী আহমদ ইয়ার খাঁন, পৃ-২০০।

[১৫১] হাদায়িক বাকশীশ, পৃ-১৮৪।

ইচ্ছা করেছিলাম, কিন্তু আমার জিহবা তা উচ্চারণ করতে পারেনি, কেবল 'ইয়া গাওস' শব্দটিই আমার মুখ থেকে বের হয়েছে।"[১৫২]

অর্থাৎ সে এমনকি আল্লাহকে ডাকতে পারত না, হে আল্লাহ! সাহায্য করুন' বলতে পারত না! বরং সে সর্বদা বলতো, 'হে গাওস'- আমাকে সাহায্য করুন!'

তাদের সাথে আহমাদ জারুকও দুঃখ-দুর্দশা দূর করতে পারতো তাই বেরেলভী বুযুর্গগণ তাদের বইতে একটি আরবী কবিতা বর্ণনা করেছে,

"আমি আমার মুরীদগণের বিচ্ছিন্নতার একত্রকারী, যখন তাকে দুর্দশা দুঃখ-কষ্ট পীড়া দেয়, যদি সে দুঃখ -দুর্দশায়, 'হে জারুক'! বলে ডাকে তখন আমি দ্রুত তার কাছে চলে আসি।"[১৫৩]

অনুরূপ ইবনু আলওয়ান এসব ক্ষমতার মালিক, তাই বলা হয় যে, "কারো কোনো জিনিস হারিয়ে গেলে সে যদি চায় যে আল্লাহ তাকে সেটা ফিরিয়ে দিক, তবে সে কোনো উচ্চ স্থানে যাবে এবং কিবলা মুখী হবে অতঃপর সূরা ফাতিহাহ পাঠ করবে এবং এর সওয়াব নবী সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এবং অতঃপর সাইয়্যেদ আহমাদ বিন আলওয়ানের উপর বখ্শিয়ে দিবে, অতঃপর দুআ করবে-

'হে আমার নেতা, আহমাদ বিন আলওয়ান! তুমি যদি আমার (হারানো) জিনিস আমাকে ফিরিয়ে না দাও, তবে তোমাকে আউলিয়ার দপ্তর থেকেই আমি সরিয়ে দেব।"[১৫৪]

সাইয়্যেদ মুহাম্মদ হানাফী দূর থেকে শুনতে ও গায়েবীভাবে মুরীদকে সাহায্য করতে পারে। জনাব বেরেলভী লিখেছে,

"সাইয়্যেদ মুহাম্মদ শামসুদ্দীন আল হানাফী তার ব্যক্তিগত কামরায় উযু করছিলেন। হঠাৎ তিনি তার একটি সেণ্ডেল তুলে নিয়ে শূন্যে নিক্ষেপ করলেন এবং এটা অদৃশ্য হয়ে গেল। এমনকি যদিও তার সেই কামরায় কোথাও যাওয়ার কোনো রাস্তা ছিল না। সে তার (অপর) সেণ্ডেলটি তার মুরীদকে দিয়ে একে সংরক্ষণ করতে বললেন যতক্ষণ প্রথম সেণ্ডেলটি ফিরে না আসে। অনেকদিন পর একটি লোক কিছু হাদিয়াসহ সেই সেণ্ডেলটি 'শাম' থেকে নিয়ে এল। বলল,

[১৫২] মালফুযাত, পৃ-৩০৭।

[১৫৩] হায়াত আল মাউত ফী ফতোয়া রিযভিয়্যাহ, ৪র্থ খণ্ড, পৃ-৩০০; এবং "জা-আল হাক্ক, পৃ-১৯৯।

[১৫৪] জা-আল হাক্ক, পৃ-১৯৯।

"আল্লাহ (মুহাম্মদ হানাফী) কে উত্তম পুরস্কার দান করুন। যখন একটি চোর আমার বুকের উপর চড়ে আমাকে হত্যা করতে উদ্যত হয়েছিল, আমি মনে মনে বললাম, 'হে সাইয়্যেদী মুহাম্মদ হানাফী,' এবং ঠিক সে সময় এই সেণ্ডেলটি কোথা হতে জানি এলো এবং তার বুকে আঘাত করল, আর সে ব্যথায় পড়ে গেল।"[১৫৫]

অনুরূপ সাইয়্যেদ আহমাদ বাদাবীও লোকদের সাহায্য করে এবং তাদের সমস্যা ও দুঃখ কষ্ট দূর করে। যখন কেউ বিপদে পড়ে, তখন সে যেন বলে, "হে আমার মালিক, আহমাদ বাদাবী, আমাকে রক্ষা (সাহায্য) করো।"[১৫৬]

সাইয়্যেদ বাদাবীর নিজের থেকে বর্ণিত, "যার কোনো কিছু প্রয়োজন হয়, সে যেন আমার কবরের নিকট যায় এবং তার প্রয়োজন আমার কাছে চায়, তবে আমি তার প্রয়োজন পূরণ করব।"[১৫৭]

অনুরূপ আবু ইমরান মূসাও বলেন, "যখন তার কোনো মুরীদ তাকে আহ্বান করে, তখন সে তার জবাব দেয়, এমনকি যদিও সে শত বছরের রাস্তা কিংবা তার চেয়েও বেশি দূরত্বে অবস্থান করে।"[১৫৮]

এ ব্যাপারে বেরেলভী নিজের আকীদা প্রকাশ করেছে এবং লিখেছে, "কোনো ব্যক্তি কোনো নবী, রাসূল অথবা, ওলীর সাথে সম্পৃক্ত থাকে তখন তিনি (নবী, রাসূল বা ওলী) তার ডাকে উপস্থিত হন এবং তার প্রয়োজন সহজ করণে সাহায্য করেন।"[১৫৯]

সুফীবাদের সাথে সম্পৃক্ত আলিমগণেরও মুশকিল আসানের ক্ষমতা রয়েছে। জনাব আহমাদ রেযা লিখেছেন: "সুফী শায়খরা তাদের অনুসারী ও মুরীদগণের সুদিনে ও দুর্দিনে তাদের উপর নজর রাখে (হেফাজত করে)।"[১৬০]

[১৫৫] মাজমুআ রাসাইল রিযভিয়্যাহ, বেরেলভী, ১ম খণ্ড, পৃ-১৮০, করাচি

[১৫৬] প্রাগুক্ত

[১৫৭] প্রাগুক্ত, পৃ-১৮১।

[১৫৮] মাজমুআ রাসাইল রিযভিয়্যাহ, বেরেলভী, ১ম খণ্ড, পৃ-১৮২, করাচি।

[১৫৯] ফতোয়া আফ্রিকা, বেরেলভী, পৃ-১৩৫।

[১৬০] হায়াত ওয়াল মাউত ফী ফতোয়া রিজভীয়্যাহ, ৪র্থ খণ্ড, পৃ-২৮৯।

কবরবাসীদের নিকট সাহায্য কামনা করার আকীদা উল্লেখ করার সময় জনাব বেরেলভী লিখেছে, "যখনই তুমি তোমার কাজে 'মেহতির' (সমস্যা)-এ পড়বে, তখনই কবরে শায়িত ওলীগণের নিকট সাহায্য প্রার্থনা করবে।"[১৬১]

কবর যিয়ারতের মাহাত্ম্য বর্ণনা করার সময় আহমাদ রেযার এক অনুসারী লিখেছে, "কবর যিয়ারতের উপকারীতা রয়েছে, নেককার মৃত ব্যক্তিদের কাছ থেকে সাহায্য প্রার্থনা করা যেতে পারে।"[১৬২]

সে আরো বলেছে, "কবর যিয়ারতের উদ্দেশ্য হলো, কবরবাসীদের কাছ থেকে উপকার লাভ করা।"[১৬৩]

মূসা কাজিমের কবরের সম্পর্কে সে উল্লেখ করেছে, " মূসা কাজিমের কবর একটি রোগ নিরাময়কারী ঔষধ।"[১৬৪]

অনুরূপ মুহাম্মদ বিন ফারগাল সম্পর্কে সে বলেছে যে, "যেকোনো প্রয়োজনে তার কবরের নিকট গিয়ে চাইলে সে তার প্রয়োজন পূরণ করবে।"[১৬৫]

আহমাদ রেযা বেরেলভী নিজে মুহাম্মদ বিন ফারগাল কে উদ্ধৃত করেছে যে, তিনি বলতেন, "আমি তাদের মধ্যকার একজন যারা তাদের কবরসমূহ অধিকার করে। সুতরাং যখনই কারো কোনো প্রয়োজন হয়, সে যেন আমার দিকে আমার মুখের কাছে আসে এবং তার প্রয়োজন প্রার্থনা করে, আমি তা পূরণ করব।"[১৬৬]

সাইয়্যেদ বাদাবীকে উদ্ধৃত করার পর সে লিখেছে যে, (তিনি বলেন), 'আমার ও তোমার মাঝে রয়েছে কেবল এই কয়েক মুঠো মাটি এবং যে লোকটিকে এই মাটি তার সঙ্গী-সাথীদের থেকে গোপন করে রাখে, সে তো কোনো পুরুষই নয়।" [১৬৭]

---

[১৬১] আল আমান ওয়াল আলা, পৃ-৪৪।

[১৬২] ফতোয়া কুয়ুদ, মুহাম্মদ উসমান বেরেলভী, পৃ-৩৯।

[১৬৩] প্রাগুক্ত, পৃ-৪৩।

[১৬৪] প্রাগুক্ত, পৃ-৫।

[১৬৫] আনওয়ারুল ইনতিবাহ ফী মাজমু' রাসায়েল রিজভীয়্যাহ, আহমাদ রেযা, ১ম খণ্ড পৃ- ১৮২।

[১৬৬] প্রাগুক্ত, পৃ-১৮২।

[১৬৭] প্রাগুক্ত, পৃ-১৮১।

কুরআন থেকে তাদের আকীদার খণ্ডন

একদিকে এ হলো বেরেলভীদের আকীদাসমূহ এবং অপরদিকে রয়েছে কুরআন ও রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর হাদীসের শিক্ষা। আপনি এগুলো তুলনা করতে পারেন যাতে সত্য প্রকাশিত হতে পারে যে, কুরআনে উল্লেখিত তাওহীদ বলতে কী বোঝায় এবং এদের আকীদাসমূহ কী কী। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿ إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ﴾

"আমরা একমাত্র আপনারই ইবাদত করি এবং একমাত্র আপনার নিকটই সাহায্য প্রার্থনা করি।" (সূরা আল ফাতিহা ১ : ৫) আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন,

﴿قُلِ ٱدْعُواْ ٱلَّذِينَ زَعَمْتُم مِّن دُونِ ٱللَّهِ لَا يَمْلِكُونَ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ فِي ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَلَا فِي ٱلْأَرْضِ وَمَا لَهُمْ فِيهِمَا مِن شِرْكٍ وَمَا لَهُۥ مِنْهُم مِّن ظَهِيرٍ﴾

"(হে নবী) তুমি বল, তোমরা আহ্বান কর তাদেরকে যাদেরকে তোমরা আল্লাহর পরিবর্তে (মা'বুদ) মনে করতে, তারা আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীতে অণু পরিমাণ কিছুর মালিক নয় এবং এতদুভয়ে তাদের কোনো অংশও নেই এবং তাদের কেউ তার সহায়কও নয়।" (সূরা সাবা ৩৪: ২২)

আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন,

﴿إِن تَدْعُوهُمْ لَا يَسْمَعُواْ دُعَآءَكُمْ وَلَوْ سَمِعُواْ مَا ٱسْتَجَابُواْ لَكُمْ ۖ وَيَوْمَ ٱلْقِيَٰمَةِ يَكْفُرُونَ بِشِرْكِكُمْ ۚ وَلَا يُنَبِّئُكَ مِثْلُ خَبِيرٍ ﴾

"তোমরা তাদেরকে আহ্বান করলে তারা তোমাদের আহ্বান শুনবে না এবং শুনলেও তোমাদের আহ্বানে সাড়া দিবে না। তোমরা তাদেরকে যে শরীক করেছো তা তারা কিয়ামতের দিন অস্বীকার করবে। সর্বজ্ঞের ন্যায় কেউই তোমাকে অবহিত করতে পারে না।" (সূরা ফাতির ৩৫ : ১৪)।

আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন,

﴿قُلۡ أَرَءَيۡتُمۡ شُرَكَآءَكُمُ ٱلَّذِينَ تَدۡعُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ أَرُونِي مَاذَا خَلَقُواْ مِنَ ٱلۡأَرۡضِ أَمۡ لَهُمۡ شِرۡكٞ فِي ٱلسَّمَٰوَٰتِ أَمۡ ءَاتَيۡنَٰهُمۡ كِتَٰبٗا فَهُمۡ عَلَىٰ بَيِّنَتٖ مِّنۡهُۚ بَلۡ إِن يَعِدُ ٱلظَّٰلِمُونَ بَعۡضُهُم بَعۡضًا إِلَّا غُرُورًا﴾

"বল, তোমরা আল্লাহর পরিবর্তে যাদেরকে ডাকো সেই সব শরীক (দেব-দেবীর) কথা ভেবে দেখেছো কি? তারা পৃথিবীতে কিছু সৃষ্টি করে থাকলে আমাকে দেখাও; অথবা আকাশমণ্ডলীতে (সৃষ্টিতে) তাদের কোনো অংশ আছে কি.? না কি আমি তাদেরকে এমন কোনো কিতাব দিয়েছি যার প্রমাণের উপর এরা নির্ভর করে? বস্তুত যালিমরা একে অপরকে মিথ্যা প্রতিশ্রুতিদিয়ে থাকে।" (ফাতির ৩৫ : ৪০)। আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন,

﴿وَٱلَّذِينَ تَدۡعُونَ مِن دُونِهِۦ لَا يَسۡتَطِيعُونَ نَصۡرَكُمۡ وَلَآ أَنفُسَهُمۡ يَنصُرُونَ ١٩٧ وَإِن تَدۡعُوهُمۡ إِلَى ٱلۡهُدَىٰ لَا يَسۡمَعُواْۖ وَتَرَىٰهُمۡ يَنظُرُونَ إِلَيۡكَ وَهُمۡ لَا يُبۡصِرُونَ﴾

আল্লাহ ছাড়া তোমরা যাদের কে ডাকো, তারা তোমাদের সাহায্য করার কোনো ক্ষমতা রাখেনা এবং তারা নিজেদেরকেও সাহায্য করতে পারে না। তাদেরকে যদি সঠিক পথের দিকে ডাক, তারা শোনে না, তুমি দেখ যে তারা তোমার দিকে তাকিয়ে আছে কিন্তু আসলে তারা কিছুই দেখতে পায় না।" (সূরা আল আ'রাফ ৭ : ১৯৭)। আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন,

﴿لَهُۥ دَعۡوَةُ ٱلۡحَقِّۚ وَٱلَّذِينَ يَدۡعُونَ مِن دُونِهِۦ لَا يَسۡتَجِيبُونَ لَهُم بِشَيۡءٍ إِلَّا كَبَٰسِطِ كَفَّيۡهِ إِلَى ٱلۡمَآءِ لِيَبۡلُغَ فَاهُ وَمَا هُوَ بِبَٰلِغِهِۦۚ وَمَا دُعَآءُ ٱلۡكَٰفِرِينَ إِلَّا فِي ضَلَٰلٖ﴾

"সত্যের আহ্বান তাঁরই; যারা তাঁকে ছাড়া আহ্বান করে অপরকে, তাদেরকে তারা কোনোই সাড়া দেয় না; তাদের দৃষ্টান্ত সেই ব্যক্তির মত, যে তার মুখে পানি পৌঁছবে এই আশায় তার হস্তদ্বয় প্রসারিত করে এমন পানির দিকে যা তার মুখে পৌঁছবার নয়, কাফিরদের আহ্বান নিষ্ফল।" (সূরা আর রা'দ ১৩ : ১৪) আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন,

﴿وَمَآ أَنتُم بِمُعۡجِزِينَ فِي ٱلۡأَرۡضِۖ وَمَا لَكُم مِّن دُونِ ٱللَّهِ مِن وَلِيّٖ وَلَا نَصِيرٖ﴾

"তোমরা পৃথিবীতে (আল্লাহকে) ব্যর্থ করতে পারবে না এবং আল্লাহ ব্যতীত তোমাদের কোনো অভিভাবক নেই, সাহায্যকারীও নেই।" (সূরা আশ শুরা ৪২ : ৩১)

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে আল্লাহ তা'আলা বলেন যে, মুশরিকদের এবং যারা আল্লাহকে বাদ দিয়ে অন্যদেরকে ডাকে, তাদেরকে প্রশ্ন করেন যাতে তারা জবাব দিতে পারে। যেমন- আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿وَلَئِن سَأَلۡتَهُم مَّنۡ خَلَقَ ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَٱلۡأَرۡضَ لَيَقُولُنَّ ٱللَّهُۚ قُلۡ أَفَرَءَيۡتُم مَّا تَدۡعُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ إِنۡ أَرَادَنِيَ ٱللَّهُ بِضُرٍّ هَلۡ هُنَّ كَٰشِفَٰتُ ضُرِّهِۦٓ أَوۡ أَرَادَنِي بِرَحۡمَةٍ هَلۡ هُنَّ مُمۡسِكَٰتُ رَحۡمَتِهِۦۚ قُلۡ حَسۡبِيَ ٱللَّهُۖ عَلَيۡهِ يَتَوَكَّلُ ٱلۡمُتَوَكِّلُونَ﴾

"তুমি যদি তাদেরকে জিজ্ঞেস কর, আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবী কে সৃষ্টি করেছেন? তারা অবশ্যই বলবে, আল্লাহ। বল, তোমরা কি ভেবে দেখেছো যে, আল্লাহ আমার অনিষ্ট চাইলে তোমরা আল্লাহর পরিবর্তে যাদের কে ডাকো তারা কি সেই অনিষ্ট দূর করতে পারবে? অথবা, তিনি আমার প্রতি অনুগ্রহ করতে চাইলে তারা কি সে অনুগ্রহকে বন্ধ করতে পারবে? বল, আমার জন্য আল্লাহই যথেষ্ট। নির্ভরকারীরা তাঁর উপরই নির্ভর করে।" (সূরা আয যুমার ৩৯ : ৩৮)। আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন,

﴿أَمَّن يُجِيبُ ٱلۡمُضۡطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكۡشِفُ ٱلسُّوٓءَ وَيَجۡعَلُكُمۡ خُلَفَآءَ ٱلۡأَرۡضِۗ أَءِلَٰهٞ مَّعَ ٱللَّهِۚ قَلِيلٗا مَّا تَذَكَّرُونَ﴾

"কে তিনি, যিনি (নিরুপায়ের) আর্তের আহ্বানে সাড়া দেন, যখন সে তাঁকে ডাকে এবং বিপদ-আপদ দূরীভূত করেন এবং কে তোমাদেরকে পৃথিবীতে প্রতিনিধি করেন? আল্লাহর সাথে অন্য কোনো মা'বুদ আছে কি? তোমরা অতি সামান্যই উপদেশ গ্রহণ করে থাকো।" (সূরা আন নামল ২৭ : ৬২)

আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন,

﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ تَدۡعُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ عِبَادٌ أَمۡثَالُكُمۡۖ فَٱدۡعُوهُمۡ فَلۡيَسۡتَجِيبُواْ لَكُمۡ إِن كُنتُمۡ صَٰدِقِينَ﴾

আল্লাহ ছাড়া তোমরা যাদেরকে ডাকো, তারা তো তোমাদেরই ন্যায় বান্দা, সুতরাং তোমরা তাদেরকে ডাকতে থাকো, যদি তোমরা (তোমাদের দাবিতে) সত্যবাদী হও তবে তারা তোমাদের ডাকে সাড়া দিক।" (সূরা আল আ'রাফ ৭:১৯৪) আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন,

﴿قُلۡ مَن رَّبُّ ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَٱلۡأَرۡضِ قُلِ ٱللَّهُۚ قُلۡ أَفَٱتَّخَذۡتُم مِّن دُونِهِۦٓ أَوۡلِيَآءَ لَا يَمۡلِكُونَ لِأَنفُسِهِمۡ نَفۡعًا وَلَا ضَرًّاۚ قُلۡ هَلۡ يَسۡتَوِي ٱلۡأَعۡمَىٰ وَٱلۡبَصِيرُ أَمۡ هَلۡ تَسۡتَوِي ٱلظُّلُمَٰتُ وَٱلنُّورُۗ أَمۡ جَعَلُواْ لِلَّهِ شُرَكَآءَ خَلَقُواْ كَخَلۡقِهِۦ فَتَشَٰبَهَ ٱلۡخَلۡقُ عَلَيۡهِمۡۚ قُلِ ٱللَّهُ خَٰلِقُ كُلِّ شَيۡءٖ وَهُوَ ٱلۡوَٰحِدُ ٱلۡقَهَّٰرُ﴾

"বল, কে আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর প্রতিপালক? বল, (তিনি) আল্লাহ; বল, তবে কি তোমরা অভিভাবকরূপে গ্রহণ করছো আল্লাহর পরিবর্তে অপরকে, যারা নিজেদের লাভ বা ক্ষতি সাধনে সক্ষম নয়? বল, অন্ধ ও চক্ষুষ্মান কি সমান অথবা অন্ধকার ও আলো কি এক? তবে কি তারা আল্লাহর এমন শরীক স্থাপন করেছে যারা তাঁর সৃষ্টির মত সৃষ্টি করেছে যে কারণে সৃষ্টি তাদের মধ্যে বিভ্রান্তি ঘটিয়েছে? বল, আল্লাহ সকল বস্তুর স্রষ্টা; তিনি এক, পরাক্রমশালী।" (সূরা আর রা'দ ১৩ : ১৬)। আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন,

﴿ إِن يَدۡعُونَ مِن دُونِهِۦٓ إِلَّآ إِنَٰثٗا وَإِن يَدۡعُونَ إِلَّا شَيۡطَٰنٗا مَّرِيدٗا ﴾

"তাঁর (আল্লাহর) পরিবর্তে তারা কেবল নারী প্রতিমাপুঞ্জকেই আহ্বান করে (দেবীদের পূজা) এবং তারা কেবল বিদ্রোহী শয়তানদেরই আহ্বান করে।" (সূরা আন নিসা ৪ : ১১৭)। আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন,

﴿وَمَنۡ أَضَلُّ مِمَّن يَدۡعُواْ مِن دُونِ ٱللَّهِ مَن لَّا يَسۡتَجِيبُ لَهُۥٓ إِلَىٰ يَوۡمِ ٱلۡقِيَٰمَةِ وَهُمۡ عَن دُعَآئِهِمۡ غَٰفِلُونَ﴾

সে ব্যক্তি অপেক্ষা অধিক বিভ্রান্ত আর কে, যে আল্লাহর পরিবর্তে এমন কিছুকে ডাকে যা কিয়ামত দিবস পর্যন্ত তার ডাকে সাড়া দিবে না. আর তারা তাদের ডাক সম্বন্ধে অবহিতও নয়।" (সূরা আল আহকাফ ৪৬ : ৫)

কুরআনের এ সকল আয়াতসমূহ হতে একথা পরিষ্কার যে,

১. কেবল আল্লাহই তাঁর বান্দাদেরকে সাহায্য করতে পারেন,

২. যারা অভাবী ও বিপদগ্রস্ত আল্লাহই তাদের কাজ সহজ করে দিতে পারেন এবং তাদের দুঃখ কষ্ট দূর করে দিতে পারেন।

৩. সকল মালিকানা ও আধিপত্যের এবং ক্ষমতার সীমা কেবল আল্লাহর জন্যই নির্ধারিত।

৪. এই পুরো সৃষ্টিজগতের শৃংখলা তাঁরই নিয়ন্ত্রণাধীন এবং কর্তৃত্বাধীন।

৫. আর সকল নবী-রাসূলগণ তাদের অভাব-অভিযোগ ও বিপদ-আপদে কেবল তাঁরই নিকট সকাতর প্রার্থনা করতেন এবং কেবল তাঁকেই সাজদা করতেন।

৬. 'আল্লাহ বাদে অন্য যে কারো (যেমন- নবী-রাসূলগণের) কাছে দুআ করা এবং অভাব - অভিযোগ পেশ করা জায়েয' - তাদের এ আকীদা পোষণ করা কুরআনের স্পষ্ট ও প্রকাশ্য আয়াতের সম্পূর্ণ বিরোধী।

৭. আল্লাহর নিকট আদম আলাইহিস সালাম এর ক্ষমা প্রার্থনা, নূহ আলাইহিস সালাম কর্তৃক তাঁর সন্তানের ডুবে যাওয়া থেকে রক্ষার জন্য তাঁর প্রভুর নিকট প্রার্থনা করা, ইবরাহীম আলাইহিস সালাম কর্তৃক তাঁর সন্তানের জন্য আল্লাহর নিকট অনুনয় বিনয় করা, মূসা আলাইহিস সালাম, যিনি দুঃখ-কষ্ট দ্বারা পরিবেষ্টিত ছিলেন, তাঁর সাহায্যের জন্য কেবল আল্লাহকেই ডাকা, ইউনুস আলাইহিস সালাম কর্তৃক ক্ষমা প্রার্থনা ও অনুশোচনার মাধ্যমে আল্লাহর নিকট মাছের পেট হতে পরিত্রাণ প্রার্থনা করা, আয়ুব আলাইহিস সালাম কর্তৃক কেবল আল্লাহর নিকটই রোগমুক্তি প্রার্থনা করা - এ সকল ঘটনাবলি পরিষ্কার এবং নির্ভরযোগ্য প্রমাণ যে, আল্লাহ ছাড়া এমন আর কেউ নেই যার বিপদ-আপদ থেকে উদ্ধার করার ক্ষমতা আছে।

এসকল সাক্ষ্য-প্রমাণের বিপরীতে বেরেলভীদের আকীদা হলো, যদি কেউ যেকোনো নবী বা রাসূল কিংবা ওলীর সাথে সম্পর্কিত থাকে, তবে তিনি তাকে সাহায্য করতে আসেন।[১৬৮]

আহমাদ রেযার এক অনুসারী লিখেছে, "সকল আউলিয়া একটি স্থানে একত্রিত হয়ে বিশ্বজগৎ এমনভাবে দেখতে থাকে, যেন তা তাদের হাতের তালু এবং তারা নিকট ও দূর (সর্বস্থান) হতে শোনে। অথবা একমুহূর্তের মধ্যে পুরো জগৎ ভ্রমণ করে এবং বহু দূরের অভাবীরও অভাব মোচন (প্রয়োজন পূরণ) করে।" [১৬৯]

একদিকে এ হলো তাদের আকীদা এবং অন্যদিকে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর চাচাত ভাই ইবনে আব্বাস (রাদিয়াল্লাহু আনহুমা) কে বলছেন, "ইবনু আব্বাস রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন একদা আমি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর পেছনে ছিলাম।

فقال: يا غلام إني أعلمك كلمات احفظ الله يحفظك احفظ الله تجده تجاهك إذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك رفعت الأقلام وجفت الصحف.

তিনি বললেন, হে যুবক! আমি তোমাকে কয়েকটি কথা শিখিয়ে দিচ্ছি- তুমি আল্লাহকে (বিধান) হেফাযত করবে, তিনি তোমাকে রক্ষা করবেন। তুমি আল্লাহর সন্তুষ্টির প্রতি লক্ষ্য রাখবে, তুমি আল্লাহকে নিকটে পাবে। তোমার কোনো কিছু চাইতে হলে আল্লাহর নিকটই চাইবে, আর সাহায্য প্রার্থনা করতে হলে আল্লাহর নিকটই সাহায্য প্রার্থনা করবে। আর জেনে রাখ, সমস্ত উম্মাতও যদি একত্রিত হয়ে তোমার কোনো কল্যাণ করতে চায়, তবে আল্লাহ তোমার জন্য যেটুকু লিখে রেখেছেন, তা ব্যতীত কোনো কল্যাণই করতে পারবে না। আর যদি তারা ঐক্যবদ্ধ হয়ে তোমার কোনো ক্ষতি করতে চায়, তবে আল্লাহ যতটুকু তোমার জন্য লিখে রেখেছেন, তা ব্যতীত কোনো ক্ষতিই করতে পারবে না। কলমসমূহ উঠিয়ে নেওয়া হয়েছে, দফতরসমূহ শুকিয়ে গেছে। (তিরমিযী, তাহকীক আলবানী হা/২৫১৬, বঙ্গানুবাদ তিরমিযী হা/২৪৫৬, তিরমিযী বলেন, হাদীসটি হাসান সহীহ)।

---

[১৬৮] ফতোয়া আফ্রিকা, বেরেলভী, পৃ-১৩৫

[১৬৯] জা-আল হাক্ব, আহমাদ ইয়ার খান, পৃ-১৩৮-১৩৯।

কিন্তু জনাব বেরেলভী বলছে, "যখন দুঃখ-কষ্টের মুখোমুখি হবে তখন কবরবাসীর নিকট সাহায্য কামনা কর।"[১৭০]

সর্বোপরি, জনাব বেরেলভী সাহেব শুধু কুরআনের আয়াতেরই বিরোধিতা করেনি, বরং যারা মুজাহিদী শক্তি নিয়ে শিরক ও বিদআতের বিরুদ্ধে সারিবদ্ধভাবে দণ্ডায়মান হয় এবং যারা এ সকল সুস্পষ্ট আয়াতের অনুসরণ করে ও এ বিশ্বাস পোষণ করে যে, অভাবী ও দুঃখ-দুর্দশাগ্রস্ত লোকদের আহ্বান একমাত্র আল্লাহ তা'আলাই শোনেন, তাদের প্রয়োজন পূরণ করেন এবং কেবল তিনিই এককভাবে কারো প্রয়োজন পূরণে ও দুঃখ- দুর্দশা দূরীকরণে সক্ষম, এ বেরেলেভী খান সাহেব (আহমাদ রেযা) তাদের বিরোধী হয়ে পড়ে এবং তাদেরকে ঠাট্টা-বিদ্রূপ করে, গালমন্দ করে এবং অসন্তুষ্টির সাথে (তাদের বিরুদ্ধে) লিখে যে, "আমাদের যুগে এমন কতিপয় লোক রয়েছে যারা আউলিয়াগণের থেকে সাহায্য চাওয়াকে অবিশ্বাস করে এবং বলে, 'তারা যা বলে সে ব্যাপারে তাদের কোনো জ্ঞান নেই, তারা কেবল নিজেরা আন্দাজ-অনুমান করে।"[১৭১]

এ ধরনের লোকদের ব্যাপারেই আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ ٱتَّبِعُواْ مَآ أَنزَلَ ٱللَّهُ قَالُواْ بَلْ نَتَّبِعُ مَآ أَلْفَيْنَا عَلَيْهِ ءَابَآءَنَآۗ أَوَلَوْ كَانَ ءَابَآؤُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ شَيْـًٔا وَلَا يَهْتَدُونَ﴾

"আর যখন তাদেরকে বলা হয়, 'তোমরা অনুসরণ কর, যা আল্লাহ নাযিল করেছেন', তারা বলে, 'বরং আমরা অনুসরণ করব আমাদের পিতৃ-পুরুষদেরকে যার উপর পেয়েছি'। যদি তাদের পিতৃ–পুরুষরা কিছু না বুঝে এবং হিদায়াতপ্রাপ্ত না হয়, তাহলেও কি?" (সূরা আল বাকারা ২ : ১৭০) আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِى عَنِّى فَإِنِّى قَرِيبٌۖ أُجِيبُ دَعْوَةَ ٱلدَّاعِ إِذَا دَعَانِۖ فَلْيَسْتَجِيبُواْ لِى وَلْيُؤْمِنُواْ بِى لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ﴾

"আর যখন আমার বান্দাগণ তোমাকে আমার সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করবে, আমি তো নিশ্চয় নিকটবর্তী। আমি আহ্বানকারীর ডাকে সাড়া দেই, যখন সে আমাকে ডাকে। সুতরাং তারা যেন আমার ডাকে সাড়া দেয় এবং আমার প্রতি

[১৭০] আল-আমান ওয়াল আলা, পৃ-৪৬।

[১৭১] রিসালা আল হায়াত ওয়াল মাউত ফী ফতোয়া রিযভিয়্যাহ, ৪র্থ খণ্ড, পৃ-৩০১-৩০২।

ঈমান আনে। আশা করা যায় তারা সঠিক পথে চলবে।” (সূরা আল বাকারা ২ : ১৮৬) আল্লাহ তা‘আলা বলেন,

﴿وَقَالَ رَبُّكُمُ ٱدۡعُونِيٓ أَسۡتَجِبۡ لَكُمۡۚ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَسۡتَكۡبِرُونَ عَنۡ عِبَادَتِي سَيَدۡخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ﴾

আর তোমাদের রব বলেছেন, ‘তোমরা আমাকে ডাক, আমি তোমাদের জন্য সাড়া দেব। নিশ্চয় যারা অহঙ্কারবশত আমার ইবাদাত থেকে বিমুখ থাকে, তারা অচিরেই লাঞ্ছিত অবস্থায় জাহান্নামে প্রবেশ করবে।” (সূরা গাফির (মু’মিন) ৪০ : ৬০)

২. নবী ও ওলীদের ক্ষমতা ও ইচ্ছা

ইসলামের দৃষ্টিতে তাওহীদ বা একত্ব বলতে যা বোঝায় তা হলো একমাত্র আল্লাহই তাঁর সকল সৃষ্টিকে সকল বিপদ-আপদ, দুঃখ-কষ্ট থেকে উদ্ধার করেন করেন। একমাত্র তিনিই তার সৃষ্টিকুলের একক সৃষ্টিকর্তা, মালিক, প্রতিপালক, প্রভু। সকল ক্ষমতা কেবল তাঁরই। তিনিই সকল কল্যানের মালিক। সুতরাং যে কারো প্রয়োজনে একমাত্র তাঁর দিকেই ফিরতে হবে, একমাত্র তাঁকেই ডাকতে হবে, কেবল তাঁরই নিকট চাইতে ও যাচনা করতে হবে। (বিশ্ব পরিচালনা বা কারো মঙ্গল অমঙ্গলের ক্ষমতা বা দায়িত্ব মহান আল্লাহ নবী রাসূলগণকে দেননি) কিন্তু বেরেলভীদের আকীদা বিশ্বাস এর থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন।

বেরেলভীদের বিশ্বাস হলো, আল্লাহ তাঁর কিছু বান্দাদেরকে তাঁর ক্ষমতা ও কর্তৃত্ব প্রদান করেছেন তাঁর সৃষ্টির বিষয়াদি (পরিচালনার) ব্যাপারে, যার সাহায্যে তারা অভাবী লোকদের প্রয়োজন পূরণ করে এবং বিপদগ্রস্ত লোকদের বিপদ-আপদ দূর করে। এর উপর ভিত্তি করে তারা তাদেরকে আহ্বান করে যখন তারা কোনো বিপদে পড়ে, সকাতর প্রার্থনা করে, যাচঞা করে, তাদের নামে শপথ-মানত করে এবং নযর নিয়ায প্রদান করে।

তাদের আকীদা অনুসারে, আল্লাহ সকল কর্তৃত্ব এবং সৃষ্টির সকল ব্যবস্থাপনা, পরিচালনার দায়িত্ব অর্পণ করেছেন তাঁর বাছাইকৃত কিছু বান্দাকে এবং আল্লাহ নিজে অক্ষম হয়ে গেছেন এবং ক্ষমতাচ্যুত হয়েছেন[১৭২]

যেহেতু তারা আল্লাহর সহকারী তাই এখন দুঃখ-দূর্দশার সময় যে কোনো ব্যক্তি আল্লাহর এ বান্দাগণের নিকট যাচনা করতে পারে, সাহায্য প্রার্থনা করতে পারে, তাদের থেকে রোগের আরোগ্য কামনা করতে পারে। সকল ক্ষমতা তাদের হাতে নিহিত। তারা আসমান ও জমীনের মালিক, তারা যাকে ইচ্ছা দেন, যাকে ইচ্ছা আটকে/স্থগিত রাখেন, তারা জীবন, মৃত্যু, রিযিক, আরোগ্যদান (এক কথায়) যা বোঝায় তা হলো রুবুরিয়াহ'র সবল ক্ষমতাই তাদের প্রতি আরোপিত হয়েছে।[১৭৩]

এ সম্পর্কে তাদের কিতাবাদি ও লেখনী হতে উদ্ধৃতি দেয়ার পূর্বে পাঠকদের বোঝা দরকার যে, এসকল আকীদা-বিশ্বাস থেকে মক্কার মুশরিকদের আকীদা-বিশ্বাস আলাদা কিছুই ছিল না। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাদের এ সকল আকীদা-বিশ্বাস খণ্ডন করেছেন আর এ সকল লোকেরা (বেরেলভীগণ) রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর প্রতি অতিভক্তি ও ভালবাসার দাবি করে পূণরায় সে সকল আকীদা -বিশ্বাস অবলম্বন করেছে।

এখন এ সম্পর্কে আল্লাহ কী বলেছেন তা লক্ষ্য করুন এবং এর মানদণ্ডে তাদের আকীদা-বিশ্বাসসমূহকে বিচার করুন। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿لَآ إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ يُحۡيِۦ وَيُمِيتُۖ رَبُّكُمۡ وَرَبُّ ءَابَآئِكُمُ ٱلۡأَوَّلِينَ﴾

"তিনি ছাড়া কোনো (সত্য) ইলাহ নেই; তিনিই জীবন দান করেন এবং তিনিই মৃত্যু দেন। তিনি তোমাদের রব এবং তোমাদের পিতৃ পুরুষদের রব।" (সূরা আদ দুখান ৪৪ : ৮)

---

[১৭২] যেমন আমাদের দেশের কিছু কবরপূজারী লোকেরা তাদের গানে বলে, "আল্লাহর ধন যে নবীকে দিয়া, আল্লাহই গেছেন গায়েব হইয়া, নবীর সে ধন খাজায় পাইয়া বসে আছেন আজমিরে; কেউ ফিরে না খালি হাতে খাজা বাবার দরবারে"- মুজিব পরদেশী।

[১৭৩] একই কবরপূজারী বলে: "খাজা বাবার পাক রওয়াযায়, যাইয়া যদি কেউ কিছু চায়, চাইতে জানলে রয়না কাঙাল, অফুরন্ত ভাণ্ডারে"-মুজিব পরদেশী। আস্তাগফিরুল্লাহ! এগুলি সুস্পষ্ট শিরক।

আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন,

﴿تَبَٰرَكَ ٱلَّذِى بِيَدِهِ ٱلۡمُلۡكُ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَىۡءٍ قَدِيرٌ﴾

“বরকতময় তিনি যার হাতে সর্বময় কর্তৃত্ব। আর তিনি সব কিছুর উপর সর্বশক্তিমান। (সূরা আল মুলক ৬৭ : ১) আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন,

﴿قُلۡ مَنۢ بِيَدِهِۦ مَلَكُوتُ كُلِّ شَىۡءٍ وَهُوَ يُجِيرُ وَلَا يُجَارُ عَلَيۡهِ إِن كُنتُمۡ تَعۡلَمُونَ ۝٨٨ سَيَقُولُونَ لِلَّهِۚ قُلۡ فَأَنَّىٰ تُسۡحَرُونَ﴾

“বল, 'তিনি কে যার হাতে সকল কিছুর কর্তৃত্ব, যিনি আশ্রয় দান করেন এবং যাঁর ওপর কোনো আশ্রয়দাতা নেই?' যদি তোমরা জান। (তারা বলবে, 'আল্লাহ।' বল, 'তবুও কীভাবে তোমরা মোহাচ্ছন্ন হয়ে আছ?')। (সূরা আল মুমিনুন ২৩: ৮৮-৮৯। আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন,

﴿فَسُبۡحَٰنَ ٱلَّذِى بِيَدِهِۦ مَلَكُوتُ كُلِّ شَىۡءٍ وَإِلَيۡهِ تُرۡجَعُونَ﴾

“অতএব পবিত্র মহান তিনি, যার হাতে রয়েছে সকল কিছুর রাজত্ব এবং তাঁরই দিকে তোমরা প্রত্যাবর্তিত হবে।” (সূরা ইয়াসীন ৩৬: ৮৩) আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন,

﴿إِنَّ ٱللَّهَ هُوَ ٱلرَّزَّاقُ ذُو ٱلۡقُوَّةِ ٱلۡمَتِينُ﴾

“নিশ্চয় আল্লাহই রিয্কদাতা, তিনি শক্তিধর, পরাক্রমশালী।” (সূরা আয যারিয়াত ৫১ : ৫৮) আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন,

﴿وَمَا مِن دَآبَّةٍ فِى ٱلۡأَرۡضِ إِلَّا عَلَى ٱللَّهِ رِزۡقُهَا وَيَعۡلَمُ مُسۡتَقَرَّهَا وَمُسۡتَوۡدَعَهَاۚ كُلٌّ فِى كِتَٰبٍ مُّبِينٍ﴾

“আর যমীনে বিচরণকারী প্রতিটি প্রাণীর রিয্কের দায়িত্ব আল্লাহরই এবং তিনি জানেন তাদের আবাসস্থল ও সমাধিস্থল। সব কিছু আছে স্পষ্ট কিতাবে।” (সূরা হুদ ১১ : ৬)

আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন,

﴿وَكَأَيِّن مِّن دَآبَّةٖ لَّا تَحۡمِلُ رِزۡقَهَا ٱللَّهُ يَرۡزُقُهَا وَإِيَّاكُمۡۚ وَهُوَ ٱلسَّمِيعُ ٱلۡعَلِيمُ﴾

"আর এমন কত জীব–জন্তু রয়েছে, যারা নিজদের রিয্ক নিজেরা সঞ্চয় করে না, আল্লাহই রিয্ক দেন তাদের এবং তোমাদেরও। আর তিনি সর্বশ্রোতা, মহাজ্ঞানী।" (সূরা আল আনকাবুত ২৯: ৬০) আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন,

﴿قُلۡ إِنَّ رَبِّي يَبۡسُطُ ٱلرِّزۡقَ لِمَن يَشَآءُ مِنۡ عِبَادِهِۦ وَيَقۡدِرُ لَهُۥۚ وَمَآ أَنفَقۡتُم مِّن شَيۡءٖ فَهُوَ يُخۡلِفُهُۥۖ وَهُوَ خَيۡرُ ٱلرَّٰزِقِينَ﴾

"বল, 'নিশ্চয় আমার রব তাঁর বান্দাদের মধ্যে যার জন্য ইচ্ছা রিয্ক প্রশস্ত করেন এবং সঙ্কুচিত করেন। আর তোমরা যা কিছু আল্লাহর জন্য ব্যয় কর তিনি তার বিনিময় দেবেন এবং তিনিই উত্তম রিয্কদাতা।" (সূরা সাবা ৩৪ : ৩৯) আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন,

﴿ قُلِ ٱللَّهُمَّ مَٰلِكَ ٱلۡمُلۡكِ تُؤۡتِي ٱلۡمُلۡكَ مَن تَشَآءُ وَتَنزِعُ ٱلۡمُلۡكَ مِمَّن تَشَآءُ وَتُعِزُّ مَن تَشَآءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَآءُۖ بِيَدِكَ ٱلۡخَيۡرُۖ إِنَّكَ عَلَىٰ كُلِّ شَيۡءٖ قَدِيرٞ﴾

"বল, 'হে আল্লাহ, রাজত্বের মালিক, আপনি যাকে চান রাজত্ব দান করেন, আর যার থেকে চান রাজত্ব কেড়ে নেন এবং আপনি যাকে চান সম্মান দান করেন। আর যাকে চান অপমানিত করেন, আপনার হাতেই কল্যাণ। নিশ্চয় আপনি সব কিছুর উপর ক্ষমতাবান'।" (সূরা আলে ইমরান ৩ : ২৬)

আল কুরআন লোকদেরকে তাওহীদের সাথে পরিচিত করার মাধ্যমে তাদের প্রতি এক বিরাট ইহসান করেছেন। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর মাক্কী জীবনের দীর্ঘ ১৩ বছর ধরে মানুষের মনে এ আকীদা-বিশ্বাস, ধ্যান-ধারণাই প্রতিষ্ঠিত করেছেন। ইসলাম মানুষকে মানুষের দাসত্ব হতে মুক্তি দিয়েছে এবং মানবজাতি ও তাদের রবের মাঝে সকল (দাসত্বের প্রতীক) গলাবন্ধনী ও শৃংখল (অর্থাৎ সকল মধ্যস্থতাকারী অনুষঙ্গসমূহ) কে নিশ্চিহ্ন করেছে এবং সরাসরি আল্লাহর দুয়ারের সামনে তাদেরকে দাঁড় করিয়ে

দিয়েছে। কিন্তু এই বেরেলভীগণ সেই সকল শৃংখলের ভাঙ্গা টুকরো কুড়াচ্ছে (এবং জোড়া লাগাচ্ছে) এবং একজন মানুষ কে অপর একজন মানুষের উপর নির্ভরশীল বানাচ্ছে এবং সৃষ্টির প্রতি সৃষ্টির দাসত্বের শিক্ষা দিচ্ছে। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿وَمَا يَسْتَوِى ٱلْأَعْمَىٰ وَٱلْبَصِيرُ﴾

"অন্ধ ও চক্ষুষ্মান সমান নয়।" (ফাতির ৩৫ : ১৯)

তারা কখনো সেই সকল লোকের সমান হতে পাওে না, যারা তাওহীদের শিক্ষা দ্বারা কল্যাণ প্রাপ্ত। তাওহীদের (সঠিক) বুঝ ছাড়া ইসলামী উম্মাহর মাঝে ঐক্য সম্ভব নয়। তাওহীদকে বাদ দিয়ে শিরকী ধ্যান-ধারণা, আকীদা-বিশ্বাস প্রচার আর বিভক্তি ও অনৈক্যের বীজ বপণ একই কথা (যা বেরেলভীগণ করছে)। আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন,

﴿كَانَ ٱلنَّاسُ أُمَّةً وَٰحِدَةً فَبَعَثَ ٱللَّهُ ٱلنَّبِيِّـۧنَ مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ وَأَنزَلَ مَعَهُمُ ٱلْكِتَٰبَ بِٱلْحَقِّ لِيَحْكُمَ بَيْنَ ٱلنَّاسِ فِيمَا ٱخْتَلَفُوا۟ فِيهِ ۚ وَمَا ٱخْتَلَفَ فِيهِ إِلَّا ٱلَّذِينَ أُوتُوهُ مِنۢ بَعْدِ مَا جَآءَتْهُمُ ٱلْبَيِّنَٰتُ بَغْيًۢا بَيْنَهُمْ ۖ فَهَدَى ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ لِمَا ٱخْتَلَفُوا۟ فِيهِ مِنَ ٱلْحَقِّ بِإِذْنِهِۦ ۗ وَٱللَّهُ يَهْدِى مَن يَشَآءُ إِلَىٰ صِرَٰطٍ مُّسْتَقِيمٍ﴾

"মানুষ ছিল এক উম্মত। অতঃপর আল্লাহ সুসংবাদদাতা ও সতর্ককারীরূপে নবীদেরকে প্রেরণ করলেন এবং সত্যসহ তাদের সাথে কিতাব নাযিল করলেন, যাতে মানুষের মধ্যে ফয়সালা করেন, যে বিষয়ে তারা মতবিরোধ করতো। আর তারাই তাতে মতবিরোধ করেছিল, যাদেরকে তা দেয়া হয়েছিল, তাদের নিকট স্পষ্ট নিদর্শন আসার পরও পরস্পরের মধ্যে বিদ্বেষবশত। অতঃপর আল্লাহ নিজ অনুমতিতে মুমিনদেরকে হিদায়াত দিলেন যে বিষয়ে তারা মতবিরোধ করছিল। আর আল্লাহ যাকে ইচ্ছা করেন সরল পথের দিকে হিদায়াত দেন।" (সূরা আল বাকারা ২ : ২১৩)

(বর্তমান যুগে) অবস্থা হলো, শিরক, কবরপূজা, বিদআত এবং শরীয়াত বিরোধী রসম-রেওয়াজে সয়লাব হয়ে গেছে /বন্যা বয়ে গেছে ও মুসলিমগণ (এ স্রোতে) ভেসে চলছে এবং চলতে চলতে এক সময় এর ভেতরে ডুবে যায়।

শয়তান তাদের মন-মস্তিষ্কের উপর বিজয়ী হয়েছে এবং তারা ভাবছে যে, তার আনুগত্যই মুক্তির উপায়।

এ লোকদের সম্পর্কেই মহান আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُم بِٱلْأَخْسَرِينَ أَعْمَٰلًا ۝١٠٣ ٱلَّذِينَ ضَلَّ سَعْيُهُمْ فِى ٱلْحَيَوٰةِ ٱلدُّنْيَا وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا﴾

“বল, ‘আমি কি তোমাদেরকে এমন লোকদের কথা জানাব, যারা আমলের দিক থেকে সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত’? দুনিয়ার জীবনে যাদের চেষ্টা ব্যর্থ হয়ে গেছে, অথচ তারা মনে করছে যে, তারা ভাল কাজই করছে”। (সূরা কাহফ ১৮: ১০৩-১০৪) আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন,

﴿ٱلَّذِينَ كَانَتْ أَعْيُنُهُمْ فِى غِطَآءٍ عَن ذِكْرِى وَكَانُوا۟ لَا يَسْتَطِيعُونَ سَمْعًا ۝١٠١ أَفَحَسِبَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوٓا۟ أَن يَتَّخِذُوا۟ عِبَادِى مِن دُونِىٓ أَوْلِيَآءَ ۚ إِنَّآ أَعْتَدْنَا جَهَنَّمَ لِلْكَٰفِرِينَ نُزُلًا﴾

“আমার স্মরণ থেকে যাদের চোখ ছিল আবরণে ঢাকা এবং যারা শুনতেও ছিল অক্ষম। যারা কুফরী করছে, তারা কি মনে করেছে যে, তারা আমার পরিবর্তে আমার বান্দাদেরকে অভিভাবকরূপে গ্রহণ করবে? নিশ্চয় আমি জাহান্নামকে কাফিরদের আপ্যায়নের জন্য প্রস্তুত করছি।” (সূরা কাহফ ১৮ : ১০১-১০২)

এবার এ ব্যাপারে তাদের বক্তব্যগুলোকে বিশ্লেষণ করুন।

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর শিক্ষাকে বৃদ্ধাঙ্গুলী দেখিয়ে এবং তাঁর প্রশংসায় অতিরঞ্জন করে আহমাদ রেযা বেরেলভী বলেছে,

(নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সম্পর্কে আকীদা)

আল্লাহর মহান সহযোগী (নায়েব)

তিনি ‘কুন-হও’ এর রং প্রদর্শন করেন,

আপনার হাতেই সবকিছুর চাবি,

আপনি সকল কিছুর মালিক বলে জানা যায়।”

এর ব্যাখ্যায় তার পূত্র পিতার পদাংক অনুসরণ করে লিখেছে, “সারা পৃথিবীর যেকোনো স্থানে যত অনুগ্রহ রয়েছে, তার সবই মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কর্তৃক প্রদত্ত দান। তাঁর মাধ্যম ব্যতীত কোনো কিছুই আল্লাহর কাছ থেকে নেয়া যায় না। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যা ইচ্ছা করেন, তা-ই ঘটে এবং তাঁর ইচ্ছার বিরুদ্ধে কিছুই ঘটে না। তিনি যা ইচ্ছা করেন, তা পরিবর্তন করার কেউ নাই।”[১৭৪]

বেরেলভীর একই কবিতার কিছু লাইন:

“তিনি ডুবন্ত জাহাজকে ভাসিয়ে রাখেন,

তিনিই কম্পমান জাহাজকে স্থিরতা দান করেন।

তিনিই জ্বলন্ত হৃদয়কে নির্বাপিত করেন, আপনি ক্রন্দনরত চোখকে হাঁসান, শাফী’ (শাফায়াতকারী), নাফী’ (উপকারকারী),

রাফী’ (সমুন্নতকারী), দাফী’ (পদানতকারী);

কত কল্যাণ তিনি বয়ে আনেন,

দাফী’ ও হামী (সংরক্ষক); তিনি ক্ষতি দূর করেন,

নিয়ায- নযর দান কর তার নামে যার দ্বারা আমরা জীবিত আছি .... তিনি পুনর্জীবিত করেন,

তাঁর আদেশ বিশ্বে কায়েম হয়, সকল কিছুর উপর তাঁর কর্তৃত্ব রয়েছে।”

অন্যত্র জনাব আহমাদ রেযা বলেছে, “হুজুরের (নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর) দরবার ছাড়া কোনো আদেশ প্রতিষ্ঠিত হয় না। হুজুরের নিয়ন্ত্রণ ব্যতীত কেউ কল্যাণ প্রাপ্ত হয় না।”[১৭৫]

আহমাদ রেযা তার ফতোয়ায় লিখেছে, “সকল বিষয়, সকল কল্যাণ, সকল ইচ্ছা, সকল সম্পদ ধর্মের মধ্যে, আখিরাতে, প্রথম দিন থেকে আজ পর্যন্ত, আজ থেকে চিরদিনের জন্য সাইয়্যেদে আলম হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর মুবারক হাত থেকে গ্রহণ করেছে বা করবে।”[১৭৬]

---

[১৭৪] আল ইসতিমদাদ আলা আহ-ইয়ালুল আরনিদাদ পৃ-৩২-৩৩।

[১৭৫] আল-আমান ওয়াল আলা, পৃ-১০৫।

[১৭৬] ফতোয়া রিযভিয়্যাহ, ১ম খণ্ড, পৃ-৫৭৭।

বেরেলভী এক বুযুর্গ লিখেছে, “দুই জাহানের মালিক হলেন দয়ালু দাতা এবং আমরা তাঁর মুখাপেক্ষী সুতরাং কেন এমন হবে যে, তাঁর কাছে যাচনা করা যাবে না?”[১৭৭]

অন্যত্র সে লিখেছে, ‘কুল’ (সবকিছুর) স্রষ্টা আপনাকে সকল কিছুর মালিক বানিয়েছেন। উভয় জগতে আপনার ক্ষমতা ও কর্তৃত্ব রয়েছে। এজন্যই আদম আলাইহিস সালাম আরশের উপর আপনার নাম লিখা দেখেন যাতে তিনি জানতে পারেন যে, আপনি আরশের মালিক।”[১৭৮]

সে অন্যত্র লিখেছে, “হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মদীনা মুনাওয়ারাহ থেকে প্রত্যেক মুহূর্তে সবকিছু দেখছেন এবং সর্বস্থানেই তাঁর নিয়ন্ত্রণ রয়েছে।”[১৭৯]

বেরেলভী পীর আহমাদ রেযা লিখেছে, “খলিফায়ে আযম, হুজুরের নিয়ন্ত্রণে রয়েছে আসমান ও জমীন।”[১৮০]

জনাব আহমাদ রেযার এক অনুসারী তার পীর এবং সাইয়্যেদ হতে উদ্ধৃত করেছে যে, “‘রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সকল যমীন ও মানুষের মালিক, সকল সৃষ্টির মালিক’ এবং ‘হুজুরে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর নিকট রয়েছে সকল সাহায্য-আনুকুল্যের চাবি’ এবং ‘তিনি আসমান-জমীনের (ভাণ্ডারের) চাবির অধিকারী’, ‘তিনি সেই ব্যক্তি যিনি বিচার দিবসে মর্যাদা প্রদান (বন্টন) করবেন’ এবং ‘হুজুরে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বিপদ-আপদ হতে পরিত্রাণ/ মুক্তি দেন’ এবং ‘তিনি তাঁর উম্মতের সংরক্ষক ও ত্রাণকর্তা।”[১৮১]

অপর বেরেলভী পীর লিখেছে: “হুজুরে আকদাস (অর্থাৎ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) হলেন আল্লাহর চূড়ান্ত নায়েব (সহকারী), সকল বিশ্বজাহানকে তাঁর অধীন করে দেয়া হয়েছে; যাকে ইচ্ছা তিনি দেন এবং যার থেকে ইচ্ছা আটকে রাখেন।”[১৮২]

---

[১৭৭] মুওয়াইজ নাঈমিয়্যা, পৃ-৬৭, পাকিস্তান হতে প্রকাশিত।

[১৭৮] প্রাগুক্ত, পৃ-৪১।

[১৭৯] প্রাগুক্ত, পৃ-৩৩।

[১৮০] ফতোয়া রিযভীয়্যাহ, ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃ-১৫৫।

[১৮১] আনওয়ার রাযা, মাকালাহ ‘ইজাজ আল-বেরেলভী, পৃ-২৪০।

[১৮২] বাহারে শরীয়াত, আমজাদ আলী, ১ম খণ্ড, পৃ-১৫

সে লিখেছে, “সকল জমীন তারই রাজ্য, কর্তৃত্বাধীন। সকল আসমানই তাঁর রাজ্য। আসমান-জমীনের ফেরেশতা মণ্ডলী তাঁরই কর্তৃত্বাধীন, তাঁর পবিত্র হাতে অর্পণ করা হয়েছে জান্নাত, জাহান্নামের চাবি। রিযিক, খাদ্য এবং সকল নিয়ামত হুজুরের দরবার হতেই বন্টন করা হয়। দুনিয়া এবং আখিরাত তাঁর অনুগ্রহের (দানের) একটি অংশ মাত্র।”[১৮৩]

বেরেলভী দলের মুফতী আহমাদ ইয়ার গুজরাটি তার আকীদা-বিশ্বাস ঘোষণা করেছে, “সকল বিষয় হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর দানশীল হাতে রয়েছে। যা চান, যাকে চান, দান করেন।”[১৮৪]

শুধু হুজুরে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম একাই চূড়ান্ত হুকুমের মালিক নন, বরং অন্যান্য নবীগণ ও সকল কিছুর মালিক ও সৃষ্টির সকল অন্তরের কথাও জানেন এবং তাদেরকে সাহায্য করেন। তাদের কর্তৃত্ব ও ক্ষমতা রয়েছে সৃষ্টিকে সাহায্য করার।[১৮৫]

আম্বিয়াগণ ছাড়াও এমনকি **সাহাবাগণও জান্নাত-জাহান্নামের মালিক**। মাওযু (জাল ও বানোয়াট) হাদীস থেকে সাহায্য নিয়ে বেরেলভীদের আহমাদ রেযা সাহেব লিখেছে,

“বিচার দিবসে আল্লাহ তা'আলা পূর্বে ও পরে আগত সকলকে একত্রিত করবেন। আরশের দু'পাশে দু'টি নূরের মিম্বার আনা হবে এবং স্থাপন করা হবে। দু'জন লোক (ফেরেশতা) তাতে আরোহন করবে। ডানপাশের জন ডাক দিয়ে বলবে, ‘হে সৃষ্টিকুল! যে আমাকে চিনেছে সেতো চিনেছে, কিন্তু যে চিনতে পারেনি, (সে শুনে রাখ) আমি হলাম জান্নাতের দায়িত্বশীল (ফেরেশতা) ‘রিদওয়ান’। আল্লাহ আমাকে আদেশ দিয়েছেন যে, আমি যেন মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কে জান্নাতের চাবিসমূহ অর্পণ করি এবং মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাকে সেগুলো আবু বাকর ও উমার (রাদিয়াল্লাহু আনহুমা) ’র নিকট হস্তান্তর করতে আদেশ করেছেন যাতে তাঁরা তাঁদের বন্ধুদেরকে জান্নাতে প্রবেশ করাতে পারে। আমার কথা শোনো এবং আমার সাক্ষী হও।

অতঃপর বামপাশের জন ডেকে বলবে, হে সৃষ্টিকুল! যে আমাকে চিনেছে সেতো চিনেছে, কিন্তু যে চিনতে পারেনি, (সে শুনে রাখ) আমি হলাম

---

[১৮৩] প্রাগুক্ত, পৃ-১৫

[১৮৪] জা-আল হাক্ক, আহমাদ ইয়ার গুজরাটি, পৃ-১৯৫।

[১৮৫] প্রাগুক্ত, পৃ-১৯৫-১৯৬।

জাহান্নামের দারোয়ান (ফেরেশতা) মালিক। আল্লাহ আমাকে আদেশ দিয়েছেন যে, আমি যেন মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কে জাহান্নামের চাবিসমূহ অর্পণ করি এবং মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাকে সেগুলো আবু বাকর ও উমার (রাদিয়াল্লাহু আনহুমা) 'র নিকট হস্তান্তর করতে আদেশ করেছেন যাতে তাঁরা তাঁদের শত্রুদেরকে জাহান্নামে প্রবেশ করাতে পারেন। আমার কথা কোনো এবং আমার সাক্ষী হও।"[১৮৬]

শিয়াদের সাথে তার সংশ্লিষ্টতা প্রমাণ করে এবং তাকিয়ার পর্দা উন্মোচন করে আলী (রাদিয়াল্লাহু আনহু) সম্পর্কে সে বলেছে, "আলী (রাদিয়াল্লাহু আনহু) জাহান্নামের বন্টনকারী। অর্থাৎ তিনি তার বন্ধুদের জান্নাতে প্রবেশ করাবেন এবং তার শত্রুদের জাহান্নামে প্রবেশ করাবেন।"[১৮৭]

জনাব আহমাদ রেযা বেরেলভী **শায়খ আব্দুল কাদের জিলানীর মর্যাদার ব্যাপারে বাড়াবাড়ি** করে বলেন, তিনি সাহায্য প্রার্থনাকারীদের সাহায্যকারী ও আশ্রয় প্রার্থনা কারীদের আশ্রয়কারী। তিনি তার ব্যাপারে আরো বলেন,

"(তিনি) দুনিয়ার কার্যাবলির কর্তৃত্ব, অনুমতি প্রাপ্ত এবং পরিচালনার অধিকারী।"[১৮৮] আরো বলেন,

"হে গাওস আপনি জীবন দানকারী, আপনি মৃত্যুদানকারী

নবী হচ্ছে বন্টনকারী, আপনি পৌঁছানে ওয়ালা।[১৮৯]

এবং তাকে আহ্বান করে সে আরো বলেছে

"হে আল্লাহর ছায়া আব্দুল কাদের

আপনি বান্দাদের আশ্রয়স্থল হে আব্দুল কাদের

আমারা ফকীর ও আপনার মুখাপেক্ষী

আপনি হচ্ছেন সম্মান ও মুকুটের অধিকারী।

আপনি আল্লাহর হে আব্দুল কাদীর।" [১৯০]

---

[১৮৬] আল আমান ওয়াল আলা, আহমাদ রেযা, পৃ-৫৭।

[১৮৭] প্রাগুক্ত, পৃ-৫৮।

[১৮৮] হাদায়িকু বাখশীশ, বেরেলভী, পৃ. ১২৫-১২৬।

[১৮৯] প্রাগুক্ত, পৃ- ১২৫-১২৬

[১৯০] প্রাগুক্ত, পৃ. ১৮৬।

অন্যত্র সে লিখেছে,

“হে আব্দুল কাদের! হে এমন ব্যক্তি যিনি কল্যাণ করেন, যিনি চাওয়া ছাড়াই দয়া করে দান করেন। হে সওয়াব (পুরস্কার) ও অনুগ্রহের মালিক, আপনি সুউচ্চ ও সুমহান। আমাদের প্রতি দয়া করুন এবং তার দুআ শুনুন যে দুআ করছে। হে আব্দুল কাদির, আপনি আমাদের আশা পূরণ করুন! “[১৯১]

অপর এক স্থানে সে লিখেছে,

“আব্দুল কাদের আরশের উপর তাঁর বিছানা বিছিয়েছেন এবং তিনি আরশকে জমীনে নামিয়ে নিয়ে এসেছেন।”[১৯২]

এদের শিরকী আকীদা প্রমাণ করতে আব্দুল কাদের জীলানীর উপর মিথ্যারোপ করে বলে যে, আব্দুল কাদের জিলানী বলেছেন,

“আল্লাহ আমাকে সকল ওলীর প্রধান বানিয়েছেন,

সকল অবস্থায় আমার নির্দেশ বাস্তবায়িত হয়।

হে আমার মুরীদগণ! শত্রুদের ব্যাপারে ভয় পেয়ো না।

আমি হলাম এমন ব্যক্তি যে বিরোধিদের হত্যা করি।

আসমান জমীনে আমার শাসন কর্তৃত্ব রয়েছে।

আমার উচ্চ মর্যাদা রয়েছে।

আল্লাহর পূরো রাজ্য আমার নিয়ন্ত্রণে রয়েছে।

আমার সকল অবস্থা যেকোনো ত্রুটি হতে মুক্ত।

সব সময় গোটা পৃথিবী আমার চোখের সামনে থাকে।

আমি জিলানী, মুহীউদ্দীন আমার নাম, পাহাড়ের উপর রয়েছে আমার চিহ্ন।”[১৯৩]

“বিশ্বের লোকদের সকল কর্তৃত্ব ও আধিপত্য রয়েছে আমার অধিকারে, আমি যাকে ইচ্ছা দেই, যার থেকে ইচ্ছা আটকে রাখি।”[১৯৪]

---

[১৯১] প্রাগুক্ত, পৃ-১৭৯

[১৯২] প্রাগুক্ত, পৃ-১৮৪।

[১৯৩] আল যমযমাতুল কামারিয়া পৃ- ৩৫।

[১৯৪] খালিসুল ইতিকাদ, বেরেলভী, পৃ-৪৯।

অপর একটি মিথ্যাচার বিশ্লেষণ করুন!

জনাব বেরেলভী শায়খ জিলানীর প্রতি মিথ্যারোপ করে বলে যে, তিনি বলেছেন, "সকল মানুষের অন্তর আমার হাতের মুঠোয়। যদি আমি চাই তবে তাদেরকে আমার দিকে ঘুরিয়ে দিই, আর যদি চাই তবে (আমার দিক থেকে) ফিরিয়ে দিই।"[১৯৫]

বেরেলভীর এক অনুসারীর আকীদা লক্ষ্য করুন!

"তাশবিয়াত (সাদৃশ্য)-এর অধিকার লাওহে মাহফুজে সংরক্ষিত রয়েছে, গাওস আল-গাওস[১৯৬] (আব্দুল কাদীর) একজন পুরুষকে একটি নারীতে রূপান্তরিত করতে পারে।"

এ লাইন দুটির ব্যাখ্যা শুনুন এক বেরেলভীর মুখে: "শায়খ শাহাবুদ্দিন সোহরাওয়ার্দী যিনি সোহরাওয়ার্দী তরীকার একজন ইমাম, তার মা নিজেকে গাওসুস সাকালাইন এর পিতার নিকট পেশ করেছিল এবং বলেছিল, হুজুর দুআ করুন যেন আমার একটি ছেলে হয়। তিনি লাওহে মাহফুজে দেখলেন এবং সেখানে দেখতে পেলেন যে, সেখানে একটি কন্যার কথা লেখা আছে এবং (তিনি) বললেন, 'তোমার একটি মেয়ে হবে'। এ শুনে তিনি ফিরে গেলেন। ফেরার পথে তার হুজুর গাওসুল আযম (শায়খ জিলানী) এর সাথে সাক্ষাত হলো। তাঁর প্রশ্ন করার পরে সে মহিলা পুরো ঘটনা বর্ণনা করল। হুজুর বললেন, 'যাও, তোমার একটি ছেলে হবে'। কিন্তু প্রসবের সময় দেখা গেল একটি মেয়ে জন্মগ্রহণ করল। সে এ অভিযোগ নিয়ে গাওসের দরবারে গেলেন এবং বললেন, 'হুজুর, আমি একটি ছেলে চেয়েছিলাম আর পেলাম একটি মেয়ে? তিনি বললেন, 'তাকে এখানে নিয়ে এসো'। (অতঃপর) কাপড় সরিয়ে তিনি বললেন, 'দেখো, সে মেয়ে না ছেলে।' যখন সে তাকাল দেখল যে সে একটি ছেলে! আর সে-ই ছিলেন শায়খ সোহরাওয়ার্দী আলাইহি রাহমাহ। তাঁর পবিত্র বর্ণনায় এসেছে যে, তাঁর (সোহরাওয়ার্দীর) স্তন ছিল মেয়েদের মত।"[১৯৭]

বেরেলভীর সেই একই মুরীদ অপর একটি ঘটনা বর্ণনা করেছে যার সারসংক্ষেপ হলো, এক ব্যক্তির তাকদীরে মৃত্যু লেখা ছিল, শায়খ জিলানী

[১৯৫] হিক্যায়াত, রিযভীয়্যাহ, বরকতী বেরেলভী কর্তৃক 'মালফুযাত' এ বর্ণিত, পৃ-১২০।

[১৯৬] গাওস' বা আল গাওস: গাওস অর্থ সাহায্য, ত্রাণ, উদ্ধার, মুক্তি। গাওসুল আযম' বলতে বোঝায় সর্বশ্রেষ্ঠ সাহায্যকারী বা সবচেয়ে বড় ত্রাণকর্তা। আর এ গুণটি আল্লাহর জন্যই নির্ধারিত। মহান সাহায্যকারীতো কেবল মহান আল্লাহ।

[১৯৭] প্রাগুক্ত, পৃ-২৭।

তার তাকদীর পরিবর্তন করে দেন এবং তাকে নির্ধারিত সময়ে মৃত্যুবরণ করা হতে রক্ষা করেন।”[১৯৮]

জনাব বেরেলভী তার বইতে উদ্ধৃত করেছে, “আমাদের শায়খ সাইয়্যেদুনা আব্দুল কাদির তাঁর মজলিসে ভূমি হতে উর্ধ্বে বায়ুর উপর প্রেমোন্মত্ত হয়ে বসতেন এবং বলতেন: ‘ততক্ষণ পর্যন্ত সুর্য উদিত হয় না, যতক্ষণ না আমাকে সালাম দেয়। যখন নতুন বছর আগমন করে, সে আমাকে সালাম দেয় এবং আমাকে জানিয়ে দেয় তাতে (সেবছরে) কী কী ঘটবে। যখন নতুন সপ্তাহের আগমন ঘটে, তা আমাকে সালাম দেয় এবং তাতে কী কী ঘটবে তা আমাকে জানিয়ে দেয় এবং যখন নতুন দিনের আগমন ঘটে, তা আমাকে সালাম দেয় এবং তাতে কী কী ঘটতে যাচ্ছে তা আমাকে জানিয়ে দেয়।”[১৯৯]

আর এ সকল ক্ষমতা ও কর্তৃত্ব শুধু শায়খ জিলানীর মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়, বরং স্রষ্টার এ সকল গুণাবলিতে সুফীবাদের সকল ওলী ও পীরদের শরীকানা (অংশীদারিত্ব) রয়েছে। এসব গুণাবলির দ্বারাই তাদের বর্ণনা দেয়া হয় এবং তারা এসবের মালিকও।

তাই আহমাদ রেযার ছেলে বলেছে, “নিঃসন্দেহে সকল শায়খ, আউলিয়া, আলেম তাদের অনুসারীদের জন্য সুপারিশ করে (মধ্যস্থতা করে) এবং যখন তাদের অনুসারীগণের রূহ কবয করা হয়, যখন মুনকার নাকীর তাদের প্রশ্ন করে (কবরে), যখন সে পুনরুত্থিত হবে (কিয়ামাত) দিবসে, যখন তার আমালনামা খোলা হবে (হাশরে), যখন তাকে জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে ও হিসাব নেয়া হবে, যখন তার আমাল ওজন করা হবে, যখন সে পুলসিরাতের উপর হাটবে, প্রতিমুহূর্তে এবং সার্বক্ষণিক তাঁরা (শায়খরা) তাদের পথ প্রদর্শক হিসেবে কাজ করবে। কোনো স্থানেই তার থেকে অমনেযোগী হবে না (তাকে ভুলে যাবে না)। সকল ইমাম তাদের অনুসারীদের জন্য সুপারিশ করবে (তাদের মধ্যস্থতা করে পাপের জন্য অনুনয় বিনয় করবে) এবং পৃথিবীতে কবরে এবং আখিরাতে সর্বদা তারা তাদের প্রতি নজর রাখে এবং তাদেরকে ক্ষতি হতে রক্ষা করে তারা পুলসিরাত পার না হওয়া পর্যন্ত।”[২০০]

---

[১৯৮] বাগই ফেরদৌস, আইয়ুব আলী রিযভী বেরেলভী, পৃ-২৭, ভারতে প্রকাশিত।

[১৯৯] আল আমান ওয়াল আলা, বেরেলভী।

[২০০] আল ইসতিমদাদুল হাওয়ামিশ পৃ-৩৫-৩৬।

“আসমান হতে জমীন পর্যন্ত আবদালের রাজত্ব এবং আরশ হতে ফার্শ (ভূমির তলদেশ) পর্যন্ত ‘আরিফের রাজত্ব।”[২০১]

আহমাদ রেযা নিজে বলেছে, “আউলিয়াগণের মাধ্যমে (মধ্যস্থতায়) সৃষ্টিজগতের শৃংখলা কায়েম (প্রতিষ্ঠিত) আছে।”[২০২]

এছাড়াও “সম্মানিত ওলীরা মৃতকে জীবিত করতে পারে, জন্মান্ধ এবং কুষ্ঠরোগীকে আরোগ্য দান করতে পারে এবং এক পদক্ষেপে গোটা পৃথিবী অতিক্রম করতে সক্ষম।”[২০৩]

“গাওস সদা সর্বদা বিরাজমান (উপস্থিত), তিনি ছাড়া আসমান জমীন প্রতিষ্ঠিত থাকতে পারে না।”[২০৪]

বেরেলভী সাহেবের এক অনুসারী লিখেছে, “আউলিয়াগণ তাদের মুরীদগণকে সাহায্য করেন এবং তাদের শত্রুদের ধ্বংস করেন।”[২০৫]

বেরেলভীদের বিখ্যাত মুফতী আহমাদ ইয়ার গুজরাটি লিখেছে, “আউলিয়াগণ তাদের প্রভুর নিকট হতে এ ক্ষমতা পেয়েছে যে, তারা নিক্ষিপ্ত তীরকে ফিরিয়ে আনতে পারেন।”[২০৬]

একই মুফতী সাহেব লিখেছে, “আউলিয়াগণ কবরে মাছি তাড়ানোর ক্ষমতাই শুধু রাখেন না, বরং তারা বিশ্বজাহানকেও উল্টে দিতে পারেন। কিন্তু তারা (সেদিকে) খুব একটা খেয়াল দেন না।”[২০৭]

বেরেলভীদের আরেক নেতা লিখেছে, “অনেক আউলিয়া স্পষ্ট আসন্ন মৃত্যুর সম্পর্কে অবগত।[২০৮]

---

[২০১] প্রাগুক্ত, পৃ-৩৪।

[২০২] আল আমান ওয়াল আলা, পৃ-৩৪।

[২০৩] হাকাইয়াত রিজভীয়া, পৃ.-৪৪

[২০৪] রাসূল আল কালাম, দিদার আলী বেরেলভী, পৃ-২৯ লাহোর থেকে প্রকাশিত।

[২০৫] প্রাগুক্ত, পৃ-১২৯।

[২০৬] জা-আল হাক্ব, আহমাদ ইয়ার।

[২০৭] প্রাগুক্ত, পৃ-২-৩।

[২০৮] বাহারে শরীয়াত, আমজাদ আলী, ১ম খণ্ড, পৃ-৬।

আরেক বেরেলভী সাহেব বলেছে, “আউলিয়াদের ক্ষমতা ও কর্তৃত্ব তাদের মৃত্যুর পরে বেড়ে যায়।”[২০৯]

এ হলো গায়রুল্লাহ সম্পর্কে তাদের আকীদা। তারা তাদের দুআ ও অভাব-অভিযোগে অন্যদেরকে শরীক করে এবং আল্লাহর গুণাবলি ও ক্ষমতা তাঁর কিছু সৃষ্টির মাঝে বন্টন করে, যেখানে ইসলামী শরীয়াতে মুখাপেক্ষীহীনতা (স্বয়ংসম্পূর্ণতা) ও সকল সাহায্য দান একমাত্র আল্লাহর জন্যই নির্ধারিত।

বেরেলভীগণ এ সকল গুণাবলি তাদের আউলিয়াগণের মাঝে বন্টন করে দিয়েছে যা খ্রিষ্টানরা ঈসা আলাইহিস সালামের উপর আরোপ করেছিল, ইহুদীরা উযায়র আলাইহিস সালামের উপর এবং মক্কার মুশরিকরা লাত, হোবল, উয্যা, মানাত এবং অন্যান্যদের উপর আরোপ করেছিল।

- اف لكم ولما تعبدون অর্থাৎ “ধিক তোমাদের প্রতি এবং তোমরা যাদের ইবাদত কর, তাদের প্রতি!”

যেন এটা মনে করবেন না যে, বেরেলভীদের ইমাম জনাব আহমাদ রেযা বেরেলভীর স্রষ্টার এ সকল গুণাবলিতে কোনো অংশীদারিত্ব নেই! অন্যান্য আউলিয়াগণের মত সে (আহমাদ রেযা) নিজেও ছিলেন দাতা, আরোগ্যদানকারী, গাওস, সর্বোচ্চ ক্ষমতার অধিকারী, প্রয়োজন পূরণকারী এবং দুঃখ-কষ্ট দূরকারী!! তার এক মুরীদ তার পীর আহমাদ রেযা সম্পর্কে, তার গুণাবলি তার বই ‘মাদায়ে’হ আলা হযরত’ -এ লিখেছে, “

”ইয়া সাইয়্যেদী আমার মুরশীদ, ইয়া আমার মালিকী, ইয়া শাফী’ (আরোগ্যদাতা)

হে দস্তগীর, হে সাইয়্যেদী আহমাদ রেযা,

(আপনি) অন্ধকে দৃষ্টি ফিরিয়ে দিয়েছিলেন,

বধিরকে শ্রবণশক্তি দান করেছিলেন,

নবীর দীনকে আলোকিত করেছিলেন,

হে সাইয়্যেদী আহমাদ রেযা

আত্মার অসুস্থতা ও উম্মাহর আত্মার জন্য

আপনার দরজা ছিল আরোগ্যের দরবার,

[২০৯] ফতোয়া না’ঈমিয়া, পৃ-২৪৯।

হে সাইয়্যেদী আহমাদ রেযা।"[২১০]

একই ভক্ত আহমাদ রেযার সামনে অভিযোগ পেশ করছে এবং তার সামনে তার কাপড় বিছিয়ে দিচ্ছে এবং তাকে এভাবে ডাকছে,

"হে আমার মালিক, হে আমার দাতা...

(আশাকরি) আমি এক টুকরা পাব,

অনেকদিন ধরেই তোমার এ কুকুর আশা করছে,

হে প্রিয়, নিজ দয়ায় তাকে গ্রহণ কর,

এই হতভাগা তোমার জন্য একটি চাদর 'নজরানা' হিসেবে এনেছে

এ রিয্‌ভী দাসের প্রতি রহমতের দৃষ্টি দাও

যদিও সে মন্দ, একজন চোর (সর্বোপরি) সে তোমার কুকুর।"[২১১]

অপর বেরেলভী মুরীদ লিখেছে,

"কিয়ামত দিবসে আশ্রয়ের/নিরাপত্তার জন্য কী উপায় করেছ?

(যখন) আহলুস সুন্নাহর ইমাম কর্তৃত্বের (ক্ষমতার) অধিকারী হবে?"[২১২]

"কার নিকট আমি আবেদন করব? পরম প্রভু ও মালিক ...

আমি তোমার কাছে প্রশ্ন করি,

তুমি ছাড়া আমার সাহায্যকারী কে আছে সুন্নাতে আলা হযরত,

আমি যা প্রার্থন করেছি সর্বদা তা পেয়েছি, এবার কেন দেরী হচ্ছে?

হে আমার দাতা প্রাচুর্য্যের অধিকারী, রিযিকদাতা, সুন্নাতে আলা হযরত।

যখন আমি হাত তুলে দাঁড়িয়ে আছি, তোমার ভিখারী অভাবে (রয়েছে)

....

এখন দয়া কর, হে আমার সাহায্যকারী সুন্নাতে আলা হযরত।"[২১৩]

---

[২১০] মাদায়ে'হ আলা হযরত, আউয়ুব রিযভী, পৃ-৫।

[২১১] মাদায়ে'হ আলা হযরত, আউয়ুব রিযভী, পৃ. ৪-৫।

[২১২] বাগ-ই ফেরদৌস, আউয়ুব রিযভী, পৃ- ৪।

[২১৩] মাদায়ে'হ আলা হযরত, পৃ-২৩।

(আরো শুনুন)

"তিনি হলেন এমন ব্যক্তি যিনি অসহায় ব্যক্তিদের দুআ শুনেন,

যার প্রয়োজন রয়েছে তাকে তিনিই দান করেন,

আমার তারকাসমূহ (ভাগ্যরাশিফল) কেন সর্বোচ্চ উচ্চতায় থাকবে না?

এখানে আছেন আমার মালিক এবং সেখানে রয়েছে আহমাদ রেযা,

আমি আমার (বদ) আমলের (কর্মের) ওজনকে কেন ভয় করব? (মীযানকে কেন ডরাব?)

আমাকে রক্ষা করার জন্য আমার রক্ষককে যখন ওজন করা হবে?"[২১৪]

অপর এক বেরেলভী কবির আকীদা,

"আমার তরী বিপদাপন্ন,

আমায় সাহায্য করুন, আহমাদ রেযা,

চারিপাশ থেকে একসাথে বিপদ ঘনিয়ে আসছে,

হে আমার বিপদে উদ্ধারকারী, আহমাদ রেযা,

আমার প্রসারিত হাতের সম্মান রক্ষা করুন,

হে আমার প্রয়োজনপূরণকারী, আহমাদ রেযা,

আমার থলে পূর্ণ করে দাও, হে আমার দাতা,

আমি তোমার দরজার ভিখারী, আহমাদ রেযা।"[২১৫]

অপর এক বেরেলভী কবি এ কবিতায় তার আকীদা ঘোষণা করছে,

"হে গাওস ও আউলিয়াগণের কুতুব, আহমাদ রেযা,

আপনি আমায় বিপদ থেকে উদ্ধারকারী, আহমাদ রেযা

আপনারই (প্রতি) আশা উভয় জগতে,

হ্যাঁ, আমাকে সাহায্য করুন, শাহ আহমাদ রেযা,

---

[২১৪] প্রাগুক্ত, পৃ-৫৪।

[২১৫] মাগমাতুর রূহ, ইসমাঈল রিয্‌ভী, পৃ-৪৪-৪৫।

আমি আপনার এবং আপনি হলেন আমার, আহমাদ রেযা।”[২১৬]

হে পাঠক! এগুলো বিচার-বিশ্লেষণ করুন। এসকল আকীদা কি কুরআনের সুস্পষ্ট আয়াতসমূহকে বিদ্রূপের শামিল নয়? তাদের আকীদা এবং কুরআন ও সুন্নাহর মাঝে কি কোনো মিল আছে? এ থেকে কি পরিষ্কার নয় যে, তাদের উদ্দেশ্য হলো শিরকী আকীদা ও ইসলাম-পূর্ব (জাহিলিয়্যাতের) ধ্যান-ধারণার ব্যাপক প্রচার-প্রসার? মক্কার মুশরিকদের আকীদা-বিশ্বাস কি এর চেয়ে বেশি খারাপ ছিল?

এ সম্পর্কে ‘ওয়াকতে আছর’ ‘ফরীদ দাহর’ (তুলনাহীন) ভারতীয় উপমহাদেশের খ্যাত মুফাসসির ও মুহাদ্দিস নওয়াব হাসান খাঁন-এর তাফসীর ফতহুল বায়ান’ থেকে একটি অংশ উল্লেখ করাকে যথাযথ হবে বলে আমরা অনুভব করছি।

নওয়াব হাসান খাঁন তার “তাফসীর ফাতহুল বায়ানে” এ আয়াত “বলুন (হে মুহাম্মদ) আমার নিজের কোনো ক্ষতি বা উপকার করার ক্ষমতা আমি রাখি না, আল্লাহ যা ইচ্ছা করেন তা ব্যতীত”-এর তাফসীরে লিখেছেন-

“এ আয়াতে কারীমাতে এ সকল লোকদের জন্য মারাত্মক হুমকি রয়েছে যারা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বিপদের সময় আহ্বান করার আকীদা পোষণ করে, কারণ (এ আয়াত) স্পষ্টভাবে উল্লেখ আছে যে, বিপদে-আপদে একমাত্র আল্লাহই সাহায্য করার ক্ষমতা রাখেন। তিনি সেই মহান স্বত্তা যিনি রাসূলগণকে ও নেককারগণকে সাহায্য করেন। এ আয়াতেও আল্লাহ তাঁর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কে নির্দেশ দিয়েছেন তাঁর উম্মাতকে পরিষ্কার ভাষায় এ কথা বলতে যে, তিনি কোনো রকম উপকার বা ক্ষতির ক্ষমতা রাখেন না, এমনকি তাঁর নিজেরও না। কুরআন বলছে যে এমনকি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম -এর ক্ষতি বা উপকার করার কোনো ক্ষমতা নেই, তাহলে কিভাবে তিনি ‘মুখতারে কুল’ (সবকিছুর মালিক) হতে পারেন?

আর যদি ‘খাতামুন নাবিয়্যিন’ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম -এর স্রষ্টাসুলভ ক্ষমতা না থেকে থাকে, তবে সৃষ্টির অন্যান্যদেরকে কিভাবে প্রয়োজনপূরণকারী ও বিপদে উদ্ধারকর্তা মনে করা যেতে পারে?

[২১৬] প্রাগুক্ত, নূর আহমদ আজমী, পৃ. ৪৭-৪৮।

এ ধরনের লোকদের দেখে আশ্চর্যই হতে হয় যারা তাদের সামনে হাত তুলে এবং তাদের নিকট প্রার্থনা করে এবং তাদের কে তাদের বিপদ-আপদে আহ্বান করে যখন তারা একটন মাটির নিচে অবস্থান করে (তাদের কবরে)!

তারা কেন এ শিরক পরিত্যাগ করে না এবং তারা কেন আল্লাহ ও তাঁর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর শিক্ষার উপরে চিন্তা-গবেষণা করে না? কখন তারা এ আয়াতের সঠিক তাফসীর জানবে, "বল (হে মুহাম্মদ) তিনি আল্লাহ একক।" (সূরা ইখলাস ১১২:১)? কখন তারা "লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ্' এর সঠিক অর্থ অনুধাবন করবে?

তার উপর আবার যারা জ্ঞান-বুদ্ধির দাবি করে, তাদের বক্তা ও আলিমগণ, যাদেরকে লোকেরা তাদের নেতা হিসেবে গ্রহণ করেছে, তারা কেন তাদেরকে এসব শিরকী আকীদা -বিশ্বাস ও জাহিলিয়্যাতের চিন্তা-ধারা থেকে বারণ করে না? কেন তারা তাদের মুখে মোহর মেরে রেখেছে?

তাদের আকীদা জাহেলী যুগের লোকদের আকীদার চেয়েও মন্দ। তারা তো কেবল তাদের মা'বুদদেরকে (যাদেরকে তারা আহ্বান করতো) আল্লাহর নিকট তাদের জন্য সুপারিশকারী বলে মনে করতো। কিন্তু এ সকল লোকেরা আল্লাহর পরিবর্তে রুবুবিয়াতের সকল ক্ষমতা তাদের আউলিয়াদেরকে দিয়ে রেখেছে। তাদের পীরদের নিকট যখন তারা সরাসরি সাহায্য প্রার্থনা করে তখন তারা বিন্দুমাত্রও ভয় করে না।

শয়তান এদের মনে তার কু চিন্তা-ধারার বীজ বপণ করেছে। তারা অবিরামভাবে শয়তানের অনুসরণ করে যাচ্ছে এবং এমনকি তারা তা জানেও না। তারা মনে করছে তারা সুপথেই রয়েছে- কিন্তু তারা কেবল শয়তানের চক্ষুই জুড়াচ্ছে এবং তার (শয়তানের) আনন্দের সামান জোগাড় করছে।[২১৭]

শাইখুল ইসলাম ইবনে তাইমিয়্যাহ রহিমাহুল্লাহ এর বক্তব্য উল্লেখ করে শেষ করব। শাইখুল ইসলাম ইবনে তাইমিয়্যাহ রহিমাহুল্লাহ বলেন,

বায়েজিদ বোস্তামী বলেছেলেন, "মাখলুক তথা সৃষ্টি কর্তৃক অপর মাখলুকের কাছে সাহায্য প্রার্থনা করা ঠিক তেমনই, যেমন ডুবন্ত ব্যক্তির অপর কোনো ডুবন্ত ব্যক্তির নিকট সাহায্য প্রার্থনা করা।" শাইখ আবূ আব্দুল্লাহ আল কুরাশী বলেন,

[২১৭] ফতহুল বায়ান, নওয়াব হাসান খাঁন, ৪র্থ খণ্ড, পৃ-২১৫।

“মাখলুক তথা সৃষ্টি কর্তৃক অপর মাখলুকের কাছে সাহায্য প্রার্থনা করা ঠিক তেমনই, যেমন বন্দী ব্যক্তির অপর কোনো বন্দী ব্যক্তির নিকট প্রার্থনা করা। আবার মূসা (আলাইহিস সালাম) তাঁর দুআয় বলেছিলেন,

اللّٰهُمَّ لك الحمد واليك المشتكي وأنت المستعان وبك المستغاث وعليك توكلت ولا حول ولا قوة إلا بك.

হে আল্লাহ সকল প্রশংসা আপনারই। আপনার নিকটই সমস্ত আবেদন। আপনিই সাহায্যকারী। আপনার নিকটই আশ্রয় চাই। আপনার উপরই ভরষা করি। আপনি ছাড়া কারো কোন শক্তি ও ক্ষমতা নেই।

ফলে, সালফে সালেহীনদের কারো থেকেই এ কথা বর্ণিত হয়নি যে, আল্লাহ ব্যতীত অন্য কারো নিকট সাহায্য প্রার্থনা করা জায়েয।[২১৮]

৩. মৃতদের শ্রবণ সম্পর্কে তাদের আকীদা

বেরেলভীদের এ আকীদা পূর্ববর্তী আকীদারই একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ বিশেষ। কারণ মৃতরা তখনই কেবল প্রয়োজন পূরণ ও দুঃখ-দূর্দশা দূর করতে পারবে যখন তারা তাদের ডাক শুনতে পাবে। তাদের পীর ও শায়খদের সম্পর্কে বেরেলভী ফিরকার আকীদা হলো, তাদের মুরীদগণ পৃথিবীর যেকোনো জায়গা হতে তাদের ডাকুক না কেন, ‘তারা তাদের মুরীদগণের ডাক শুনতে পায় ও তাদের সাহায্য করতে আসে’ এবং এর উপর ভিত্তি করে তারা বলে, “আউলিয়াগণ তাদের কবরে অনন্ত জীবনসহ জীবিত। তাদের জ্ঞান ও অনুভূতি, শ্রবণ ও দৃষ্টিশক্তি তাদের (কবরে) পূর্বের চেয়ে অনেক বেশি (শক্তিশালী) হয়।”[২১৯]

অর্থাৎ জীবিত অবস্থায় তারা দুনিয়াবী বিষয়াদি দ্বারা পরিবেষ্টিত ছিল। মৃত্যুর পর তারা দুনিয়াবী প্রয়োজনাদি থেকে মুক্তি পায়, ফলে তাদের দর্শন ও শ্রবণ ক্ষমতা অনেক বেড়ে যায়। এ অনৈসলামী মতবাদ ব্যাখ্যা করতে গিয়ে বেরেলভী ইমামগণের একজন লিখেছে, “নিঃসন্দেহে যখন নেককারদের রূহ

[২১৮] ইবনু তাইমিয়্যাহ, মাজমু’ ফতোয়া ১/১১২।

[২১৯] বাহারে শরীয়াত, আমজাদ আলী, ১ম খণ্ড পৃ-৫৮।

দেহ হতে আলাদা হয়, তখন তারা সুউচ্চ জগতে মিলিত হয় এবং সকল কিছু দেখে এবং শোনে যেন তারা এখানে উপস্থিত রয়েছে।”[২২০]

অপর বেরেলভী পীর লিখেছে, “মৃতেরা শোনে এবং তাদের মৃত্যুর পর প্রিয়জনদের সাহায্য করে।”[২২১]

আরেক বেরেলভী লিখেছে, “শায়খ জিলানী সবসময় দেখেন এবং সকলের ডাক শোনেন। আল্লাহর ওলীরা সকল কিছু স্পষ্টভাবে দেখেন, সে দূরে হোক বা কাছে হোক।”[২২২]

বেরেলভীদের ইমাম আহমাদ রেযা নিজে উদ্ধৃত করেছে, “মৃতরা শুনতে পায়। কারণ যারা শুনতে পায় কেবল তাদেরকেই সম্বোধন করা হয় (ডাকা হয়)।”[২২৩]

বেরেলভী খান সাহেব তার বইতে অনেক ইসরাঈলী রেওয়ায়েত ও কাল্পনিক, উদ্ভট কিচ্ছা-কাহিনী উল্লেখ করেছে যার দ্বারা সে এ কথা-ই শুধু প্রমাণ করতে চায়নি যে, দীনের বুযুর্গগণ তাদের মৃত্যুর পরে শুনতে পায়, বরং এটাও প্রমাণ করতে চেয়েছে যে, তারা কথাও বলতে পারে। তাই সে বলেছে “সাইয়্যেদ ইসমাঈল হাযরামী একটি কবরের পাশ দিয়ে যাচ্ছিলেন এবং (তিনি বুঝতে পারলেন!) মৃতদেরকে শাস্তি দেয়া হচ্ছিল। তিনি দুআ করলেন এবং এর ফলে তাদের শাস্তি দূরীভূত হয়ে যেতে দেখলেন। একটি কবর হতে একটি কণ্ঠ (ভেসে) এলো, “হে হযরত! আমার থেকে শাস্তি উঠিয়ে নেয়া হয়নি। তিনি দুআ করলেন এবং তার থেকেও শাস্তি দূর হয়ে গেল। (সংক্ষেপিত)”[২২৪]

অপর বেরেলভী ইমামের কাল্পনিক ঘটনাটি বিচার করুন। সে বলেছে, “ইয়া আলী বা ‘ইয়া গাওস’ বলে ডাকা জায়েয কারণ আল্লাহর প্রিয় বান্দারা তাদের বারযাখে (কবরে) শুনতে পান।”[২২৫]

জনাব আহমাদ রেযা বেরেলভী আকীদা পোষণ করে যে, নবী ও ওলীগণের মৃত্যু হয় না, বরং তাদেরকে জীবিত কবরস্থ করা হয়। তাদের জীব এই দুনিয়ার জীবনের চেয়ে অধিক উত্তম ও উচ্চ মর্যাদাবিশিষ্ট। নবীগণ সম্পর্কে

[২২০] প্রাগুক্ত, পৃ-১৮-১৯।

[২২১] ইলমুল কুরআন, আহমদ ইয়ার, পৃ-১৮৯।

[২২২] মুফতী আব্দুল কাদীর, পৃ-৭ লাহোরে প্রকাশিত।

[২২৩] ফতোয়া রিযভিয়্যাহ, বেরেলভী ৪র্থ খণ্ড, পৃ-২২।

[২২৪] হাকায়্যাত রিযভিয়্যাহ, পৃ-৫৮।

[২২৫] ফতোয়া নূরিয়্যাহ, নুরুল্লাহ কাদরী, পৃ. ৫২৭।

জনাব বেরেলভী বলে, “নবীগণের (আলাইহিমুস সালাতু ওয়াস সালাম) জীবন আসলে জাগতিক উপলব্ধির বিষয়। এটা কেবল আল্লাহর সেই ওয়াদার পূরণ যে একমুহূর্তের জন্য তাদের উপর মৃত্যু ঘটে। অতঃপর তৎক্ষণাৎ জীবন ফিরিয়ে দেয়া হয় এবং এ জীবনেও পার্থিব জীবনের হুকুম প্রযোজ্য। তাঁদের মীরাছ বন্টিত হবে না এবং তাদের স্ত্রীদের বিবাহ করা হারাম বরং তাদের উপর কোনো ইদ্দত নেই। তাঁরা তাঁদের কবরে পানাহার করে এবং সালাত আদায় করে।”[২২৬]

অপর বেরেলভী বলেছে, “চল্লিশ দিন সময় পরে নবীগণ কবরে সালাত আদায় শুরু করেন।”[২২৭]

“নবীগণ তাঁদের কবরে জীবিত। তাঁরা (তাঁদের কবরে) হাঁটা চলা করেন। তাঁরা সালাত আদায় করেন, কথা বলেন এবং সৃষ্টিকুলের বিষয়াদি সমাধান করেন।”[২২৮]

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর উপর দোষারোপ করে তারা তাদের কিতাবাদিতে লিখেছে যে, সাহাবাগণ যখন তাঁকে কবরস্থ করেণ, তখন তিনি জীবিত ছিলেন। তাই বেরেলভী সাহেব লিখেছে, “যখন হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কে তার মুবারক কবরে নামানো হচ্ছিল তখন তিনি বলছিলেন, ‘আমার উম্মত, আমার উম্মাত।”[২২৯]

আবার বেরেলভীর এক মুরীদ লিখেছে, “যখন হুজুর صلى الله عليه وآله وسلم এর রূহ মুবারক কবয করা হয়, তখনও তাঁর দেহে প্রাণ ছিল।”[২৩০]

অপর বেরেলভী মুরীদ লিখেছে, “আমাদের আলেমরা বলেছেন যে, হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর জীবিত অবস্থা ও মৃত্যুর মধ্যে কোনো তফাৎ নেই। তিনি তাঁর উম্মাতকে দেখেন এবং তিনি তাদের অবস্থা, ইচ্ছা, উদ্দেশ্যসমূহ ও তাদের মনের অবস্থাও জানেন। এসব তাঁর কাছে পুরোপুরি পরিষ্কার এবং এতে কোনো বাধা-প্রতিবন্ধকতা নেই।”[২৩১]

---

[২২৬] মালফুযাত, বেরেলভী, ৩য় খণ্ড, পৃ-২৭৬।

[২২৭] রাসূলুল কালাম, দীদার আলী, পৃ-১।

[২২৮] হায়াতুন নবী, কাজমী, পৃ-৩ মুলতানে প্রকাশিত।

[২২৯] মাজমু'আ রাসাইল রিযভীয়্যাহ, ১৭শ খণ্ড, পৃ-২২১; হায়াতুন নবী, কাজমী, পৃ-১২৪।

[২৩০] হায়াতুন নবী, কাজমী, পৃ-১০৪।

[২৩১] জা আল-হাক্ব, আহমদ ইয়ার বেরেলভী, পৃ-১৫।

অপর বেরেলভী ইমাম লিখেছে, "তিনদিন ধরে তার কবর থেকে ৫ ওয়াক্ত সালাতের আযান শোনা গিয়েছে।"[২৩২]

আরো বলা হয় যে, "যখন আবু বাকর (রাদিয়াল্লাহু আনহু) এর লাশ হুজরাহ মুবারকের নিকট আনা হলো তখন একটি কণ্ঠ শোনা গেল, "বন্ধুকে তাঁর বন্ধুর নিকট নিয়ে এসো।"[২৩৩]

(বেরেলভীগণের মতে) এ ক্ষমতা শুধু নবীগণের জন্যই খাস নয়, বরং দীনের বুযুর্গগণও এ মর্যাদায় পৌঁছেছেন। ফলে বলা হয়েছে, "আল্লাহর ওলীগণ মরেন না, কিন্তু এক গৃহ হতে অন্য গৃহে স্থানান্তরিত হন মাত্র। তাদের রূহ একমুহূর্তের জন্য কেবল তাদের ছেড়ে যায় এবং তারপরই পূর্বের ন্যায় তাদের দেহে ফিরে আসে।"[২৩৪]

বেরেলভীদের আহমাদ রেযা বেরেলভী এ আকীদার সত্যায়ন করে বলেছে,

"ওলীগণ তাদের মৃত্যুর পর জীবিত (হয়) এবং তাদের কর্তৃত্ব (ক্ষমতা) ও অলৌকিক কর্ম (কারামত) জারী থাকে এবং তাদের অনুগ্রহ পূর্বের মতই জারি থাকে এবং আমাদের (মত তাঁর) দাস, চাকর-বাকর, বন্ধু-বান্ধব এবং ভক্তগণের জন্য তাঁর একই রকম পূর্ণ সাহায্য-সহযোগিতা জারি থাকে।"[২৩৫]

তার এক অনুসারী লিখেছে, "আল্লাহর ওলীগণের মৃত্যুর উপমা হলো স্বপ্নের মত।"[২৩৬]

জনাব খাঁন সাহেব বেরেলভী লিখেছে, "ওলীরা (মৃত্যুর পর) তাদের কবরে অধিকতর উন্নত শ্রবণশক্তি ও দৃষ্টিশক্তি লাভ করে।"[২৩৭]

সে আরও লিখেছে, "আল্লাহর ওলীগণ জীবিত যদিও তারা মৃত্যু বরণ করে। তারা কেবল এক গৃহ হতে অন্য গৃহে স্থানান্তরিত হয় মাত্র।"[২৩৮]

---

[২৩২] হায়াতত তারিক বয়ান আত তাহকীক ওয়াত তাক্বলীদ, দীদার আলী।

[২৩৩] হায়াতুন নবী, পৃ-১২৫।

[২৩৪] ফতোয়া নাঈমিয়া, পৃ-২৪৫।

[২৩৫] ফতোয়া রিজভীয়্যাহ, ৪র্থ খণ্ড, পৃ-২৩৬।

[২৩৬] ফতোয়া নাঈমিয়া, পৃ-২৪৫; বাহারে শরীয়াত, আমজাদ আলী, পৃ-৫৮।

[২৩৭] হিকাইয়াত রিযভিয়্যাহ, পৃ-৪।

[২৩৮] আহকাম কুবুর মু'মিনীন ফী রাসাইল রিযভিয়্যাহ, পৃ-২৪৩।

আরও মজা পাওয়ার জন্য এ বানোয়াট কিচ্ছাটিও শুনুন:

“কোনো এক সুফী হতে বর্ণিত। (একদা) মক্কায় এক মুরীদ আমাকে বলল: হে আমার পীর, আমার মুরশীদ! আগামীকাল যুহরের পরে আমি মারা যাব। আমার কাছ থেকে এ আশরাফী (মুদ্রাবিশেষ) নিন। এর অর্ধেক দিয়ে আমার কাফনের এবং বাকী অর্ধেক দিয়ে দাফনের ব্যবস্থা করবেন। যখন পরের দিন হলো, যুহরের সময় মুরীদটি (কা'বার) তাওয়াফ করল এবং এর থেকে কিছু দূরে গিয়ে শুয়ে পড়ল। অতঃপর প্রানবিয়োগ ঘটল। আমি তাকে কবরে নামালাম। সে তার চোখ খুলল। আমি জিজ্ঞেস করলাম, মৃত্যুর পরবর্তী জীবন নাকি?’ সে বলল, ‘আমি জীবিত এবং আল্লাহর সকল ওলীগণই জীবিত’।”[২৩৯]

জনাব বেরেলভী একটি বই লিখেছে যার মধ্যে একটি অধ্যায় রচনা করেছে যার নাম রেখেছে, ’নবীগণ, শহীদগণ ও ওলীগণ তাদের দেহ ও কাফনসহ কবরে জীবিত’।[২৪০]

আমি জনাব বেরেলভী হতে আরেকটি বানোয়াট গল্প উপস্থাপন করছি। সে অপর এক ব্যক্তি থেকে উদ্ধৃত করেছে, “আমি শাম হতে বসরায় যেতাম। আমি একটি খালে নামলাম, ওযু করলাম। দু'রাকআত সলাত আদায় করলাম। আর এরপর একটি কবরের উপর মাথা রেখে ঘুমিয়ে পড়লাম। আমি যখন জেগে উঠলাম তখন কবরবাসীকে দেখলাম যে, সে অভিযোগ করছিল, ‘হে মশাই! সারারাত ধরে আপনি আমাকে কষ্ট দিয়েছেন’।”[২৪১]

তাদের বই-পত্র এ ধরনের মিথ্যা, বানোয়াট গালগল্প, কারামত ও কাল্পনিক কিচ্ছা-কাহিনীতে ভরপুর। দেখে মনে হয় যেন এক্ষেত্রে তারা প্রতিযোগিতায় নেমেছে কে কার চেয়ে অধিক অবিশ্বাস্য ও বানোয়াট গল্প লিখতে পারে।

একজন ওলীর সম্পর্কে বানোয়াট গল্প তৈরীর সময় বেরেলভী ফিরকার এক ইমাম লিখেছে, “তার মৃত্যুর পর তিনি আবেদন করেন যে, তার জানাযা যেন আগে ভাগে দেয়া হয়। হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তার জানাযার জন্য অপেক্ষা করছেন।”[২৪২]

---

[২৩৯] প্রাগুক্ত, পৃ-২৪৩।

[২৪০] প্রাগুক্ত, পৃ- ২৩৯।

[২৪১] প্রাগুক্ত, পৃ-২৪৭।

[২৪২] হায়াতুন নবী, কাজমী বেরেলভী, পৃ-৪৬।

তাদের মতবাদের ভিত্তিই স্থাপন করেছে এসকল ইসরাঈলী রেওয়ায়েত ও বানোয়াট কিচ্ছা-কাহিনীর উপর।

এখন এ সকল শিরকী আকীদার ব্যাখ্যা শুনুন এবং বিচার করুন কিভাবে তাদের শিরা-উপশিরায় ধীরে ধীরে শিরকের মহামারী প্রবেশ করেছে।

আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّن يَدْعُواْ مِن دُونِ ٱللَّهِ مَن لَّا يَسْتَجِيبُ لَهُۥٓ إِلَىٰ يَوْمِ ٱلْقِيَـٰمَةِ وَهُمْ عَن دُعَآئِهِمْ غَـٰفِلُونَ﴾

"তার চেয়ে অধিক পথভ্রষ্ট আর কে, যে আল্লাহর পরিবর্তে এমন কাউকে ডাকে, যে কিয়ামত দিবস পর্যন্তও তার ডাকে সাড়া দেবে না? আর তারা তাদের আহ্বান সম্পর্কে উদাসীন।" (সূরা আহকাফ ৪৬ : ৫) আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন,

﴿أَيُشْرِكُونَ مَا لَا يَخْلُقُ شَيْـًٔا وَهُمْ يُخْلَقُونَ ﴿١٩١﴾ وَلَا يَسْتَطِيعُونَ لَهُمْ نَصْرًا وَلَآ أَنفُسَهُمْ يَنصُرُونَ ﴿١٩٢﴾ وَإِن تَدْعُوهُمْ إِلَى ٱلْهُدَىٰ لَا يَتَّبِعُوكُمْ ۚ سَوَآءٌ عَلَيْكُمْ أَدَعَوْتُمُوهُمْ أَمْ أَنتُمْ صَـٰمِتُونَ ﴿١٩٣﴾ إِنَّ ٱلَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ عِبَادٌ أَمْثَالُكُمْ ۖ فَٱدْعُوهُمْ فَلْيَسْتَجِيبُواْ لَكُمْ إِن كُنتُمْ صَـٰدِقِينَ ﴿١٩٤﴾ أَلَهُمْ أَرْجُلٌ يَمْشُونَ بِهَآ ۖ أَمْ لَهُمْ أَيْدٍ يَبْطِشُونَ بِهَآ ۖ أَمْ لَهُمْ أَعْيُنٌ يُبْصِرُونَ بِهَآ ۖ أَمْ لَهُمْ ءَاذَانٌ يَسْمَعُونَ بِهَا ۗ قُلِ ٱدْعُواْ شُرَكَآءَكُمْ ثُمَّ كِيدُونِ فَلَا تُنظِرُونِ ﴿١٩٥﴾ إِنَّ وَلِـِّۧىَ ٱللَّهُ ٱلَّذِى نَزَّلَ ٱلْكِتَـٰبَ ۖ وَهُوَ يَتَوَلَّى ٱلصَّـٰلِحِينَ ﴿١٩٦﴾ وَٱلَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِهِۦ لَا يَسْتَطِيعُونَ نَصْرَكُمْ وَلَآ أَنفُسَهُمْ يَنصُرُونَ ﴿١٩٧﴾ وَإِن تَدْعُوهُمْ إِلَى ٱلْهُدَىٰ لَا يَسْمَعُواْ ۖ وَتَرَىٰهُمْ يَنظُرُونَ إِلَيْكَ وَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ ﴿١٩٨﴾﴾

"তারা কি এমন কিছুকে শরীক করে, যারা কোনো কিছু সৃষ্টি করে না, বরং তাদেরকেই সৃষ্টি করা হয়? আর তারা তাদেরকে কোনো সাহায্য করতে পারে না এবং তারা নিজদেরকেও সাহায্য করতে পারে না। আর তোমরা যদি তাদেরকে হিদায়াতের দিকে আহ্বান কর, তারা তোমাদের অনুসরণ করবে না। তোমরা তাদেরকে ডাক অথবা তোমরা চুপ থাক, তা তোমাদের নিকট

সমান। আল্লাহ ছাড়া যাদেরকে তোমরা ডাক তারা তোমাদের মত বান্দা। সুতরাং তোমরা তাদেরকে ডাক। অতঃপর তারা যেন তোমাদের ডাকে সাড়া দেয়, যদি তোমরা সত্যবাদী হও। তাদের কি পা আছে যার সাহায্যে তারা চলে? বা তাদের কি হাত আছে যা দ্বারা তারা ধরে? বা তাদের কি চক্ষু আছে যার মাধ্যমে তারা দেখে? অথবা তাদের কি কান আছে যা দ্বারা তারা শুনে? বল, 'তোমরা তোমাদের শরীকদের ডাক। তারপর আমার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র কর এবং আমাকে অবকাশ দিয়ো না'। 'নিশ্চয় আমার অভিভাবক আল্লাহ, যিনি কিতাব নাযিল করেছেন। আর তিনি নেককারদের দেখাশোনা করেন'। আর তাঁকে ছাড়া তোমরা যাদেরকে ডাক তারা তোমাদেরকে সাহায্য করতে পারে না এবং তারা নিজদেরকেও সাহায্য করতে পারে না। তুমি যদি তাদেরকে হিদায়াতের দিকে আহ্বান কর, তারা শুনবে না। আর তুমি তাদেরকে দেখবে যে, তারা তোমার দিকে তাকিয়ে আছে অথচ তারা দেখছে না।" (সূরা আল আরাফ ৭ : ১৯১-১৯৮)

মক্কার কুরাইশগণের আকীদা বিশ্বাস উল্লেখ করে আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿هُوَ ٱلَّذِى يُسَيِّرُكُمْ فِى ٱلْبَرِّ وَٱلْبَحْرِ ۖ حَتَّىٰٓ إِذَا كُنتُمْ فِى ٱلْفُلْكِ وَجَرَيْنَ بِهِم بِرِيحٍ طَيِّبَةٍ وَفَرِحُوا۟ بِهَا جَآءَتْهَا رِيحٌ عَاصِفٌ وَجَآءَهُمُ ٱلْمَوْجُ مِن كُلِّ مَكَانٍ وَظَنُّوٓا۟ أَنَّهُمْ أُحِيطَ بِهِمْ دَعَوُا۟ ٱللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ ٱلدِّينَ لَئِنْ أَنجَيْتَنَا مِنْ هَٰذِهِۦ لَنَكُونَنَّ مِنَ ٱلشَّٰكِرِينَ﴾

"তিনিই তোমাদেরকে স্থলে ও সমুদ্রে ভ্রমণ করান। এমনকি যখন তোমরা নৌকায় থাক, আর তা তাদেরকে নিয়ে চলতে থাকে অনুকূল হাওয়ায় এবং তারা তা নিয়ে আনন্দিত হয়, (এ সময়) তাকে পেয়ে বসে ঝড়ো হাওয়া, আর চারদিক থেকে ধেয়ে আসে তরঙ্গ এবং তাদের নিশ্চিত ধারণা হয় যে, তাদেরকে পরিবেষ্টন করা হয়েছে। তখন তারা আল্লাহকে ডাকতে থাকে তাঁর জন্য দীনকে একনিষ্ঠ করে, 'যদি আপনি এ থেকে আমাদেরকে নাজাত দেন, তাহলে আমরা অবশ্যই কৃতজ্ঞদের অন্তর্ভুক্ত হব"। (সূরা ইউনুস ১০ : ২২)

অর্থাৎ মক্কার মুশরিকরা জাহিলিয়্যাতের যুগে যখন নৌকা ও জাহাজে ভ্রমণ করতো এবং তাদের জাহাজ (ও নৌকা) ঝড়ের কবলে পড়ত, তারা তখন (তাদের সকল ইলাহকে বাদ দিয়ে) একমাত্র আল্লাহকেই ডাকত এবং তাদের প্রকৃত ফিতরাত বের হয়ে আসত/ প্রকাশ হয়ে পড়ত যে, আল্লাহ ছাড়া এমন কেউ নেই যার (সকল বস্তুর উপর) ক্ষমতা বা কর্তৃত্ব রয়েছে এবং সকল

কর্তৃত্ব ও নিয়ন্ত্রণ একমাত্র তাঁরই। (বিপরীতে) এসকল লোকের আকীদার অধ্যায়ে দেখুন যে, তারা পানিতে হোক বা স্থলে হোক, সর্বত্রই আল্লাহকে বাদ দিয়ে হয় 'বাহাউল হাক্ব, অথবা 'মুঈনুদ্দীন চিশতী' অথবা অন্য কোনো ওলীর নাম ধরে গয়রুল্লাহ'র কাছে দুআ করে। বেরেলভীদের ইমাম আহমাদ রেযা খাঁন সাহেব নিজেই লিখেছে, "যখনই আমার সাহায্য প্রার্থনার প্রয়োজন হয়েছে, আমি (সর্বদা) বলেছি 'হে গাওস'।"[২৪৩]

তাদের আকীদা-বিশ্বাস খণ্ডন করতে গিয়ে হানাফী মুফাসসির আল্লামা আলুসী উপরোক্ত আয়াতের ব্যাখ্যায় লিখেছেন,

"এ আয়াত হতে পরিষ্কার হয়ে যায় যে, (জাহিলিয়্যা যুগের) মুশরিকগণ বিপদের সময় কেবল আল্লাহকেই ডাকত। কিন্তু দুঃখের বিষয় হলো এসকল লোকেরা বিপদের সময়ে আল্লাহকে বাদ দিয়ে অন্যের নিকট সাহায্য কামনা করে এবং এমন ব্যক্তিদের আহ্বান করে যারা না তাদের কথা শুনতে পায়, আর না তাদের ডাকে সাড়া দিতে পারে, আর না তাদের কোনো উপকার বা ক্ষতি করতে পারে। তাদের কেউ কেউ 'খিযির' অথবা 'ইলিয়াস' কে আহ্বান করে কিংবা 'আবুল হামীস' এবং 'আব্বাস' এবং অন্যান্যদের নাম ধরে সাহায্য কামনা করে এবং তাদের কেউ কেউ তাদের ইমামগণকে আহ্বান করে। তাদের কেউই আল্লাহর নিকট তার হাত দু'খানা উত্তোলন করার তৌফিক পায় না। (সম্ভবত) তার মনের কোনো একবারও এ চিন্তা উকি দেয় না যে, যদি সে একমাত্র আল্লাহকেই ডাকত তবে এ সকল বিপদ থেকে রক্ষা পেত। হে পাঠক, আল্লাহর কসম দিয়ে আপনাকে বলছি, আমাকে বলুন তো, এ দিক থেকে মক্কার মুশরিকগণ এবং বর্তমানের মানুষদের মধ্যে কোনোটি হেদায়েতের অধিক নিকটবর্তী এবং কোনোটি মিথ্যার চোরাবালিতে আটকে পড়েছে? উভয় প্রার্থনা কারী ও আহ্বানকারীর মধ্যে কার প্রার্থনা অধিকতর সত্য? আল্লাহর নিকটই মনোবেদনা জ্ঞাপন করছি এমন এক যুগে, যে যুগে অজ্ঞতার প্রবল ঘূর্ণিঝড় সকলকে আচ্ছন্ন করেছে, বিভ্রান্তির প্রবল ঢেউ বিশাল আকৃতি নিয়ে আছড়ে পড়ছে, শরীয়াতের নৌকার রশি ছিন্ন হয়েছে, গাইরুল্লাহর নিকট সাহায্য ও ত্রাণ প্রার্থনাকেই মুক্তির ওসীলা রূপে গণ্য করা হয়েছে, জ্ঞানীদের জন্য সৎকাজে আদেশ করা অসম্ভব হয়ে পড়েছে এবং অন্যায় থেকে নিষেধ করার ক্ষেত্রে নানা প্রকার বিপদ বাধা হয়ে দাড়িয়েছে। আল্লাহ আমাদেরকে সরল পথে পরিচালিত করুন।"[২৪৪]

[২৪৩] মালফুযাত, পৃ-৩০৭।

[২৪৪] আলুসী, রুহুল মা'আনী ৭/৪৭৪

আমরা আল্লাহর নিকট প্রার্থনা করি তিনি যেন আমাদেরকে সঠিক পথে প্রতিষ্ঠিত করেন এবং শিরক ও মূর্তিপূজা হতে রক্ষা করেন। আমীন।

মিসরের বিশিষ্ট গবেষক ও মুফাস্সির আলিমে দীন সাইয়্যেদ রশীদ রেযা মিশরী এ আয়াতের তাফসীরে লিখেছেন,

"মহান আল্লাহ এ জাতীয় সকল আয়াতে কারীমাতে সুস্পষ্টভাবে বর্ণনা করে দিয়েছেন যে, (মক্কার) মুশরিকরা সকল কঠিন বিপদাপদে যখন সকল উপায়-অবলম্বন শেষ হয়ে যেতো, তখন তারা কেবল একক আল্লাহকেই ডাকত। কিন্তু আজকের দিনে অসংখ্য মুসলিম কঠিন বিপদের সময় তাদের প্রকৃত মাবুদ আল্লাহকে বাদ দিয়ে কেবল তাদের কল্পিত উপাস্যগণ যথা- মৃত ওলী যেমন বাদাওয়ী, রিফাঈ, দাসুকী, জিলানী, মাতবুলী, আবূ সারিঈ প্রমুখ অসংখ্য লোকদের নিকট ত্রাণ বা বিপদমুক্তির জন্য প্রার্থনা করার মধ্যে কোনো লজ্জা অনুভব করে না।

আযহার ও অন্যান্য অঞ্চলের সাধারণ লোকদের বিশেষভাবে, বাতিল মাবুদদের মাজার-দরগার খাদেম ও রক্ষণাবেক্ষণকারীগণের প্রপাগাণ্ডা বা প্রচারণায় দেখতে পাবে, যারা এসব স্থানের নযর-নেয়াজ থেকে উপকৃত হয়, যারা এসকল শিরকী কর্মকাণ্ডে ওতপ্রোতভাবে লেগে আছে। আর এগুলোকে তারা এর নাম পরিবর্তন করে তাওয়াস্সুল বা ওসীলা ও অন্য কিছু বলে প্রচার করে থাকে।

আমি মিশর ও সিরিয়াতে লোকদের কাছে এ রকম অনেক কাহিনী শুনেছি, যা তারা পরস্পর বলাবলি করে। প্রায়শই এ দুটি দেশের অধিবাসীদের মধ্যে মিল থাকার কারণে এটি বারবার শুনেছি। এ দেশের মুসলিমদের অধিকাংশই এ জাতীয় কুসংস্কারপূর্ণ বিশ্বাসে নিমজ্জিত, যেমন, "একদল লোক সমুদ্র যাত্রায় জাহাজে আরোহণ করল, এরপর (ঝড়ের কবলে পড়ে) তাদের নিয়ে সমুদ্র উত্তাল হয়ে উঠল। এমনকি জাহাজ ডুবতে বসল, তখন তারা নিজ নিজ ধারণা অনুযায়ী সাহায্য প্রার্থণা করতে আরম্ভ করল, 'ইয়া সাইয়্যেদ, ইয়া বাদাবী! কেউ কেউ বলল, ইয়া রিফাঈ! আবার কেউ বলল, ইয়া আব্দুল কাদির জিলানী! ... ইত্যাদি ইত্যাদি। তাদের মধ্যে একজন তাওহীদ বাদী মুসলিম ছিল, সে এসব সহ্য করতে না পেরে বলতে আরম্ভ করল, হে রব, ডুবিয়ে দিন ডুবিয়ে দিন। এদের একজনও তোমাকে চিনে না।[২৪৫]

[২৪৫] তাফসীর মানার ১১শ খণ্ড পৃ. ৩৩৮, ৩৩৯।

সুতরাং আমরা আল্লাহর নিকটই দুআ করি যেন, তিনি আমাদেরকে সোজা পথ প্রদর্শন করেন এবং মুশরিকদের শিরক থেকে রক্ষা করেন।

৪. ইলমে গায়েব (অদৃশ্যের জ্ঞান) সম্পর্কে তাদের আকীদা

আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাআতের আকীদা হলো সকল কিছুর জ্ঞান কেবল আল্লাহর জন্য খাস। কেবল আল্লাহ তা'আলাই 'আলিমুল গায়েব'। এমনকি নবীগণও কোনো বিষয় সম্পর্কে জানতেন না, যতক্ষণ আল্লাহ তাঁদেরকে ওহীর মাধ্যমে জানিয়ে না দিতেন। 'নবীগণের গায়েবের জ্ঞান আছে' এ আকীদা স্বীকার করে নেওয়া (তাঁদের প্রতি) সম্মান প্রদর্শন নয়, বরং তা মারাত্মক পথভ্রষ্টতা ও অসম্মান। এটা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর সীরাতের (জীবনীগ্রন্থ) ঘটনাবলি ও সত্যের বিপরীত এবং শুধু কুরআন সুন্নাহ বিরোধিই নয়, তা হানাফী ফিকহেরও বিপরীত।

বেরেলভীদের আকীদা হলো, যে সকল বিষয় ঘটেছে এবং ঘটবে, 'নবীগণ ও আউলিয়াদের সেসব বিষয়েরই জ্ঞান রয়েছে। কোনোকিছুই তাদের থেকে 'গায়েব' বা গোপন নয়, তাদের দৃষ্টিতে সবকিছুর জ্ঞানই রয়েছে। তাঁরা হলেন এমন সব ব্যক্তি যারা অন্তরের গোপন বিষয়ও জানেন এবং তারা সৃষ্টির (সকল) বিষয়ে অবগত। তাদের বিচার দিবসের জ্ঞান রয়েছে এবং তারা আগামী দিনের ঘটনাবলি সম্পর্কে অবগত। তারা জানেন মায়ের উদরে কী আছে। তাদের দৃষ্টি হাজির (উপস্থিত) ও 'গায়েব' (অনুপস্থিত) কে বেষ্টন করে আছে। এক কথায় দুনিয়ায় যা ঘটেছে, যা ঘটছে এবং যা ঘটবে - তার কোনো কিছুই ওলীদের থেকে গোপন নয়।

আল কুরআনের আয়াত স্পষ্টভাবে প্রমাণ করে যে, সকল গায়েবের জ্ঞান আল্লাহ তা'আলার জন্য নির্দিষ্ট। অন্য কোনো সৃষ্টির এ ব্যাপারে কোনো অংশীদারিত্ব নেই। যেমন, আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿قُل لَّا يَعۡلَمُ مَن فِي ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَٱلۡأَرۡضِ ٱلۡغَيۡبَ إِلَّا ٱللَّهُۚ وَمَا يَشۡعُرُونَ أَيَّانَ يُبۡعَثُونَ﴾

"বল, আল্লাহ ছাড়া আসমানসমূহে ও যমীনে যারা আছে তারা গায়েব জানে না। আর কখন তাদেরকে পুনরুত্থিত করা হবে তা তারা অনুভব করতে পারে না।" (সূরা নামল ২৭: ৬৫) অনুরূপ,

﴿إِنَّ ٱللَّهَ عَٰلِمُ غَيۡبِ ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَٱلۡأَرۡضِۚ إِنَّهُۥ عَلِيمُۢ بِذَاتِ ٱلصُّدُورِ﴾

"নিশ্চয় আল্লাহ আসমানসমূহ ও যমীনের গায়েবী বিষয়ের জ্ঞানী, অন্তরসমূহে যা রয়েছে সে বিষয়েও তিনি সবিশেষ অবগত।" (সূরা ফাতির ৩৫: ৩৮)। মহান আল্লাহ আরও বলেন,

﴿إِنَّ ٱللَّهَ يَعۡلَمُ غَيۡبَ ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَٱلۡأَرۡضِۚ وَٱللَّهُ بَصِيرُۢ بِمَا تَعۡمَلُونَ﴾

"নিশ্চয় আল্লাহ আসমানসমূহ ও যমীনের গায়েব সম্পর্কে অবগত আছেন। আর তোমরা যা কর আল্লাহ তার সম্যক দ্রষ্টা।" (সূরা হুজুরাত ৪৯: ১৮)

﴿وَلِلَّهِ غَيۡبُ ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَٱلۡأَرۡضِ وَإِلَيۡهِ يُرۡجَعُ ٱلۡأَمۡرُ كُلُّهُۥ فَٱعۡبُدۡهُ وَتَوَكَّلۡ عَلَيۡهِۚ وَمَا رَبُّكَ بِغَٰفِلٍ عَمَّا تَعۡمَلُونَ﴾

"আসমানসমূহ ও যমীনের গায়েব আল্লাহরই এবং তাঁরই কাছে সব বিষয় প্রত্যাবর্তিত হবে। সুতরাং তুমি তাঁর ইবাদাত কর এবং তাঁর উপর তাওয়াক্কুল কর। আর তোমরা যা কিছু কর সে ব্যাপারে তোমার রব গাফেল নন।" (সূরা হুদ ১১:১২৩) অনুরূপ -

﴿وَيَقُولُونَ لَوۡلَآ أُنزِلَ عَلَيۡهِ ءَايَةٞ مِّن رَّبِّهِۦۖ فَقُلۡ إِنَّمَا ٱلۡغَيۡبُ لِلَّهِ فَٱنتَظِرُوٓاْ إِنِّي مَعَكُم مِّنَ ٱلۡمُنتَظِرِينَ﴾

"আর তারা বলে, 'তাঁর রবের পক্ষ থেকে তার উপর কোনো নিদর্শন কেন নাযিল করা হয় না'? বল, 'গায়েবের জ্ঞান তো কেবল আল্লাহরই। অতএব তোমরা অপেক্ষা কর, আমিও তোমাদের সাথে অপেক্ষায় রয়েছি"। (সূরা ইউনুস ১০:২০)। মহান আল্লাহ আরো বলেন,

﴿وَعِندَهُۥ مَفَاتِحُ ٱلۡغَيۡبِ لَا يَعۡلَمُهَآ إِلَّا هُوَۚ وَيَعۡلَمُ مَا فِي ٱلۡبَرِّ وَٱلۡبَحۡرِۚ وَمَا تَسۡقُطُ مِن وَرَقَةٍ إِلَّا يَعۡلَمُهَا وَلَا حَبَّةٖ فِي ظُلُمَٰتِ ٱلۡأَرۡضِ وَلَا رَطۡبٖ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي كِتَٰبٖ مُّبِينٖ﴾

"আর তাঁর কাছে রয়েছে গায়েবের চাবিসমূহ, তিনি ছাড়া এ বিষয়ে কেউ জানে না এবং তিনি অবগত রয়েছেন স্থলে ও সমুদ্রে যা কিছু আছে। আর

কোনো পাতা ঝরে না, কিন্তু তিনি তা জানেন এবং যমীনের অন্ধকারে কোনো দানা পড়ে না, না কোনো ভেজা এবং না কোনো শুষ্ক কিছু; কিন্তু রয়েছে সুস্পষ্ট কিতাবে।” (সূরা আনআম ৬:৫৯)। আরো শুনুন,

﴿إِنَّ ٱللَّهَ عِندَهُۥ عِلۡمُ ٱلسَّاعَةِ وَيُنَزِّلُ ٱلۡغَيۡثَ وَيَعۡلَمُ مَا فِي ٱلۡأَرۡحَامِۖ وَمَا تَدۡرِي نَفۡسٞ مَّاذَا تَكۡسِبُ غَدٗاۖ وَمَا تَدۡرِي نَفۡسُۢ بِأَيِّ أَرۡضٖ تَمُوتُۚ إِنَّ ٱللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرُۢ﴾

“নিশ্চয় আল্লাহর নিকট কিয়ামতের জ্ঞান রয়েছে। আর তিনি বৃষ্টি বর্ষণ করেন এবং জরায়ূতে যা আছে, তা তিনি জানেন। আর কেউ জানে না আগামীকাল সে কী অর্জন করবে এবং কেউ জানে না কোনো স্থানে সে মারা যাবে। নিশ্চয় আল্লাহ সর্বজ্ঞ, সম্যক অবহিত।” (সূরা লুকমান ৩১:৩৪)

মহান আল্লাহ তাঁর প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কে তার নিজের জন্য গায়েবের জ্ঞানকে অস্বীকার করার নির্দেশ দিচ্ছেন,

﴿قُل لَّآ أَمۡلِكُ لِنَفۡسِي نَفۡعٗا وَلَا ضَرًّا إِلَّا مَا شَآءَ ٱللَّهُۚ وَلَوۡ كُنتُ أَعۡلَمُ ٱلۡغَيۡبَ لَٱسۡتَكۡثَرۡتُ مِنَ ٱلۡخَيۡرِ وَمَا مَسَّنِيَ ٱلسُّوٓءُۚ إِنۡ أَنَا۠ إِلَّا نَذِيرٞ وَبَشِيرٞ لِّقَوۡمٖ يُؤۡمِنُونَ﴾

“বল, ‘আমি আমার নিজের কোনো উপকার ও ক্ষতির ক্ষমতা রাখি না, তবে আল্লাহ যা চান। আর আমি যদি গায়েব জানতাম তাহলে অধিক কল্যাণ লাভ করতাম এবং আমাকে কোনো ক্ষতি স্পর্শ করতো না। আমিতো একজন সতর্ককারী ও সুসংবাদদাতা এমন কওমের জন্য, যারা বিশ্বাস করে’। “(সূরা আল আরাফ ৭ : ১৮৮)

বিপরীতে বেরেলভীগণ কুরআন ও সুন্নাহর সম্পূর্ণ বিরোধী আকীদা পোষণ করে যে, ‘নবী আলাইহিমুস সালামগণ (সৃষ্টির) প্রথম দিন থেকে শেষ দিন পর্যন্ত সবকিছু জানেন, বরং তারা (সবকিছু) দেখেন ও পর্যবেক্ষণ করেন।’[২৪৬]

[২৪৬] দাওলাতুল মাক্কাহ পৃ-৫৭, লাহোর, পাকিস্তান।

আরও বলা হয়েছে, "জন্মের সময় থেকেই নবীগণ হলেন আরিফ বিল্লাহ এবং তারা ইলমে গায়েবের অধিকারী।"[২৪৭]

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সম্পর্কে বেরেলভী ইমাম আহমাদ রেযা লিখেছে, "রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম পূর্ণাঙ্গভাবে সকল (কিছুর) জ্ঞান লাভ করেছেন এবং এ জ্ঞানকে বেষ্টন করে আছেন।"[২৪৮]

অন্যত্র লিখেছে, "লাওহ, কলমের জ্ঞান, যা সকল জ্ঞানকে ধারণ করে আছে, তা হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর জ্ঞানের একটি অংশ মাত্র।"[২৪৯] সে লিখেছে,

"শৃংখলা, কর্ম এবং আছার (চিহ্ন বা প্রভাব)- সংক্ষেপে সকল কিছুর হাকাইক ও দাক্বাইক্ব (প্রকৃত মর্ম ও সুক্ষ্ম বিষয়), 'যাতে ইলাহীর (আল্লাহর সত্তা) -এর জ্ঞান রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর রয়েছে। লাওহ, ক্বলম এর জ্ঞান ও হুজুরের জ্ঞানভাণ্ডারের তুলনা যেমন সমুদ্রের তুলনায় একটি নদী এবং তা হুজুরের বরকতে (কল্যানে) পাওয়া। হুজুরের দৃষ্টি সারা জাহানকে পরিবেষ্টন করে আছেন।"[২৫০]

(অনুরূপ) "শৃংখলা, কর্ম এবং আছার (নিদর্শন/ চিহ্ন) -এক কথায় হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর আল্লাহর হাকীকি আজমত (প্রকৃত বড়ত্ব/মহত্ত্ব) ও তাঁর হক গুণাবলি থেকে (প্রাপ্ত) সকল কিছুর জ্ঞান রয়েছে। তিনি শুরু হতে শেষ, প্রকাশ্য ও গোপন সকল জ্ঞানকে পরিবেষ্টন করে আছেন।"[২৫১]

বেরেলভীদের এক ভক্ত লিখেছে, "রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে বিশ্বের কোনো কিছুই গোপন রাখা হয়নি। এই পবিত্র রূহ আসমানের উপর হতে নীচ পর্যন্ত সকল কিছু এবং দুনিয়া, আখিরাত, জান্নাত, জাহান্নাম- সবকিছু সম্পর্কে অবগত। কারণ এ সবকিছু এ কামেল ব্যক্তি (নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর জন্য সৃষ্টি করা হয়েছে।"[২৫২]

---

[২৪৭] মুওয়াইজ নাঈমিয়া, ইকতিদার বিন আহমদ ইয়ার, পৃ-১৯২।

[২৪৮] দাওলাতুল মাক্কাহ পৃ- ২৩০।

[২৪৯] খালিস আল-ইতিকাদ, বেরেলভী, পৃ-৩৮।

[২৫০] প্রাগুক্ত, পৃ-৩৮।

[২৫১] দাওলাতুল মাক্কাহ পৃ-২১০।

[২৫২] দাওলাতুল মাক্কাহ নাঈমুদ্দীন মুরাদাবাদী, পৃ-১৪

সে আরও লিখেছে, "হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর জ্ঞান সকল বাতেনী ও ইলহামী জ্ঞানকে পরিবেষ্টন করে রয়েছে।"[২৫৩]

অপর বেরেলভী বলেছে, "রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আল্লাহকে ভাল জানেন এবং তিনি অস্তিত্ববান সকল সৃষ্টির অবস্থাসমূহ পরিপূর্ণভাবে এবং নির্ভুলভাবে জানেন। অতীত, বর্তমান বা ভবিষ্যতের কোনো কিছুই তাঁর নিকট গোপনীয় নয়।"[২৫৪]

আরেক বেরেলভী একেও ছাড়িয়ে গিয়ে লিখেছে, "আল্লাহ হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কে এমন সব বাতিনী (গুপ্ত) জ্ঞান দান করেছেন যে, তিনি একটি পাথরের অন্তরের কথাও জানতেন। তবে তিনি তাঁর আশেক (প্রেমিক) লোকদের অন্তরের অবস্থা কেন জানবেন না?"[২৫৫]

আরো বলা হয়েছে, "যে পশুর উপর সরকার (রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) পা রেখেছেন, তার চোখের পর্দা উঠে গেছে। সুতরাং সে সকল অন্তর যাদের উপর হুজুরের হাত রয়েছে, তাদের নিকট সকল গায়েবী, বাতিনী এবং জাহিরী ইলম কেন প্রকাশিত হবে না?"[২৫৬]

বেরেলভীদের ইমাম রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর সাহাবীগণের উপর মিথ্যারোপ করে বলেছে, "সাহাবীগণ নিঃসন্দেহে ফতোয়া দিতেন যে, আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম 'ইলমে গায়েবের' অধিকারী ছিলেন।"[২৫৭]

কুরআনের আয়াতসমূহের সম্পূর্ণ বিপরীতে বেরেলভীদের এ আকীদা রয়েছে যে, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর পাঁচটি গায়েবী বিষয়ের জ্ঞান রয়েছে যা এ আয়াত অনুসারে কেবল আল্লাহর জন্য খাস।

যেমন, আল্লাহ তা'আলা বলেন,

---

[২৫৩] প্রাগুক্ত, পৃ-৫২।

[২৫৪] তাসকীন আল খাওয়াতির ফী মাসআলাতিল হাজির ওয়া নাযির, আহমদ সাঈদ কাজমী, পৃ- ৬৫।

[২৫৫] মুওয়ায়িজ নাঈমিয়্যাহ, ইকতিদার বিন আহমদ ইয়ার, পৃ-১৯২।

[২৫৬] প্রাগুক্ত, পৃ-৩৬৪-৩৬৫।

[২৫৭] খালিসুল ইতিকাদ, বেরেলভী, পৃ-২৮।

﴿إِنَّ ٱللَّهَ عِندَهُۥ عِلۡمُ ٱلسَّاعَةِ وَيُنَزِّلُ ٱلۡغَيۡثَ وَيَعۡلَمُ مَا فِي ٱلۡأَرۡحَامِۖ وَمَا تَدۡرِي نَفۡسٞ مَّاذَا تَكۡسِبُ غَدٗاۖ وَمَا تَدۡرِي نَفۡسُۢ بِأَيِّ أَرۡضٖ تَمُوتُۚ إِنَّ ٱللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرُۢ﴾

"নিশ্চয় আল্লাহর নিকট কিয়ামতের জ্ঞান রয়েছে। আর তিনি বৃষ্টি বর্ষণ করেন এবং জরায়ূতে যা আছে, তা তিনি জানেন। আর কেউ জানে না আগামীকাল সে কী অর্জন করবে এবং কেউ জানে না কোনো স্থানে সে মারা যাবে। নিশ্চয় আল্লাহ সর্বজ্ঞ, সম্যক অবহিত।" (সূরা লুকমান ৩১ : ৩৪)

আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন,

﴿ٱللَّهُ يَعۡلَمُ مَا تَحۡمِلُ كُلُّ أُنثَىٰ وَمَا تَغِيضُ ٱلۡأَرۡحَامُ وَمَا تَزۡدَادُۚ وَكُلُّ شَيۡءٍ عِندَهُۥ بِمِقۡدَارٍ ۝٨ عَٰلِمُ ٱلۡغَيۡبِ وَٱلشَّهَٰدَةِ ٱلۡكَبِيرُ ٱلۡمُتَعَالِ﴾

আল্লাহ জানেন যা প্রতিটি নারী গর্ভে ধারণ করে এবং গর্ভাশয়ে যা কমে ও বাড়ে। আর তাঁর নিকট প্রতিটি বস্তু নির্দিষ্ট পরিমাণে রয়েছে। তিনি গায়েব ও প্রকাশ্যের জ্ঞানী, মহান, সর্বোচ্চ। (সূরা রাদ ১৩ : ৮- ৯)

আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন,

﴿إِنَّ ٱلسَّاعَةَ ءَاتِيَةٌ أَكَادُ أُخۡفِيهَا لِتُجۡزَىٰ كُلُّ نَفۡسِۭ بِمَا تَسۡعَىٰ﴾

""নিশ্চয় কিয়ামত আসবে; আমি তা গোপন রাখতে চাই যাতে প্রত্যেককে স্বীয় চেষ্টা-সাধনা অনুযায়ী প্রতিদান দেয়া যায়।" (সূরা ত্ব-হা ২০: ১৫)

আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন,

﴿يَسۡـَٔلُونَكَ عَنِ ٱلسَّاعَةِ أَيَّانَ مُرۡسَىٰهَاۖ قُلۡ إِنَّمَا عِلۡمُهَا عِندَ رَبِّيۖ لَا يُجَلِّيهَا لِوَقۡتِهَآ إِلَّا هُوَۚ ثَقُلَتۡ فِي ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَٱلۡأَرۡضِۚ لَا تَأۡتِيكُمۡ إِلَّا بَغۡتَةٗۗ يَسۡـَٔلُونَكَ كَأَنَّكَ حَفِيٌّ عَنۡهَاۖ قُلۡ إِنَّمَا عِلۡمُهَا عِندَ ٱللَّهِ وَلَٰكِنَّ أَكۡثَرَ ٱلنَّاسِ لَا يَعۡلَمُونَ﴾

"তারা তোমাকে কিয়ামত সম্পর্কে প্রশ্ন করে, 'তা কখন ঘটবে'? তুমি বল, 'এর জ্ঞান তো রয়েছে আমার রবের নিকট। তিনিই এর নির্ধারিত সময়ে

তা প্রকাশ করবেন। আসমানসমূহ ও যমীনের উপর তা (কিয়ামত) কঠিন হবে। তা তোমাদের নিকট হঠাৎ এসে পড়বে। তারা তোমাকে প্রশ্ন করছে যেন তুমি এ সম্পর্কে বিশেষভাবে অবহিত। বল, 'এ বিষয়ের জ্ঞান কেবল আল্লাহর নিকট আছে। কিন্তু অধিকাংশ মানুষ জানে না'।" (সূরা আ'রাফ ৭: ১৮৭)। আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন,

﴿يَسۡـَٔلُكَ ٱلنَّاسُ عَنِ ٱلسَّاعَةِۖ قُلۡ إِنَّمَا عِلۡمُهَا عِندَ ٱللَّهِۚ وَمَا يُدۡرِيكَ لَعَلَّ ٱلسَّاعَةَ تَكُونُ قَرِيبًا﴾

"লোকেরা তোমাকে কিয়ামত সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করে, বল, 'এ বিষয়ের জ্ঞান কেবল আল্লাহর নিকটই আছে, আর তোমার কি জানা আছে, কিয়ামত হয়ত খুব নিকটে!" (সূরা আল আহযাব ৩৩: ৬৩)

আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন,

﴿هُوَ ٱلَّذِي خَلَقَكُم مِّن طِينٖ ثُمَّ قَضَىٰٓ أَجَلٗاۖ وَأَجَلٞ مُّسَمًّى عِندَهُۥۖ ثُمَّ أَنتُمۡ تَمۡتَرُونَ﴾

"তিনিই তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছেন কাদা মাটি থেকে তারপর নির্ধারণ করেছেন একটি কাল, আর তাঁর কাছে আছে একটি নির্দিষ্ট কাল, তারপর তোমরা সন্দেহ কর।" (সূরা আল আনআম ৬: ২)

আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন,

﴿وَتَبَارَكَ ٱلَّذِي لَهُۥ مُلۡكُ ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَٱلۡأَرۡضِ وَمَا بَيۡنَهُمَا وَعِندَهُۥ عِلۡمُ ٱلسَّاعَةِ وَإِلَيۡهِ تُرۡجَعُونَ﴾

"আর তিনি বরকতময়, যার কর্তৃত্বে রয়েছে আসমানসমূহ, যমীন ও এ দু'য়ের মধ্যবর্তী সবকিছু; আর কিয়ামতের জ্ঞান কেবল তাঁরই আছে এবং তাঁরই নিকট তোমাদেরকে ফিরিয়ে নেয়া হবে।" (সূরা আয যুখরুফ ৪৩: ৮৫)

আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন,

﴿وَعِندَهُۥ مَفَاتِحُ ٱلۡغَيۡبِ لَا يَعۡلَمُهَآ إِلَّا هُوَۚ وَيَعۡلَمُ مَا فِي ٱلۡبَرِّ وَٱلۡبَحۡرِۚ وَمَا تَسۡقُطُ مِن وَرَقَةٍ إِلَّا يَعۡلَمُهَا وَلَا حَبَّةٖ فِي ظُلُمَٰتِ ٱلۡأَرۡضِ وَلَا رَطۡبٖ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي كِتَٰبٖ مُّبِينٖ ﴾

"আর তাঁর কাছে রয়েছে গায়েবের চাবিসমূহ, তিনি ছাড়া এ বিষয়ে কেউ জানে না এবং তিনি অবগত রয়েছেন স্থলে ও সমুদ্রে যা কিছু আছে। আর কোনো পাতা ঝরে না, কিন্তু তিনি তা জানেন এবং যমীনের অন্ধকারে কোনো দানা পড়ে না, না কোনো ভেজা এবং না কোনো শুষ্ক কিছু; কিন্তু রয়েছে সুস্পষ্ট কিতাবে।" (সূরা আল আনআম ৬: ৫৯)

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামও হাদীসে এ বিষয়টি পরিষ্কার করেছেন যে, এসব গায়েবী বিষয়সমূহ আল্লাহর জন্য নির্দিষ্ট। সুতরাং জীবরীঈলের প্রসিদ্ধ হাদীস এ ব্যাপারে একটি বড় প্রমাণ।

قال يا رسول الله متى الساعة ؟ قال ما المسؤول عنها بأعلم من السائل ولكن سأحدثك عن أشرا طها إذا ولدت الأمة ربها فذاك من أشراطها وإذا كانت العراة الحفاة رؤوس الناس فذاك من أشراطها وإذا تطاول رعاة الإبل في البنيان فذاك من أشراطها في خمس لا يعلمهن إلا الله ثم تلا صلى الله عليه و سلم -

﴿إِنَّ ٱللَّهَ عِندَهُۥ عِلۡمُ ٱلسَّاعَةِ وَيُنَزِّلُ ٱلۡغَيۡثَ وَيَعۡلَمُ مَا فِي ٱلۡأَرۡحَامِۖ وَمَا تَدۡرِي نَفۡسٞ مَّاذَا تَكۡسِبُ غَدٗاۖ وَمَا تَدۡرِي نَفۡسُۢ بِأَيِّ أَرۡضٖ تَمُوتُۚ إِنَّ ٱللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرُۢ ﴾

"যখন তিনি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে কিয়ামত সম্পর্কে প্রশ্ন করলে জবাবে তিনি বলেন, "এ ব্যাপারে যাকে জিজ্ঞেস করা হচ্ছে, তিনি জিজ্ঞেসকারী অপেক্ষা অধিক জ্ঞাত নন। তবে আমি আপনাকে কিয়ামতের আলামতসমূহ বলে বলে দিচ্ছি। (কিয়ামতের জ্ঞান) সেই পাঁচটি বিষয়ের অন্তর্গত যা আল্লাহ ব্যতীত তা আর কেউ জানে না। অতঃপর তিনি তেলাওয়াত করলেন,

﴿إِنَّ ٱللَّهَ عِندَهُۥ عِلۡمُ ٱلسَّاعَةِ وَيُنَزِّلُ ٱلۡغَيۡثَ وَيَعۡلَمُ مَا فِى ٱلۡأَرۡحَامِۖ وَمَا تَدۡرِى نَفۡسٌ مَّاذَا تَكۡسِبُ غَدًاۖ وَمَا تَدۡرِى نَفۡسُۢ بِأَىِّ أَرۡضٍ تَمُوتُۚ إِنَّ ٱللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرُۢ﴾

"নিশ্চয় আল্লাহর নিকট কিয়ামতের জ্ঞান রয়েছে। আর তিনি বৃষ্টি বর্ষণ করেন এবং জরায়ূতে যা আছে, তা তিনি জানেন। আর কেউ জানে না আগামীকাল সে কী অর্জন করবে এবং কেউ জানে না কোনো স্থানে সে মারা যাবে। নিশ্চয় আল্লাহ সর্বজ্ঞ, সম্যক অবহিত।" (সূরা লুকমান ৩১ : ৩৪) (বুখারী আস সহীহ, হা/৫০, হা/১-৯)

২. ইবনে উমার (রাদিয়াল্লাহু আনহুমা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন,

مَفَاتِيحُ الْغَيْبِ خَمْسٌ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا اللهُ لَا يَعْلَمُ مَا تَغِيضُ الْأَرْحَامُ إِلَّا اللهُ وَلَا يَعْلَمُ مَا فِي غَدٍ إِلَّا اللهُ وَلَا يَعْلَمُ مَتَى يَأْتِي الْمَطَرُ أَحَدٌ إِلَّا اللهُ وَلَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ إِلَّا اللهُ وَلَا يَعْلَمُ مَتَى تَقُومُ السَّاعَةُ إِلَّا اللهُ-

"গায়েবের পাঁচটি চাবি রয়েছে, আল্লাহ ছাড়া তা কেউ জানে না। মাতৃগর্ভে কী আছে, তা আল্লাহ ছাড়া কেউ জানে না, আগামীকাল কী ঘটবে, তা আল্লাহ ছাড়া কেউ জানে না , বৃষ্টি কখন হবে, তা আল্লাহ ছাড়া কেউ জানে না, সে কোথায় মৃত্যুবরণ করবে, তা আল্লাহ ছাড়া কেউ জানে না এবং কিয়ামত কখন সংঘটিত হবে, তা আল্লাহ ছাড়া কেউ জানে না। (বুখারী আস সহীহ, হা/১০৩৯, ৪৬২৭,৪৬৯৭,৪৭৭৮,৭৩৭৯)।

৩. জাবির ইবনে আব্দুল্লাহ (রাদিয়াল্লাহু আনহু) বর্ণনা করেছেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর মৃত্যুর একমাস আগে বলেছেন,

تَسْأَلُونِي عَنِ السَّاعَةِ وَإِنَّمَا عِلْمُهَا عِنْدَ اللَّهِ

"তোমরা আমাকে কিয়ামত সম্পর্কে জিজ্ঞেস করেছিলে। (শুনে রাখ) আল্লাহ ছাড়া তা কেউ জানে না।" (সহীহ মুসলিম, হা/২৫৩৮)।

৪. বুরাইদা (রাদিয়াল্লাহু আনহু) বর্ণনা করেছেন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন,

خمس لا يعلمهن الا الله تعالى { إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت إن الله عليم خبير.

"পাঁচটি বিষয় রয়েছে এবং এগুলোর জ্ঞান আল্লাহ ব্যতীত আর কারো নেই। কিয়ামতের সময়, বৃষ্টি বর্ষণ, মাতৃজঠরে কী আছে, ভবিষ্যতের ঘটনাবলি এবং কারো মৃত্যুর স্থান।" (মুসনাদে আহমাদ, ৩৫৩/৫, হা/২৩০৩৬ ; ইবনু হাজার, ফাতহুল বারী; ইবনু কাসীর, তাফসীর ইবনু কাসীর, [সূরা আন'আম ৬ নং এর তাফসীর এবং সূরা লুকমান ৩১:৩৪ নং আয়াতের তাফসীর]

আর কুরআনের এ সকল আয়াত ও অনুরূপ অর্থের হাদীস হাদীসের বহু কিতাবে রয়েছে; কিন্তু বেরেলভীগণ সেগুলোকে তাদের পশ্চাতে নিক্ষেপ করেছে এবং এমন আকীদা পোষণ করে যা সেগুলোর সম্পূর্ণ বিপরীত।

আহমাদ রেযা বেরেলভী বলে: "আল্লাহ তাঁকে এ পাঁচটি গায়েবী বিষয়ের জ্ঞান না দেয়া পর্যন্ত রাসূল রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এ দুনিয়া ছেড়ে যাননি।"[২৫৮]

বলা হয়েছে যে, "হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর পাঁচটি গায়েবী বিষয়ের সকল জ্ঞান ছিল এবং তাঁকে সেগুলো গোপন রাখতে বলা হয়েছিল।[২৫৯]

শুনুন অপর বেরেলভী কী বলছে, "হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর অতীত ও ভবিষ্যতের সকল ঘটনার জ্ঞান ছিল যা লাওহে মাহফুজে সংরক্ষিত আছে, বরং তাঁর জ্ঞান এর চেয়েও বেশি ছিল। তিনি কিয়ামত দিবস সংঘটিত হওয়ার সময়ের জ্ঞান লাভ করেছিলেন।"[২৬০]

অন্যত্র সে লিখেছে, "হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর সৃষ্টির পূর্ববর্তী বিষয়ের জ্ঞান ছিল। আল্লাহ কর্তৃক সৃষ্টি হওয়ার পুর্বেই সৃষ্টিকুলের

---

[২৫৮] খালিসুল ইতিকাদ, বেরেলভী, পৃ-৫৩।

[২৫৯] প্রাগুক্ত, পৃ-৫৪

[২৬০] জা আল-হাক্ব, পৃ-৪৩।

ঘটনাবলি সম্পর্কে তিনি জানতেন এবং তাদের পরবর্তী অবস্থাসমূহও। তিনি কিয়ামতের নিদর্শনসমূহ জানতেন। তিনি জানতেন সৃষ্টিকুলের ভীতি (ও শংকা) এবং আল্লাহর ক্রোধ ও অনুরূপ (বিষয়াবলি)। হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম লোকদের অবস্থা পর্যবেক্ষণ করছেন এবং তিনি তাদের অবস্থা সম্পর্কে জানেন। তিনি তাদের পরিস্থিতি, তাদের আচার-আচরণ, তাদের ঘটনাবলি এবং তাদের অতীত অবস্থার বিবরণী সম্পর্কে অবগত। তিনি জানতেন বিচার দিবসের নিদর্শনাবলি, কে জান্নাতী এবং কে জাহান্নামী, লোকেদের অবস্থা বলি এবং এ লোকেরা হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর জ্ঞানের কোনো কিছুই জানে না, কেবল তিনি যেটুকু ইচ্ছা করেন তা ব্যতীত। নবীগণের জ্ঞানের তুলনায় আল্লাহর ওলীদের জ্ঞান সাত সমুদ্রের তুলনায় যেমন একটা ফোঁটা, নবীগণের জ্ঞান হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর জ্ঞানের তুলনায় অনুরূপ।"[২৬১] আরো শুনুন!

"হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর জীবিত অবস্থা ও মৃত অবস্থার মধ্যে কোনো পার্থক্য নেই। তিনি তাঁর উম্মাতকে দেখেন এবং তাদের অবস্থা, তাদের নিয়াত, ইচ্ছা, পরিকল্পনাসমূহ এবং তাদের অন্তরের কথাও জানেন।"[২৬২]

অপর এক বেরেলভী লিখেছে, "হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মদীনা মুনাওয়ারায় অবস্থান করছেন এবং পুংখানুপুঙ্খ ভাবে প্রতি মুহূর্তের ঘটনাবলি প্রত্যক্ষ করছেন।"[২৬৩]

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর উপর মিথ্যারোপ করে বেরেলভী লিখেছে, "আমার মৃত্যুর পর আমার জ্ঞান তেমনই আছে, যেমন ছিল আমার জীবিতাবস্থায়।"[২৬৪]

এখানেই তারা থেমে থাকে নি। জনাব বেরেলভী সাহেব গায়েবী পঞ্চকুঞ্জি সম্পর্কে বলেছে, "হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম শুধু সেগুলো জানতেনই না, বরং তিনি সেগুলো যাকে ইচ্ছা বন্টন করতে পারেন।"[২৬৫]

---

[২৬১] প্রাগুক্ত, পৃ-৫০-৫১।

[২৬২] খালিসুল ইতিকাদ, বেরেলভী, পৃ-৩৯; জা আল-হাক্ক, পৃ-১৫১।

[২৬৩] মুওয়ায়েজ নাঈমিয়া, আহমদ ইয়ার, পৃ-৩২৬

[২৬৪] খালিসুল ইতিকাদ, বেরেলভী, পৃ-১৪

[২৬৫] প্রাগুক্ত, পৃ-১৪।

আরেক বেরেলভী বলছে, “কুরআনের আয়াত ‘এবং তিনি সর্ব বিষয়ে জ্ঞানী’-এর উদ্দেশ্য হলো যে, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম -এর সকল বিষয়ে জ্ঞান ছিল।”[২৬৬]

জ্ঞান ও শ্রেষ্ঠত্বের এসকল দাবিদাররা কুরআনের অর্থ বিকৃত করতে গিয়েও আল্লাহকে বিন্দুমাত্র ভয় করে না। কুরআনকে পরিবর্তন করে কিন্তু তবুও তারা নিজেদেরকে পরিবর্তন করে না!

পঞ্চকুঞ্জির জ্ঞান শুধু রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম -এর জন্যই খাস নয়, বরং তার উম্মাতের অনেকেই (ওলীগণ) এ গুণাবলিতে তাঁর শরীক রয়েছেন। যেমন বেরেলভীদের ইমাম আহমাদ রেযা খান বেরেলভী লিখেছে,

“কিয়ামত কখন আসবে, কখন এবং কতটুকু বৃষ্টি হবে, মাতৃজঠরে কী আছে, আগামীকাল কী ঘটবে এবং কোথায় সে ব্যক্তি মৃত্যুবরণ করবে - এ পাঁচটি বিষয়ে যা আয়াতে কারীমাতে উল্লেখ করা হয়েছে, তার কোনোটিই হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম -এর নিকট থেকে গোপন ছিল না। এ সকল বিষয়গুলো কিভাবে হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে গোপন থাকতে পারে, যখন ৭ জন কুতুবের সকলেরই এ জ্ঞান রয়েছে এবং তারা গাওসের চেয়ে নিম্ন পদমর্যাদার? (তাহলে) গাওস সম্পর্কে কী বলা যেতে পারে এবং সে ব্যক্তি সম্পর্কে কী বলা যেতে পারে যিনি পূর্বে এবং পরবর্তীতে আগত সকলের মালিক এবং সকল জগৎসমূহের মালিক এবং যিনি সকল বস্তুর কারণ এবং সমস্ত বিষয় তাঁর জন্যই (অর্থাৎ হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)?”[২৬৭]

আবারও মনোযোগ দিয়ে শুনুন এবং চিন্তা-ভাবনা করুন কিভাবে শয়তান তাদেরকে কুরআনের আয়াত (যা শিক্ষা দিয়েছে) এর পরিবর্তে (দর্শণ) কাশফ ও ইলমের দ্বারা তাদেরকে প্রতারিত করেছে।

তারা শয়তানের অনুসরণ-আনুগত্য করাকে ‘দীন’ নাম দিয়েছে এবং তারা নিজেরাই পথভ্রষ্টতার চোরাবালিতে আটকে পড়েছে এবং (এভাবে) অনেক সাধারণ লোকদের পথভ্রষ্টতার ওসীলা (মাধ্যম) হয়েছে। বলা হয় যে, “যেখানে রাসূলের উম্মতের মধ্য হতে কোনো (তাসাররুফের ক্ষমতা সম্পন্ন) প্রভাবশালী ব্যক্তিবর্গের[২৬৮] কেউ প্রভাব বিস্তার (তাসাররুফ) করতে পারে না,

---

[২৬৬] তাসকীন আল খাওয়াতির, কাজমী বেরেলভী, পৃ-৫২-৫৩।

[২৬৭] খালিসুল ইতিকাদ, পৃ-৫৩-৫৪।

[২৬৮] এমন ব্যক্তি যিনি কবর হতে জীবিতদের বিষয়াবলি প্রভাবিত (তাসাররুফ) করতে পারে- বলে ধারণা করা হচ্ছে।

যদি তার এ পঞ্চকুঞ্জির জ্ঞান না থাকে, তাহলে পঞ্চকুঞ্জির জ্ঞান রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম -এর কেন থাকবে না? তাই হে অস্বীকারকারী! এ কথা শুনে রাখ এবং আল্লাহর ওলীদের (সম্পর্কে) মিথ্যা ধারণা করো না!”[২৬৯]

এগুলো বিশ্লেষণ করুন! হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম পঞ্চকুঞ্জির বিষয়সমূহ জানেন’ -তাদের এ আকীদার প্রমাণ কুরআনের আয়াত বা হাদীসে নববী নয়, বরং এর প্রমাণ ও যুক্তি হলো, ‘আউলিয়াগণের যেহেতু গায়েবের জ্ঞান রয়েছে, অতএব হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম -এর তো (আরো অধিক হারে) গায়েবের বিষয়াবলির জ্ঞান রয়েছে!!! সুতরাং এ হলো তাদের যৌক্তিক প্রমাণ যার উপর তাদের আকীদার ভিত্তি স্থাপিত!!

﴿وَإِنَّ أَوۡهَنَ ٱلۡبُيُوتِ لَبَيۡتُ ٱلۡعَنكَبُوتِۚ﴾

(”নিশ্চয়ই মাকড়সার ঘর সবচেয়ে ভঙ্গুর।” সূরা: আনকাবুত ২৯: ৪১)

আরো একটি প্রমাণ শুনুন! “এমন দলকে আমরা দেখেছি যারা জানতে পেরেছে কোথায় তারা (বা অন্য কেউ) মৃত্যুবরণ করবে এবং গর্ভাবস্থায় কিংবা এর পূর্বে তারা জানতে পেরেছে গর্ভে কী আছে, ছেলে না মেয়ে। বল, এখনও কি তুমি এ আয়াতের অর্থ বোঝনি কিংবা এখনও কি তুমি সন্দেহের মধ্যে রয়েছ?”[২৭০]

অর্থাৎ যদিও এ আয়াতে স্পষ্টভাবে পরিষ্কার করা হয়েছে যে, আল্লাহ ব্যতীত এ গায়েবী বিষয়ে কেউ জ্ঞান রাখেনা, কিন্তু যেহেতু কিছু সুফীরা রয়েছেন যারা পূর্বেই এ বিষয়াবলি জানতে পারে, তাই কোনো দ্বিধা ছাড়াই এমত গ্রহণ করা উচিত যে, এ গায়েবী জ্ঞান আল্লাহ ছাড়া অন্যদেরও রয়েছে! যদি এ বিশ্বাসের জন্য কুরআনের বুঝ পরিবর্তন করতে হয়, তাও করা এ বেরেলভী মাজহাবে জায়েয!!

এ সকল পরিষ্কার প্রমাণের পরও এখনও যদি তোমার কিছুটা দ্বিধা থেকে থাকে, তাহলে আরও একটি প্রমাণ নাও (তাদের এ বিভ্রান্ত আকীদা সম্পর্কে)!

বেরেলভীদের এক ইমাম লিখেছে, “আমি আউলিয়াদের থেকে বহুবার শুনেছি যে, আগামী কাল বা পরবর্তী রাতে বৃষ্টি হবে এবং বৃষ্টি হয়ও, অর্থাৎ তারা যেদিন বৃষ্টি হওয়ার কথা বলেছিল, সেদিনই বৃষ্টি হয়েছিল। আমি

---

[২৬৯] প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা-৫৪, দাওলাতুল মাক্কাহ পৃ-৪৮।

[২৭০] খালিসুল ইতিকাদ, পৃ-৫৩; আল কালিমাতুল উলিয়্যা, মুরাদাবাদী, পৃ-৩৫। (হোক বেরেলভী, দেওবন্দী কিংবা তাবলীগী সুফী-অনুবাদক)

আউলিয়াদের কে এ খবর দিতে শুনেছি যে, মায়ের গর্ভে কী আছে, ছেলে না মেয়ে এবং আমি নিজের চোখে দেখেছি যে, তারা যা জানিয়েছিল, তা-ই ঘটেছে।"[২৭১]

এরপরও যদি সামান্য পরিমাণ দ্বিধাও অবশিষ্ট থাকে তবে নিচের কিচ্ছাটিও কোনো যাতে কুরআনের আয়াত ও হাদীসের শিক্ষা জানার পরে তোমার আকীদায় যে গোলযোগ (!) সৃষ্টি হয়েছিল তা সংশোধন হয়ে যেতে পারে!

জনাব বেরেলভী লিখেছে, "একদিন শায়খ মুকাররম বলেন যে, এখানে এখনই তিনজন লোক আসবে এবং তারা এখানে মৃত্যুবরণ করবে। অমুক অমুক এভাবে এভাবে মারা যাবে। কিছু সময় পার হলে তিনজন লোক এলো এবং তিনি যেভাবে বলেছিলেন ঠিক সেভাবেই তারা মৃত্যুবরণ করল।"[২৭২] (সংক্ষেপিত)

এসব হলো তাদের মিথ্যা প্রমাণাদি যা গ্রহণ করা না হলে তা হবে আউলিয়াগণের প্রতি ধৃষ্টতা প্রদর্শন।

প্রকাশ্য মিথ্যাচারের মাধ্যমে বেরেলভী জিলানীর উপর মিথ্যারোপ করেছে এবং লিখেছে যে, তিনি প্রায়ই বলতেন "সূর্য আমাকে সালাম না দেয়া পর্যন্ত উদিত হয় না; যখন নতুন বছর আগমন করে, তা আমাকে সালাম দেয় ও যা এ বছর সংঘটিত হবে তা আমাকে জানিয়ে দেয়। যখন কোনো নতুন সপ্তাহ আগমণ করে তখন সে আমাকে সালাম দেয় ও এ সপ্তাহে যা সংঘটিত হবে তা আমাকে জানিয়ে দেয়। যখন কোনো নতুন দিবস আগমণ করে তখন সে আমাকে সালাম দেয় ও এ দিবসে যা সংঘটিত হবে তা আমাকে জানিয়ে দেয়। আমি আমার রবের কসম করে বলছি, সকল সাইয়্যেদ[২৭৩] (নেতা/ ভাগ্যবান) এবং শাক্বী[২৭৪] (দুর্ভাগা) আমার কাছে উপস্থাপন করা হয়। লাওহে মাহফুজের উপর রয়েছে আমার দৃষ্টি (অর্থাৎ লাওহে মাহফুজ আমার দৃষ্টিতে রয়েছে)। আমি মুশাহাদা (আল্লাহর দর্শন) ও আল্লাহ আযযা ও জাল্লা'র জ্ঞান দ্বারা (জ্ঞানের) নদীতে অবগাহন করি।

[২৭১] আল কালিমাতুল উলিয়্যা, মুরাদাবাদী, পৃ-৯৪-৯৫।

[২৭২] দাওলাতুল মাক্কাহ, বেরেলভী, পৃ-১৬৪।

[২৭৩] সাইয়েদ: উর্দু শব্দ এসেছে 'সাদ' যার অর্থ সৌভাগ্যবান।

[২৭৪] 'শাক্বী' অর্থ দুর্ভাগা, হতভাগ্য।

"আমি সকলের উপরে আল্লাহর মুহাব্বত। আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম -এর প্রতিনিধি (খলিফা) এবং আমি হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম -এর ওয়ারীছ (উত্তরাধিকারী)।"[২৭৫]

অপর একটি মিথ্যা অপবাদ লক্ষ্য করুন, "সাইয়্যেদুনা গাওসুল আযম হুজুরের প্রতি নূর প্রেরণ করেন। যদি শরীয়াত আমার জিহবাকে আটকে না রাখত তবে আমি তোমাদেরকে সবকিছু জানিয়ে দিতাম যা তোমরা খাও এবং যা তোমরা তোমাদের ঘরে সংরক্ষণ করে রাখ। আমার জন্য তোমরা (স্বচ্ছ) কাঁচের মত। আমি তোমাদের গোপন অবস্থা দেখতে পাই।"[২৭৬]

অপর এক বেরেলভী মুরীদ লিখেছে,

"অন্তরের ইচ্ছা তোমার দৃষ্টির গোচরে,

এসবের বেশ কম, হে গাওস আযম, তোমারই তরে।"

এ গায়েবের জ্ঞান শুধু বিশেষ কিছু ওলীদের জন্য খাস নয়, বরং সকল পীর ও সুফী শায়খ এর অধিকারী। বলা হয়েছে, "কোনো লোক ততক্ষণ পর্যন্ত কামেল হতে পারে না যতক্ষণ সে তার মুরীদের কার্যাবলি না জানে, যখন সে তার পিতার ঔরসে থাকে। অর্থাৎ 'ইয়ামুস সাত' থেকে যদি সে জানতে না পারে কোনো ঔরসে সে অবস্থান করেছিল এবং অগ্রসর হচ্ছিল, যতক্ষণ না তার জন্য জান্নাত বা জাহান্নাম নির্ধারণ করা হয়।"[২৭৭]

বেরেলভী কী বলে শুনুন, "ইনসানে কামেল (পরিপূর্ণ মানুষ)[২৭৮] এর অন্তর হলো পুরো জগৎসমূহ সবিস্তারে বর্ণিত আয়নার মত।"[২৭৯]

অর্থাৎ ইনসানে কামেল দুনিয়া ও আখিরাতের সকল গুরুত্বপূর্ণ ও গুরুত্বহীন সকল ঘটনাবলি বিস্তারিতভাবে অবগত। আসমানে এবং জমীনে সংঘটিত হয়, এমন কোনো ঘটনা নাই, যা তার দৃষ্টি থেকে লুকায়িত থাকে। যা প্রকাশ্য এবং যা গোপন- সবই সে জানে।

---

[২৭৫] আল আমান ওয়াল আলা, বেরেলভী, পৃ-১০৯; আরো দেখুন, আল কালিমাতুল 'উলিয়্যা, মুরাদাবাদী, পৃ-৬৭; খালিসুল ইতিকাদ, বেরেলভী, পৃ-৪৯।

[২৭৬] খালিসুল ইতিকাদ, বেরেলভী, পৃ-৪৯।

[২৭৭] আল কালিমাতুল উলিয়্যা, মুরাদাবাদী, পৃ-৭৯; তাসকীন আল খাওয়াতির, কাজমী, পৃ-১৪৬; জা আল-হাক্ক, পৃ-৮৭।

[২৭৮] ইনসানে কামেল: সুফীদের একটি বিশেষ পরিভাষা, এর দ্বারা তারা অলৌকিক ক্ষমতা সম্পন্ন সুফী শায়খকে বোঝায়।

[২৭৯] খালিসুল ইতিকাদ, বেরেলভী, পৃ-৫১।

এটা কতটা পরিতাপের বিষয় যে, যারা এ ধরনের নোংরামি প্রচার-প্রসার করছে এবং এগুলো মানুষের মাঝে মাশহুর (সুপরিচিত) করে তুলছে এবং (এর দ্বারা) মুসলিমদের পথভ্রষ্ট করছে, তারা তাদের নিজেদের প্রতি ইসলামের লেবেল (তকমা) এঁটে নিচ্ছে, এরজন্য সামান্য পরিমাণেও এরা দ্বিধাবোধ করছে না!

আবার বলা হয়, "যে ব্যক্তি আরশ এবং যা এর সীমানা দ্বারা পরিবেষ্টিত, সেসব, আসমানসমূহ, জান্নাত, জাহান্নাম এর মত (সামান্য) বিষয়াবলিতে সীমাবদ্ধ বা আবদ্ধ থাকে, সে (পরিপূর্ণ) মানুষ নয়। (পরিপূর্ণ) মানুষ হলো সেই ব্যক্তি যার দৃষ্টি সকল জগৎসমূহকে অতিক্রম করে যায় অর্থাৎ গায়েবের পরিপূর্ণ জ্ঞান ছাড়া কেউ-ই আল্লাহর ওলী হতে পারে না।"[২৮০]

আরো শুনুন, "পরিপূর্ণ মু'মিনের দৃষ্টি সাত আসমান ও সাত জমীনকে এমনভাবে বেষ্টন করে যেমন বিরান ভূমিতে একটি বৃত্তাকার আংটি।"[২৮১]

অনুরূপ অপর বেরেলভী লিখেছে,

"একজন ইনসানে কামেল (পরিপূর্ণ মানুষ) ঘটনাবলির হাকীকাত (মূলতত্ত্ব) সম্পর্কে অবগত এবং তার জন্য 'গায়েব' এবং 'গায়েব আল-গায়েব' উন্মুক্ত করা হয়।"[২৮২]

আরো অনেক কিচ্ছা ও পৌরাণিক কাহিনী তাদের বই-পুস্তকে পাওয়া যায় যার দ্বারা তারা যুক্তি দেয় যে, কোনোকিছুই ওলীদের থেকে গোপন নয়। তারা ছোট-বড় সবকিছু জানেন। আমরা এসকল কিচ্ছা-কাহিনী অপর একটি অধ্যায়ে উল্লেখ করব (ইনশা আল্লাহ)। (যাহোক) এ ধরনের হাজারো ঘটনা ও কিচ্ছা-কাহিনীতে তাদের বই গুলো ভরপুর রয়েছে যা প্রমাণ করে যে, এমনকি ওলীর সেবক, ওলীর পোষা প্রাণী ও তার গৃহে পালিত পশু ও প্রাণীও গায়েবের খবর জানে।

আল্লাহ আমাদের এ ধরনের নোংরামী ও শিরকী আকীদা থেকে রক্ষা করুন আমীন।

---

[২৮০] প্রাগুক্ত

[২৮১] প্রাগুক্ত, পৃ-৫২।

[২৮২] জা আল-হাক, আহমদ ইয়ার, পৃ-৮৫।

যতদূর সম্ভব এ সংক্রান্ত কুরআনের আয়াতসমূহ এবং হাদীসের নির্দেশাবলি উল্লেখ করছি যার দ্বারা এ ধরনের আকীদা-বিশ্বাস পরিষ্কারভাবে খণ্ডন করা হয়েছে। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿وَلِلَّهِ غَيْبُ ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَٱلْأَرْضِ ۚ وَمَآ أَمْرُ ٱلسَّاعَةِ إِلَّا كَلَمْحِ ٱلْبَصَرِ أَوْ هُوَ أَقْرَبُ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَىْءٍ قَدِيرٌ﴾

"আর আসমানসমূহ ও যমীনে গায়েবী বিষয় আল্লাহরই। আর কিয়ামতের ব্যাপারটি শুধু চোখের পলকের ন্যায়। কিংবা তা আরো নিকটবর্তী। নিশ্চয় আল্লাহ সব কিছুর উপর ক্ষমতাবান।" (সূরা নাহল ১৬ : ৭৭)

আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿قُلِ ٱللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا لَبِثُوا۟ ۖ لَهُۥ غَيْبُ ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَٱلْأَرْضِ ۖ أَبْصِرْ بِهِۦ وَأَسْمِعْ ۚ مَا لَهُم مِّن دُونِهِۦ مِن وَلِىٍّ وَلَا يُشْرِكُ فِى حُكْمِهِۦٓ أَحَدًا﴾

"বল, 'তারা যে সময়টুকু অবস্থান করেছিল, সে ব্যাপারে আল্লাহই অধিক জানেন'। আসমানসমূহ ও যমীনের গায়েবী বিষয় তাঁরই। এ ব্যাপারে তিনিই উত্তম দ্রষ্টা ও উত্তম শ্রোতা। তিনি ছাড়া তাদের কোনো অভিভাবক নেই। তাঁর সিদ্ধান্তে তিনি কাউকে শরীক করেন না।" (সূরা আল কাহফ ১৮: ২৬)

আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿ إِنَّ ٱللَّهَ عَٰلِمُ غَيْبِ ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَٱلْأَرْضِ ۚ إِنَّهُۥ عَلِيمٌۢ بِذَاتِ ٱلصُّدُورِ﴾

"নিশ্চয় আল্লাহ আসমানসমূহ ও যমীনের গায়েবী বিষয়ের জ্ঞানী, অন্তরসমূহে যা রয়েছে সে বিষয়েও তিনি সবিশেষ অবগত।" (সূরা ফাতির ৩৫: ৩৮)। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلَا يُحِيطُونَ بِهِۦ عِلْمًا﴾

"তিনি তাদের আগের ও পরের সব কিছুই জানেন, কিন্তু তারা জ্ঞান দিয়ে তাঁকে বেষ্টন করতে পারবে না।" (সূরা ত্ব-হা ২০: ১১০)

আল্লাহ তাঁর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে নির্দেশ দিচ্ছেন লোকদেরকে বলতে,

﴿قُل لَّآ أَمۡلِكُ لِنَفۡسِي نَفۡعٗا وَلَا ضَرًّا إِلَّا مَا شَآءَ ٱللَّهُۚ وَلَوۡ كُنتُ أَعۡلَمُ ٱلۡغَيۡبَ لَٱسۡتَكۡثَرۡتُ مِنَ ٱلۡخَيۡرِ وَمَا مَسَّنِيَ ٱلسُّوٓءُۚ إِنۡ أَنَا۠ إِلَّا نَذِيرٞ وَبَشِيرٞ لِّقَوۡمٖ يُؤۡمِنُونَ﴾

"বল, 'আমি আমার নিজের কোনো উপকার ও ক্ষতির ক্ষমতা রাখি না, তবে আল্লাহ যা চান। আর আমি যদি গায়েব জানতাম তাহলে অধিক কল্যাণ লাভ করতাম এবং আমাকে কোনো ক্ষতি স্পর্শ করতো না। আমিতো একজন সতর্ককারী ও সুসংবাদদাতা এমন কওমের জন্য, যারা বিশ্বাস করে'। "(সূরা আ'রাফ ৭: ১৮৮)

﴿قُل لَّآ أَقُولُ لَكُمۡ عِندِي خَزَآئِنُ ٱللَّهِ وَلَآ أَعۡلَمُ ٱلۡغَيۡبَ وَلَآ أَقُولُ لَكُمۡ إِنِّي مَلَكٌۖ إِنۡ أَتَّبِعُ إِلَّا مَا يُوحَىٰٓ إِلَيَّۚ قُلۡ هَلۡ يَسۡتَوِي ٱلۡأَعۡمَىٰ وَٱلۡبَصِيرُۚ أَفَلَا تَتَفَكَّرُونَ﴾

"বল, 'তোমাদেরকে আমি বলি না, আমার কাছে আল্লাহর ভাণ্ডারসমূহ রয়েছে এবং আমি গায়েব জানি না এবং তোমাদেরকে বলি না যে, নিশ্চয় আমি ফেরেশতা। আমি কেবল তাই অনুসরণ করি যা আমার কাছে ওহী প্রেরণ করা হয়'। বল, 'অন্ধ আর চক্ষুষ্মান কি সমান হতে পারে? অতএব তোমরা কি চিন্তা করবে না'?" (সূরা আল আনআম ৬: ৫০)

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কে সতর্ক করে এবং 'নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যে গায়েবের খবর জানতেন না' সে ব্যাপারে তাঁর উম্মাতকে জানাতে গিয়ে আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿يَٰٓأَيُّهَا ٱلنَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَآ أَحَلَّ ٱللَّهُ لَكَۖ تَبۡتَغِي مَرۡضَاتَ أَزۡوَٰجِكَۚ وَٱللَّهُ غَفُورٞ رَّحِيمٞ﴾

"হে নবী, আল্লাহ তোমার জন্য যা হালাল করেছেন তোমার স্ত্রীদের সন্তুষ্টি কামনায় তুমি কেন তা হারাম করছ? আর আল্লাহ অতীব ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।" (সূরা আত তাহরীম ৬৬ : ১)

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম -এর গায়েবের জ্ঞান থাকাকে আল্লাহ অস্বীকার করেছেন নিম্নোক্ত আয়াতে:

﴿وَمِمَّنۡ حَوۡلَكُم مِّنَ ٱلۡأَعۡرَابِ مُنَٰفِقُونَۖ وَمِنۡ أَهۡلِ ٱلۡمَدِينَةِ مَرَدُواْ عَلَى ٱلنِّفَاقِ لَا تَعۡلَمُهُمۡۖ نَحۡنُ نَعۡلَمُهُمۡۚ سَنُعَذِّبُهُم مَّرَّتَيۡنِ ثُمَّ يُرَدُّونَ إِلَىٰ عَذَابٍ عَظِيمٖ﴾

“আর তোমাদের আশপাশের মরুবাসীদের মধ্যে কিছু লোক মুনাফিক এবং মদীনাবাসীদের মধ্যেও কিছু লোক অতিমাত্রায় মুনাফিকীতে লিপ্ত আছে। তুমি তাদেরকে জান না। আমি তাদেরকে জানি। অচিরে আমি তাদেরকে দু’বার আযাব দেব তারপর তাদেরকে ফিরিয়ে নেয়া হবে মহাআযাবের দিকে।” (সূরা আত তাওবা ৯: ১০১)। আল্লাহ তা‘আলা বলেন,

﴿عَفَا ٱللَّهُ عَنكَ لِمَ أَذِنتَ لَهُمۡ حَتَّىٰ يَتَبَيَّنَ لَكَ ٱلَّذِينَ صَدَقُواْ وَتَعۡلَمَ ٱلۡكَٰذِبِينَ﴾

“আল্লাহ তোমাকে ক্ষমা করেছেন। তুমি তাদেরকে কেন অনুমতি দিলে, যতক্ষণ না তোমার কাছে স্পষ্ট হয় তারা যারা সত্য বলেছে এবং তুমি জেনে নাও মিথ্যাবাদীদেরকে।” (সূরা আত তাওবা ৯: ৪৩)

অনুরূপভাবে আল্লাহ তা‘আলা অন্যান্য নবীগণের গায়েবের জ্ঞান থাকাকেও অস্বীকার করেন এবং বলেন-

﴿يَوۡمَ يَجۡمَعُ ٱللَّهُ ٱلرُّسُلَ فَيَقُولُ مَاذَآ أُجِبۡتُمۡۖ قَالُواْ لَا عِلۡمَ لَنَآۖ إِنَّكَ أَنتَ عَلَّٰمُ ٱلۡغُيُوبِ﴾

“(স্মরণ কর) যেদিন আল্লাহ রাসূলগণকে একত্র করবেন, অতঃপর বলবেন, ‘তোমাদেরকে কী জবাব দেয়া হয়েছিল’? তারা বলবে, ‘আমাদের কোনো ইলম নেই, নিশ্চয় আপনি গায়েবী বিষয়সমূহের সর্বজ্ঞানী’।” (সূরা আল মায়িদা ৫ : ১০৯)

অনুরূপভাবে আল্লাহ তা‘আলা ফেরেশতাদের ইলমে গায়েবকে অস্বীকার করেছেন-

﴿قَالُواْ سُبۡحَٰنَكَ لَا عِلۡمَ لَنَآ إِلَّا مَا عَلَّمۡتَنَآۖ إِنَّكَ أَنتَ ٱلۡعَلِيمُ ٱلۡحَكِيمُ﴾

"তারা বলল, 'আপনি পবিত্র মহান। আপনি আমাদেরকে যা শিখিয়েছেন, তা ছাড়া আমাদের কোনো জ্ঞান নেই। নিশ্চয় আপনি সর্বজ্ঞ, প্রজ্ঞাময়'।" (সূরা আল বাকারা ২: ৩২)।

এ ধরনের ঘটনাবলি কুরআন-সুন্নাহয় বিভিন্ন নবী ও রাসূলগণ যেমন- আদম (আলাইহিস সালাম) থেকে নূহ (আলাইহিস সালাম) পর্যন্ত, ইবরাহীম খলীল (আলাইহিস সালাম) থেকে মূসা কালীম (আলাইহিস সালাম) পর্যন্ত এবং সাইয়্যেদুল মুরসালীন খাতামুল আম্বিয়া মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম পর্যন্ত অগণিত নবী রাসূলগণ থেকে অগণিত ঘটনা বর্ণিত আছে।

অনুরূপভাবে, বড় বড় ঘটনাবলি এর প্রকাশ্য প্রমাণ যে, তারা গায়েব জানতেন না, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম -এর সীরাত (জীবনচরিত) গ্রন্থাবলিও এর একটি প্রমাণ। উদাহরণস্বরূপ, বীরে মাউনার ঘটনা এবং বাইয়াতে রিদওয়ান, ইফকের ঘটনা, খেজুর গাছের তাবীর, 'উরনিয়্যিন' এবং এছাড়াও এ জাতীয় অসংখ্য ঘটনা (সহীহ বুখারী, ৫৬/১৭০, হা/৩০৪৫), আয়েশা (রাদিয়াল্লাহু আনহা) এর প্রতি ইফকের/অপবাদের ঘটনা (সহীহ বুখারী, হা/৪৭৫০, ২৫৯৩।

যদি কেউ এ সকল ঘটনাবলির প্রতি গভীরভাবে চিন্তা-ভাবনা করে, তার নিকট সুস্পষ্টভাবে পরিষ্কার হয়ে যাবে যে, গায়েবের জ্ঞান একমাত্র আল্লাহর জন্য খাস- আল্লাহ তা'আলা এতে নবী-রাসূল বা কোনো ওলীকে শরীক গ্রহণ করেননি।

কিন্তু বেরেলভী ফিরকা জোরে শোরে প্রচার করে যে, সকল নবীগণ এবং বুযুর্গাণে দীন (দরবেশ-ওলীরা) আল্লাহর এ গুণাবলিতে শরীক আছে এবং যে একে তার আকীদা হিসেবে গ্রহণ না করবে, সে হবে তাদের অসম্মানকারী। যদিও বেরেলভীগণ বানোয়াট ও উদ্ভট কাহিনীর মাধ্যমে এ বিষয়টি প্রমাণ করার চেষ্টা করেছে যে, "মৃত্যুর পূর্বে আহমাদ রেযা তার মৃত্যুর দিন ক্ষণ সম্পর্কে অবগত ছিল।"[২৮৩]

নবী ও ওলীগণের ব্যাপারে অতিরঞ্জন বা বাড়াবাড়ি এবং যে সকল গুণাবলি জগৎসমূহের প্রতিপালক আল্লাহর জন্য খাস, সে সকল গুণাবলি ও ক্ষমতা তাদের আছে বলে প্রমাণ করা তাদের প্রতি সম্মান প্রদর্শন নয়, বরং এটি কুরআন ও সুন্নাহর স্পষ্ট বিরোধিতা। এ ব্যাপারে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম -এর হাদীস:

---

[২৮৩] ওসীয়ত, বেরেলভী, পৃ-৭।

আনাস বিন মালিক (রাদিয়াল্লাহু আনহু) বলেন,

أَنَّ رَجُلًا قَالَ: يَا مُحَمَّدُ، يَا سَيِّدَنَا وَابْنَ سَيِّدِنَا، وَخَيْرَنَا وَابْنَ خَيْرِنَا. فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " يَا أَيُّهَا النَّاسُ عَلَيْكُمْ بِتَقْوَاكُمْ، لَا يَسْتَهْوِيَنَّكُمُ الشَّيْطَانُ، أَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ، عَبْدُ اللهِ وَرَسُولُهُ، وَاللهِ مَا أُحِبُّ أَنْ تَرْفَعُونِي فَوْقَ مَنْزِلَتِي الَّتِي أَنْزَلَنِي اللهُ "

এক ব্যক্তি বলে: "ইয়া মুহাম্মদ, ইয়া সাইয়্যেদুনা, ইবনা সাইয়্যেদুনা, খাইরানা, ইবনা খাইরানা: হে মুহাম্মদ, হে আমাদের নেতা, আমাদের নেতার পূত্র, আমাদের শ্রেষ্ঠতম ব্যক্তি ও শ্রেষ্ঠতম মানুষের সন্তান।" তখন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন: "হে মানুষেরা! তোমরা তাকওয়া (আল্লাহভীতি) অবলম্বন কর। শয়তান যেন তোমাদেরকে বিপথগামী বা প্রবৃত্তির অনুসারী না করে ফেলে। আমি মুহাম্মদ বিন আব্দুল্লাহ (আব্দুল্লাহর পূত্র মুহাম্মদ), আল্লাহর বান্দা ও রাসূল। আল্লাহর কসম! আল্লাহ জাল্লা শানুহু আমাকে যে স্থানে রেখেছেন, যে মর্যাদা প্রদান করেছেন তোমরা আমাকে তার উপরে উঠাবে, তা আমি পছন্দ করি না।"[২৮৪]

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ سَمِعَ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ يَقُولُ عَلَى الْمِنْبَرِ سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لَا تُطْرُونِي كَمَا أَطْرَتْ النَّصَارَى ابْنَ مَرْيَمَ فَإِنَّمَا أَنَا عَبْدُهُ فَقُولُوا عَبْدُ اللهِ وَرَسُولُهُ–

ইবনে আব্বাস (রাদিয়াল্লাহু আনহুমা) হতে বর্ণিত, তিনি উমার (রাদিয়াল্লাহু আনহু) কে মিম্বারের উপর দাঁড়িয়ে বলতে শুনেছেন যে, আমি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কে বলতে শুনেছি, তোমরা আমার প্রশংসা করতে গিয়ে বাড়াবাড়ি কর না, যেমন 'ঈসা ইবনে মারইয়াম আলাইহিস সালাম সম্পর্কে খ্রিষ্টানরা বাড়াবাড়ি করেছিল। আমি তাঁর বান্দা, তোমরাও তাই বলবে: আল্লাহর বান্দা ও তাঁর রাসূল।"[২৮৫]

---

[২৮৪] সহীহ: মুসনাদে আহমাদ, তাহকীক ৩/১৫৩, ২৪১, ২৪৯ হা/ ১২৫৭৩, ১৩১১৭, ১৩১৮৪। মুহাক্কিক শুয়াইব আরনাউত বলেন: হাদীসটির সনদ মুসলিমের শর্তানুযায়ী সহীহ

[২৮৫] (বুখারী, আস-সহীহ, ৬০/৪৮, হা/২৪৬২, ৩৪৪৫, ফাতহুল বারী ৬/৪৭৮; শামাইলে তিরিমিযী, বাব: রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম -এর বিনয় (تواضع) সম্পর্কে যা এসেছে)।

عَنْ أَبِي الْحُسَيْنِ اسْمُهُ: الْمَدَنِيُّ، قَالَ: كُنَّا بِالْمَدِينَة يَوْمَ عَاشُورَاءَ، وَالْجَوَارِي يَضْرِبْنَ بِالدَّفِّ وَيَتَغَنَّيْنَ، فَدَخَلْنَا عَلَى الرُّبَيِّعِ بِنْتِ مُعَوِّذٍ، فَذَكَرْنَا ذَلِكَ لَهَا، فَقَالَتْ: دَخَلَ عَلَيَّ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَبِيحَةَ عُرْسِي، وَعِنْدِي جَارِيَتَانِ يَتَغَنَّيَانِ، وَتَنْدُبَانِ آبَائِي الَّذِينَ قُتِلُوا يَوْمَ بَدْرٍ، وَتَقُولاَنِ فِيمَا تَقُولاَنِ: وَفِينَا نَبِيٌّ يَعْلَمُ مَا فِي غَدٍ، فَقَالَ: أَمَّا هَذَا فَلاَ تَقُولُوهُ، مَا يَعْلَمُ مَا فِي غَدٍ إِلاَّ اللهُ–

আবুল হুসাইন খালিদ মাদানী রহিমাহুল্লাহ হতে বর্ণিত তিনি বলেন: একবার আমরা আশুরার দিন মদীনায় ছিলাম। বালিকারা দফ বাজাচ্ছিল এবং গান গাচ্ছিল। এরপর আমরা রবী' বিনত মু'য়ওয়িয এর কাছে উপস্থিত হলাম এবং ঘটনাটি তাকে জানালাম। তখন তিনি বললেন: আমার বাসর দিনের সকাল বেলা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমার নিকট আসেন। এ সময় আমার নিকট দুটি বালিকা গান গাচ্ছিল এবং বদর যুদ্ধে নিহত আমার পিতৃ-পুরুষদের কীর্তিগাঁথা গাইছিল। তারা একথাও বলছিল: "আমাদের মধ্যে এমন নবী আছেন, যিনি আগামী কালের খবরও জানেন।" তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন: "এ কথা বলো না। কেননা, আগামী কালের খবর আল্লাহ ছাড়া কেউ জানেন না।" ()[২৮৬]

এখন বলুন! আল্লাহর কুরআন ও রাসূলের হাদীস সঠিক নাকি ঐ বেরেলভীগণ সঠিক? রায় দেয়ার আগে আয়শা (রাদিয়াল্লাহু আনহা) যা বলেন তা শুনে নিন,

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ مَنْ حَدَّثَكَ أَنَّ مُحَمَّدًا صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأَى رَبَّهُ فَقَدْ كَذَبَ وَهُوَ يَقُولُ { لَا تُدْرِكُهُ الْأَبْصَارُ } وَمَنْ حَدَّثَكَ أَنَّهُ يَعْلَمُ الْغَيْبَ فَقَدْ كَذَبَ وَهُوَ يَقُولُ لَا يَعْلَمُ الْغَيْبَ إِلَّا اللهُ–

আয়শা (রাদিয়াল্লাহু আনহা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, যে ব্যক্তি তোমাকে বলে মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর রবকে দেখেছেন, সে মিথ্যা বলছে। কেননা, আল্লাহ বলেছেন, "চক্ষুসমূহ তাঁকে দেখতে পায়না"। আর যে ব্যক্তি তোমাকে বলে মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম গায়েব জানে,

[২৮৬] সুনানে ইবনু মাজাহ, কিতাবুন নিকাহ, ৩/৯১, হা/১৮৯৭, হাদীসটি সহীহ। (বুখারী: ৪০০১, ৫১৩৭; তিরমিযী: ১০৯০; আবু দাউদ: ৪৯২২ আলবানী, সহীহ আবু দাউদ।

সেও মিথ্যা বলল। কেননা, আল্লাহ তা'আলা বলেন, "গায়েব জানেন একমাত্র আল্লাহ"।"[২৮৭]

কুরআনের এসকল আয়াত, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর হাদীসসমূহ এবং আয়েশা (রাদিয়াল্লাহু আনহা) এর বক্তব্য শ্রবণের পরও সে এখনও যদি এ আকীদা পোষণ করে যে, শুধু নবীগণই নন, বরং বুযুর্গানে দীন (দরবেশ ওলীরা) ও গায়েবের জ্ঞান রাখে, তাহলে তুমিই বল, এ ধরনের আকীদা-বিশ্বাসের সাথে ইসলামী শরীয়াতের কি সম্পর্ক থাকতে পারে?

৫. নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম একজন মানুষ এ প্রসঙ্গে

বেরেলভীদের এমন অনেক আকীদা রয়েছে যার সাথে কুরআন ও সুন্নাহর দূরতম সম্পর্কও নেই। তা সত্ত্বেও তারা নিজেদের 'আহলুস সুন্নাহ' বা 'আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামাআত' কিংবা 'সুন্নী' নামে পরিচয় দেয়। আর এ ব্যাপারে তারা একটুও সংকোচ বোধ করে না।

তাদের আকীদা হলো: 'নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আল্লাহর নূরের একটি অংশ।' তারা তাঁকে মানবত্বের সীমা থেকে বের করে দেয় এবং তাঁকে নূরের সৃষ্টির মধ্যে গণ্য করে।

এটি একটি অবিবেচনা প্রসূত ও অযৌক্তিক আকীদা এবং তা সাধারণ লোকদের বোধগম্যের বাইরে। ইসলামী শরীয়াত হলো সরল এবং সহজে বোধগম্য। এরকম বোধগম্যাতীত এবং অযৌক্তিক একটি আকীদার সাথে ইহার কোনো সম্পর্ক নেই।

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যে মানুষ ছিলেন, এ সত্য সম্পর্কে কুরআনের আয়াতে পরিষ্কার প্রমাণ রয়েছে। একথাও আমাদের কে বলা হয়েছে যে, কাফিরগণ বিগত নবী-রাসূলগণের সম্পর্কে অভিযোগ করে বলতো যে, আল্লাহ একজন মানুষকে কিভাবে তাঁর রাসূল (বার্তাবাহক) হিসেবে প্রেরণ করেন এবং তাকে রিসালাতের মর্যাদায় ভূষিত করেন? এ কাজের জন্য জরুরী ছিল যে, আল্লাহ নূরের তৈরি কাউকে রাসূল হিসেবে প্রেরণ করবেন এবং ফেরেশতাকে মনোনীত করবেন। সুতরাং আল্লাহ নবী ও রাসূলগণকে মানুষ (দের মধ্য থেকে মনোনীত) করেছেন কাফেরদের হেদায়েতের পথে বাধা হিসেবে।

---

[২৮৭] বুখারী, ৯৭/৪, হা/৭৩৮০

সুতরাং প্রমাণিত হলো যে, 'মানুষ কখনও রাসূল হতে পারে না' - এ আকীদা কাফেরদের আকীদা। পার্থক্য কেবল এই যে, কাফেরগণ বলতো যে, 'মানবত্ব' রিসালাতের পরিপন্থী, আর এ বেরেলভীদের আকীদা হলো 'রিসালাত মানবত্বের পরিপন্থী'। অতএব, তাদের উভয়ে এ বিষয়ে একমত যে, মানবত্ব ও রিসালাত একসঙ্গে (একক ব্যক্তির মাঝে) সহাবস্থান করতে পারে না।

এ বিষয়ে কুরআনের কিছু আয়াত বিশ্লেষণ করুন। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿وَمَا مَنَعَ ٱلنَّاسَ أَن يُؤۡمِنُوٓاْ إِذۡ جَآءَهُمُ ٱلۡهُدَىٰٓ إِلَّآ أَن قَالُوٓاْ أَبَعَثَ ٱللَّهُ بَشَرٗا رَّسُولٗا﴾

"আর যখন মানুষের নিকট হিদায়াত আসে তখন তাদের ঈমান আনতে বাধা দেয় তাদের এ কথা যে, 'আল্লাহ কি মানুষকে রাসূল হিসেবে পাঠিয়েছেন'?" (সূরা আল ইসরা ১৭ : ৯৪)

আল্লাহ তা'আলা এ আকীদা খণ্ডন করেন এবং বলেন,

﴿قُل لَّوۡ كَانَ فِي ٱلۡأَرۡضِ مَلَٰٓئِكَةٞ يَمۡشُونَ مُطۡمَئِنِّينَ لَنَزَّلۡنَا عَلَيۡهِم مِّنَ ٱلسَّمَآءِ مَلَكٗا رَّسُولٗا﴾

"বল, 'ফেরেশ্‌তারা যদি যমীনে চলাচল করতো নিশ্চিন্তভাবে তাহলে আমি অবশ্যই আসমান হতে তাদের কাছে ফেরেশ্‌তা পাঠাতাম রাসূল হিসেবে'।" (সূরা আল ইসরা ১৭ : ৯৫)

﴿قَالَتۡ رُسُلُهُمۡ أَفِي ٱللَّهِ شَكّٞ فَاطِرِ ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَٱلۡأَرۡضِۖ يَدۡعُوكُمۡ لِيَغۡفِرَ لَكُم مِّن ذُنُوبِكُمۡ وَيُؤَخِّرَكُمۡ إِلَىٰٓ أَجَلٖ مُّسَمّٗىۚ قَالُوٓاْ إِنۡ أَنتُمۡ إِلَّا بَشَرٞ مِّثۡلُنَا تُرِيدُونَ أَن تَصُدُّونَا عَمَّا كَانَ يَعۡبُدُ ءَابَآؤُنَا فَأۡتُونَا بِسُلۡطَٰنٖ مُّبِينٖ﴾

তাদের রাসূলগণ বলেছিল, 'আল্লাহর ব্যাপারেও কি সন্দেহ, যিনি আসমানসমূহ ও যমীনের সৃষ্টিকর্তা? তিনি তোমাদেরকে আহ্বান করেন যাতে তিনি তোমাদের পাপসমূহ ক্ষমা করেন এবং তিনি নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত তোমাদেরকে অবকাশ দেন'। তারা বলল, 'তোমরা তো আমাদের মতই মানুষ, 'তোমরা আমাদেরকে আমাদের পিতৃপুরুষরা যার ইবাদাত করতো, তা থেকে

ফিরাতে চাও। অতএব তোমরা আমাদের কাছে স্পষ্ট প্রমাণ নিয়ে আস'। (সূরা ইবরাহীম ১৪: ১০)

নবীগণ তাদের মানবত্বের স্বীকৃতি দিয়ে তাদের যুক্তিকে খণ্ডন করছেন,

﴿قَالَتْ لَهُمْ رُسُلُهُمْ إِن نَّحْنُ إِلَّا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ وَلَٰكِنَّ ٱللَّهَ يَمُنُّ عَلَىٰ مَن يَشَآءُ مِنْ عِبَادِهِۦ ۖ وَمَا كَانَ لَنَآ أَن نَّأْتِيَكُم بِسُلْطَٰنٍ إِلَّا بِإِذْنِ ٱللَّهِ ۚ وَعَلَى ٱللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ ٱلْمُؤْمِنُونَ﴾

"তাদেরকে তাদের রাসূলগণ বলল, 'আমরা তো কেবল তোমাদের মতই মানুষ, কিন্তু আল্লাহ তার বান্দাদের মধ্যে যাকে ইচ্ছা অনুগ্রহ করেন। আর আল্লাহর অনুমতি ছাড়া তোমাদের কাছে প্রমাণ নিয়ে আসার সাধ্য আমাদের নেই। আর কেবল আল্লাহর উপরই মুমিনদের তাওয়াক্কুল করা উচিত'।" (সূরা ইবরাহীম ১৪: ১১)। আবার,

﴿قَالُواْ مَآ أَنتُمْ إِلَّا بَشَرٌ مِّثْلُنَا وَمَآ أَنزَلَ ٱلرَّحْمَٰنُ مِن شَيْءٍ إِنْ أَنتُمْ إِلَّا تَكْذِبُونَ﴾

"তারা বলল, 'তোমরা তো আমাদের মতই মানুষ। আর পরম করুণাময় তো কিছুই নাযিল করেননি। তোমরা শুধু মিথ্যাই বলছ।" (সূরা ইয়াসীন ৩৬: ১৫)

আল্লাহ তা'আলা ফেরআউন ও তার সৈন্যদল সম্পর্কে বলেন,

﴿ثُمَّ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ وَأَخَاهُ هَٰرُونَ بِـَٔايَٰتِنَا وَسُلْطَٰنٍ مُّبِينٍ ۝٤٥ إِلَىٰ فِرْعَوْنَ وَمَلَإِيْهِۦ فَٱسْتَكْبَرُواْ وَكَانُواْ قَوْمًا عَالِينَ ۝٤٦ فَقَالُوٓاْ أَنُؤْمِنُ لِبَشَرَيْنِ مِثْلِنَا وَقَوْمُهُمَا لَنَا عَٰبِدُونَ﴾

"তারপর আমি মূসা ও তার ভাই হারূনকে আমার নিদর্শনাবলি ও সুস্পষ্ট প্রমাণসহ প্রেরণ করেছি। ফির'আউন ও তার পারিষদবর্গের কাছে; কিন্তু তারা অহঙ্কার করল এবং তারা ছিল উদ্ধত কওম। অতঃপর তারা বলল, আমরা কি আমাদের মতই দু'জন মানুষের প্রতি ঈমান আনব অথচ তাদের কওম আমাদের সেবাদাস।" (সূরা আল মুমিনুন ২৩: ৪৫-৪৭)

﴿فَقَالَ ٱلْمَلَؤُا۟ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا۟ مِن قَوْمِهِۦ مَا هَٰذَآ إِلَّا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ يُرِيدُ أَن يَتَفَضَّلَ عَلَيْكُمْ وَلَوْ شَآءَ ٱللَّهُ لَأَنزَلَ مَلَٰٓئِكَةً مَّا سَمِعْنَا بِهَٰذَا فِىٓ ءَابَآئِنَا ٱلْأَوَّلِينَ ﴿٢٤﴾ إِنْ هُوَ إِلَّا رَجُلٌۢ بِهِۦ جِنَّةٌ فَتَرَبَّصُوا۟ بِهِۦ حَتَّىٰ حِينٍ﴾

"তারপর তার সম্প্রদায়ের নেতৃস্থানীয়গণ, যারা কুফরী করেছিল- তারা বলল, 'এতো তোমাদের মত একজন মানুষ ছাড়া কিছুই না। সে তোমাদের উপর শ্রেষ্ঠত্ব লাভ করতে চায়। আর আল্লাহ ইচ্ছা করলে অবশ্যই ফেরেশতা নাযিল করতেন। এ কথাতো আমরা আমাদের পূর্ববর্তী পিতৃপুরুষদের সময়েও শুনিনি'। 'সে কেবল এমন এক লোক, যার মধ্যে পাগলামী রয়েছে। অতএব তোমরা তার সম্পর্কে কিছুকাল অপেক্ষা কর'।" (সূরা আল মুমিনুন ২৩: ২৪-২৫)

﴿وَقَالَ ٱلْمَلَأُ مِن قَوْمِهِ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا۟ وَكَذَّبُوا۟ بِلِقَآءِ ٱلْءَاخِرَةِ وَأَتْرَفْنَٰهُمْ فِى ٱلْحَيَوٰةِ ٱلدُّنْيَا مَا هَٰذَآ إِلَّا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ يَأْكُلُ مِمَّا تَأْكُلُونَ مِنْهُ وَيَشْرَبُ مِمَّا تَشْرَبُونَ ﴿٣٣﴾ وَلَئِنْ أَطَعْتُم بَشَرًا مِّثْلَكُمْ إِنَّكُمْ إِذًا لَّخَٰسِرُونَ﴾

"আর তার সম্প্রদায়ের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিগণ যারা কুফরী করেছে, আখেরাতের সাক্ষাতকে অস্বীকার করেছে এবং আমি দুনিয়ার জীবনে যাদের ভোগ বিলাসিতা দিয়েছিলাম, তারা বলল, 'সে কেবল তোমাদের মত একজন মানুষ, সে তাই খায় যা থেকে তোমরা খাও এবং সে তাই পান করে যা থেকে তোমরা পান কর'। 'আর যদি তোমরা তোমাদের মতই একজন মানুষের আনুগত্য কর, তবে তোমরা অবশ্যই ক্ষতিগ্রস্ত হবে'। (সূরা আল মুমিনুন ২৩: ৩৩-৩৪)

আইকাবাসীরাও শুয়াইব আলাইহিস সালাম কে একই কথা বলেছিল-

﴿وَمَآ أَنتَ إِلَّا بَشَرٌ مِّثْلُنَا وَإِن نَّظُنُّكَ لَمِنَ ٱلْكَٰذِبِينَ﴾

"'তুমি কেবল আমাদের মত একজন মানুষ। আর আমরা তোমাকে অবশ্যই মিথ্যাবাদীদের অন্তর্ভুক্ত বলে মনে করি'।" (সূরা শুয়ারা ২৬: ১৮৬)

অনুরূপ, মক্কার কাফিররা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কে বলেছিল-

﴿لَاهِيَةً قُلُوبُهُمْۗ وَأَسَرُّواْ ٱلنَّجْوَى ٱلَّذِينَ ظَلَمُواْ هَلْ هَٰذَآ إِلَّا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْۖ أَفَتَأْتُونَ ٱلسِّحْرَ وَأَنتُمْ تُبْصِرُونَ﴾

"তাদের অন্তর থাকে অমনোযোগী এবং যালিমরা গোপনে পরামর্শ করে, 'এ তো তোমাদের মতই একজন মানুষ। এরপরও কি তোমরা দেখে শুনে যাদুর কবলে পড়বে'?"(সূরা আম্বিয়া ২১: ৩)

আল্লাহ তাদের জবাব দিয়ে বলেন-

﴿وَمَآ أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ إِلَّا رِجَالًا نُّوحِيٓ إِلَيْهِمْۖ فَسْـَٔلُوٓاْ أَهْلَ ٱلذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ﴾

"আর তোমার পূর্বে আমি পুরুষই পাঠিয়েছিলাম, যাদের প্রতি আমি ওহী পাঠাতাম। সুতরাং তোমরা জ্ঞানীদেরকে জিজ্ঞাসা কর যদি তোমরা না জান।" (সূরা আম্বিয়া ২১: ৭)

লোকদেরকে বলার জন্য আল্লাহ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কে আদেশ দেন-

﴿قُلْ إِنَّمَآ أَنَاْ بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ يُوحَىٰٓ إِلَيَّ أَنَّمَآ إِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَٰحِدٌۖ فَمَن كَانَ يَرْجُواْ لِقَآءَ رَبِّهِۦ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَٰلِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِۦٓ أَحَدًا﴾

"বল, 'আমি তোমাদের মতই একজন মানুষ। আমার নিকট ওহী প্রেরণ করা হয় যে, তোমাদের ইলাহই এক ইলাহ। সুতরাং যে তার রবের সাক্ষাৎ কামনা করে, সে যেন সৎকর্ম করে এবং তার রবের ইবাদাতে কাউকে শরীক না করে'।" (সূরা কাহফ ১৮ : ১১০, সূরা ফুসসিলাত ৪১ : ৬)

﴿أَوْ يَكُونَ لَكَ بَيْتٌ مِّن زُخْرُفٍ أَوْ تَرْقَىٰ فِي ٱلسَّمَآءِ وَلَن نُّؤْمِنَ لِرُقِيِّكَ حَتَّىٰ تُنَزِّلَ عَلَيْنَا كِتَٰبًا نَّقْرَؤُهُۥۗ قُلْ سُبْحَانَ رَبِّي هَلْ كُنتُ إِلَّا بَشَرًا رَّسُولًا﴾

"'অথবা তোমার জন্য স্বর্ণের একটি ঘর হবে অথবা তুমি আসমানে উঠবে, কিন্তু তোমার উঠাতেও আমরা ঈমান আনব না, যতক্ষণ না তুমি আমাদের প্রতি এক কিতাব নাযিল করবে যা আমরা পাঠ করব'। বল, 'পবিত্র মহান আমার রব! আমি তো একজন মানব-রাসূল ছাড়া কিছু নই"? (সূরা আল ইসরা ১৭: ৯৩)

﴿لَقَدْ مَنَّ ٱللَّهُ عَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ يَتْلُوا۟ عَلَيْهِمْ ءَايَٰتِهِۦ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ ٱلْكِتَٰبَ وَٱلْحِكْمَةَ وَإِن كَانُوا۟ مِن قَبْلُ لَفِى ضَلَٰلٍ مُّبِينٍ﴾

"অবশ্যই আল্লাহ মুমিনদের উপর অনুগ্রহ করেছেন, যখন তিনি তাদের মধ্য থেকে তাদের প্রতি একজন রাসূল পাঠিয়েছেন, যে তাদের কাছে তাঁর আয়াতসমূহ তিলাওয়াত করে এবং তাদেরকে পরিশুদ্ধ করে আর তাদেরকে কিতাব ও হিকমাত শিক্ষা দেয়। যদিও তারা ইতঃপূর্বে স্পষ্ট ভ্রান্তিতে ছিল।" (সূরা আলে ইমরান ৩: ১৬৪)

﴿لَقَدْ جَآءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُم بِٱلْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَّحِيمٌ﴾

"নিশ্চয় তোমাদের নিজদের মধ্য থেকে তোমাদের নিকট একজন রাসূল এসেছেন, তা তার জন্য কষ্টদায়ক যা তোমাদেরকে পীড়া দেয়। তিনি তোমাদের কল্যাণকামী, মুমিনদের প্রতি স্নেহশীল, পরম দয়ালু।" (সূরা আত তাওবা ৯: ১২৮)। তিনি বলেন-

﴿كَمَآ أَرْسَلْنَا فِيكُمْ رَسُولًا مِّنكُمْ يَتْلُوا۟ عَلَيْكُمْ ءَايَٰتِنَا وَيُزَكِّيكُمْ وَيُعَلِّمُكُمُ ٱلْكِتَٰبَ وَٱلْحِكْمَةَ وَيُعَلِّمُكُم مَّا لَمْ تَكُونُوا۟ تَعْلَمُونَ﴾

"যেভাবে আমি তোমাদের মধ্যে একজন রাসূল প্রেরণ করেছি তোমাদের মধ্য থেকে, যে তোমাদের কাছে আমার আয়াতসমূহ তিলাওয়াত করে, তোমাদেরকে পবিত্র করে এবং কিতাব ও হিকমত শিক্ষা দেয়। আর তোমাদেরকে শিক্ষা দেয় এমন কিছু যা তোমরা জানতে না।" (সূরা বাকারা ২ : ১৫১)

আর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামও বার বার একথাই বলেছেন:

وحدثناه عون بن سلام الكوفي أخبرنا أبو بكر النهشلي عن عبد الرحمن بن الأسود عن أبيه عن عبدالله قال صلى بنا رسول الله صلى الله عليه و سلم خمسا فقلنا يا رسول الله أزيد في الصلاة ؟ قال وما ذاك ؟ قالوا صليت

خمسا قال إنما أنا بشر مثلكم أذكر كما تذكرون وأنسى كما تنسون ثم سجد سجدتي السهو-

আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রদিয়াল্লাহু আনহু) বলেন, "একবার রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাদের নিয়ে পাঁচ রাকআত সালাত আদায় করলেন। অতঃপর আমরা জিজ্ঞাসা করলাম, হে আল্লাহর রাসূল, সালাতে কি বৃদ্ধি করা হয়েছে? তিনি বলেন: তোমরা এ প্রশ্ন করছ কেন? তারা বললেন: আপনি পাঁচ রাকআত সালাত আদায় করেছেন। তখন তিনি বলেন, **"আমি তো তোমাদের মতই একজন মানুষ মাত্র**। তোমরা যেমন স্মরণ রাখো, আমিও তেমনি স্মরণ রাখি এবং তোমরা যেমন ভুলে যাও, আমিও তেমনি ভুলে যাই। অতঃপর দুটো সাহু সাজদা করলেন।" (সহীহ বুখারী হা/৪০৪; মুসলিম হা/৫৭২)।

এ ব্যাপারে আয়শা (রদিয়াল্লাহু আনহা) এর মতামত শুনুন,

حدثنا محمد بن اسماعيل , حدثنا عبد الله بن صالح , حدثني معاوية بن صالح عن يحي بن سعيد عن عمرة قالت: قيل لعائشة ماذا كان يعمل رسول الله صلي الله عليه و سلم في بيته، قالت: كان بشرًا منٌ البشر يفلي ثوبه ويحلبُ شاته ويخدم نفسه.

আমরাহ রহিমাহুল্লাহ বর্ণনা করেন যে, আয়শা (রদিয়াল্লাহু আনহা) কে কোনো ব্যক্তি জিজ্ঞেস করলেন,: 'রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বাড়িতে কী কাজ করতেন?' তিনি বললেন: "তিনি মানুষদের মধ্যকার একজন মানুষ ছিলেন। তিনি নিজে কাপড় ধৌত করতেন এবং নিজে ছাগল দোহন করতেন এবং সকল কাজ নিজে নিজেই করতেন।" (শামাইলে তিরমিযী, বাব: ""রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর বিনয় সম্পর্কে যা এসেছে", হা/৩২৫, আলবানী একে সহীহ বলেছেন; শামাইলে তিরিমিযী ইখতিসারাহু ও হাকিকহু; ফাতহুল বারী)

বেরেলভী খাঁন সাহেব নিজেই তার বইতে একটি হাদীস উল্লেখ করেছে যেখানে 'রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন:

"প্রত্যেকের নাভিতে মাটির একটি অংশ রয়েছে যা দ্বারা সে সৃষ্টি হয়েছে এবং এ (মাটি)-তেই সে সমাহিত (কবরস্থ) হবে। আমি, আবু বাকর ও উমার একই মাটি হতে সৃষ্ট এবং এতেই সমাহিত হব।"[২৮৮],[২৮৯]

প্রত্যাখ্যানকারীদের আকীদার সম্পূর্ণ বিপরীতে এ হলো কুরআনের ও 'রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম -এর শিক্ষা। বেরেলভীগণ নবী রাসূলগণের নবুওয়াত ও রিসালাত অস্বীকার করতে পারেনি। কিন্তু কাফের-মুশরিকদের অনুসরণে তারা তাদের 'মানবত্ব' কে অস্বীকার করেছে। "মানব সত্তা রিসালাতের অযোগ্য' এ কথা মানবের প্রতি একটি বিদ্রুপ এবং একথা বিশ্বাস করলে 'মানুষ আশরাফুল মাখলুকাত' বা সর্বশ্রেষ্ঠ সৃষ্টি' এ কথা বিশ্বাস করা অনর্থক হয়ে যায়। তখন এটি সম্পূর্ণ অযৌক্তিক হয়ে যায় যে, মানুষ আশরাফুল মাখলুকাত- সৃষ্টির মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ' আবার একই সময়ে সে রিসালাতের অযোগ্য। কিন্তু যেহেতু বেরেলভী মতবাদ এমন সব আকীদা-বিশ্বাসের মিশ্রণের নাম যেগুলো বিকৃত এবং স্বাভাবিকতার বিপরীত, যা সাধারণ লোকের বোধগম্যের সীমার উর্ধ্বে। আপনি সাধারণত এ সকল আকীদা তাদের অনুসারীদের মাঝেই পাবেন। এটিও ঐ সকল আকীদা-বিশ্বাসের অন্যতম। বেরেলভীগণ 'রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে আল্লাহর নূরের একটি অংশ বিশেষ মনে করে।

বেরেলভীদের এক ইমাম লিখেছে: "রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আল্লাহর নূর হতে এবং সকল সৃষ্টি তাঁর (রাসূলের) নূর হতে।"[২৯০]

(অনুরূপ)[২৯১]

বেরেলভী মতবাদের প্রতিষ্ঠাতা, জনাব বেরেলভী নিজেও অনেকগুলো গবেষণামূলক ছোট গ্রন্থ লিখেছে, যাতে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম -এর 'মানবত্ব' কে অস্বীকার করা হয়েছে।

---

[২৮৮] ফতোয়া আফ্রিকা, বেরেলভী, পৃ-৮৫, ১২৩৬ হিজরী প্রকাশিত।

[২৮৯] এ মর্মে বর্ণিত সকল হাদীসের সনদ জাল অথবা অত্যন্ত দুর্বল বা দুর্বল। কেউ কেউ কয়েকটি দুর্বল সনদ থাকায় একে হাসান বলেছেন। (দ্র. ইবনু আদী আল কামিল৭/১৫০; খতীব বাগদাদী, তারিখ বাগদাদ ২/৩১৩) সূত্র: ড. আব্দুল্লাহ জাহাঙ্গীর, হাদীসের নামে জালিয়াতি, পৃ. ৩৪৮-৪৯

[২৯০] প্রাগুক্ত, পৃ-৮৫

[২৯১] ফতোয়া নাঈমিয়্যাহ, পৃ-৩৭

একটির নাম 'الصلوة الصفا في نورالمصطفي'। সে এর খুতবায় ভাঙ্গা ভাঙ্গা আরবীতে যা লিখেছে তা অদ্ভুত ও অবোধ্য। যার অর্থ দাঁড়ায় এরকম- "হে আল্লাহ! সকল প্রশংসা তোমার জন্য। তুমি নূরসমূহের নূর। নূরসমূহের প্রথম এবং সর্বশেষ নূর। হে মহান সত্তা যার জন্য নূর, যার সাথে নূর, যার থেকে নূর, যার দিকে নূর এবং যে নিজে নূর। সালাত ও সালাম পাঠাও সেই উজ্জ্বল নূরের প্রতি যাকে তোমার নূর হতে সৃষ্টি করেছ, অতঃপর তাঁর নূর হতে বাকী সৃষ্টিকুলকে সৃষ্টি করেছো এবং সালাম প্রেরণ কর তাঁর নূরের আলোকচ্ছটা-এর প্রতি, তাঁর সকল আসহাব এবং তাঁর চন্দ্রসমূহের প্রতি।"[২৯২]

এ অযৌক্তিক ও সুদূর পরাহত খুতবার পর, আরেকটি মিথ্যা কাহিনীর দ্বারা সে যুক্তি দিয়েছে, "হাফিজ আব্দুর রায্যাক এর প্রতি সমন্বিত করে সে লিখেছে যে, তিনি তার 'আল-মুসান্নাফ' এ আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হতে একটি হাদীস বর্ণনা করেছেন, যদিও তা সেখানে নেই, "নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম জাবির (রাদিয়াল্লাহু আনহু) কে বলেন,

"নিশ্চয় অন্যান্য সৃষ্টির পূর্বে আল্লাহ সর্ব প্রথম তোমার নবীর নূর সৃষ্টি করেন। নবীর নূর কে আল্লাহ তাঁর কুদরতী শক্তিতে যেখানে ইচ্ছা রূপান্তরিত করেছেন। তখন, লাওহ, কলম, জান্নাত, জাহান্নাম, ফেরেশতা, আসমান-যমীন, চন্দ্র, সূর্য, মানব কোনোকিছুই সৃষ্টি করেননি। যখন আল্লাহ সৃষ্টিকুলকে সৃষ্টি করার ইচ্ছা করেন, তখন তিনি তাঁর নূরকে চারভাগে ভাগ করলেন। ১ম ভাগ দিয়ে কলম, ২য় ভাগ দিয়ে লাওহ, ৩য় ভাগ দিয়ে আরশ এবং ৪র্থ ভাগ কে আরও চারটি ভাগে ভাগ করলেন...।"[২৯৩]

এ জাল হাদীস উল্লেখ করার পর সে লিখেছে, "উম্মাহ এ হাদীসকে গ্রহণ করেছে এবং উম্মাহর গ্রহণ এমন একটি মহান বিষয় যার পরে সনদের আর প্রয়োজন নেই, বরং যদিও এর সনদ দূর্বল, তবু এটা কোনো ব্যাপার নয়।"[২৯৪]

'এ উম্মাহ' দ্বারা জনাব বেরেলভী কোনো উম্মাহ কে বুঝিয়েছেন?

যদি সে 'উম্মাহ' দ্বারা তাদের মত পথভ্রষ্ট ও বাতিল লোকদের বুঝিয়ে থাকে, তবে তা গ্রহণীয়। কিন্তু যদি এর দ্বারা সে আলিম ও হাদীসে পারদর্শী মুহাদ্দিসীনে কেরামকে বুঝিয়ে থাকে, তবে তা প্রমাণীত নয় যে, এ হাদীসকে

---

[২৯২] সালাতুস সফা ফী নূরুল মুস্তফা ফী মাজমু' রাসাইল, পৃ-২৩।

[২৯৩] প্রাগুক্ত, পৃ-৩৩।

[২৯৪] সালাতুস সফা ফী নূরুল মুস্তফা ফী মাজমু' রাসাইল, পৃ-২৩।

তারা গ্রহণ করেছেন। আর এ কথা কে (বা কোনো উসুলে হাদীসে) বলেছে যে, কোনো হাদীস উম্মাহ্ গ্রহণ করলেই তার সনদ যাচাইয়ের প্রয়োজন নেই?

এ বর্ণনা কুরআন, সুন্নাহর নির্দেশের বিরোধী এবং (সীরাত গ্রন্থাবলির) সকল ঘটনাবলি ও বর্ণনা এ ইসলাম বিরোধী ও অযৌক্তিক আকীদাকে খণ্ডন করে। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম অন্যান্য লোকদের মত পিতা আব্দুল্লাহ বিন আব্দুল মুত্তালিবের ঘরে আমিনার গর্ভে জন্মগ্রহণ করেন, তারই কোলে লালিত পালিত হন, হালিমার দুগ্ধ পান করেন, আবু তালিবের গৃহে বড় হন, খাদিজা, হাফসা, আয়শা ও অন্যান্যদের বিবাহ করেন।

অতঃপর মক্কায় যৌবন অতিবাহিত করেন, মদীনায় হিজরত করেন। তাঁর ঔরসে তাঁর ছেলে ইবরাহীম, কাসিম, তায়্যিব, তাহির এবং কন্যাগণ- জয়নাব, রুকাইয়া, উম্মে কুলসুম, ফাতিমা জন্মগ্রহণ করেন। আবু বাকর, আবু সুফিয়ান তাঁর শ্বশুর এবং আবুল আস, উসমান, আলী (রাদিইয়াল্লাহু আনহুম) তাঁর জামাতা ছিলেন। হামযাহ্, আব্বাস তাঁর চাচা ছিলেন এবং সাফিয়্যা আরাবী তাঁর ফুফু এবং আরো অনেক আত্মীয় স্বজন ছিল।

এ সব কিছু সত্ত্বেও নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম -এর মানবত্বকে অস্বীকার করা কী অদ্ভুত ও অযৌক্তিক!

এ ধরনের বিপরীতমুখী আকীদা ও ধ্যান-ধারণার নাম কি ইসলাম? আপনি যখন অমুসলিমদের এ সকল দৃষ্টিভঙ্গি ও আকীদার দিকে আহ্বান করবেন, তখন তাদেরকে কিভাবে বোঝাবেন?

এ ধরনের অযৌক্তিক ও অদ্ভুত আকীদা পোষণ করলে ইসলামই অযৌক্তিক ও অবোধ্য হয়ে যাবে।

আসলে বেরেলভী মতবাদ জাহেলী মিশ্রিত হওয়া ছাড়াও শিয়া ও বাতিনীয়্যাহ ফিরকার আকীদা দ্বারা মারাত্মকভাবে প্রভাবিত। অদ্ভুত অপব্যাখ্যা, মৃত্যুর পর আত্মার অন্যদেহে গমন এবং পুনর্জন্মবাদ/ জন্মান্তরবাদ -এসব এসেছে ইহুদীদের থেকে এবং গ্রীক দর্শন থেকে এবং পরবর্তীতে তা সুফীবাদে এবং এ বেরেলভী মতবাদে এসেছে। এখন তাদের লিখনী ও বর্ণনা শুনুন,

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম -এর সম্পর্কে তারা লিখেছে,

অর্থাৎ আদম, হাওয়া, জিন, মানব, আরশ, কুরসী - সবকিছু মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম -এর নূরের অংশ। এ আকীদায় বাতিনিয়্যাহ (শিয়া) ও গ্রীকদর্শনের স্পষ্ট প্রমাণ রয়েছে।

জনাব বেরেলভী বলে, "ফেরেশতাগণ নবীর নূর হতে সৃষ্ট কারণ, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন: "আল্লাহ আমার নূর হতে সকল কিছু সৃষ্টি করেছেন।"[২৯৫]

সে আরও লিখেছে: "সৃষ্টির সময় একটি মাত্র সত্তা ছিল, মুস্তফা এবং সকল কিছুর উপর তার (নূরের) প্রতিবিম্বের ফলে তারা অস্তিত্ব লাভ করে। বিশ্বে আহমাদের নূর সুর্যের মত উজ্জ্বল এবং পূরো বিশ্ব জগৎ-ই তার আয়না স্বরূপ, আর সৃষ্টিকুলের মধ্যে আহমাদের নূর হলো সূর্য এবং সকল জিনিসই তার স্বচ্ছ আয়না (প্রতিফলক)।"[২৯৬]

এ বর্ণনার প্রত্যেকটি শব্দ স্পষ্ট করে দিচ্ছে যে, এ আকীদা গ্রীক দার্শনিক আকীদা হতে গৃহীত এবং এটি এক প্রকারের ওয়াহ্দাতুল ওজুদের আকীদা। এর সাথে ইসলামের কোনো সম্পর্ক নেই।

জনাব বেরেলভী সাহেবের আরেকটি বর্ণনা শুনুন:

"প্রাথমিকভাবে (সৃষ্টির সময়) নূর জগত এমনভাবে মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম -এর নূরের মুখাপেক্ষী ছিল যে, যদি তিনি না হতেন, তবে কিছুই হতো না। সকল কিছুই আপন আপন অস্তিত্বের জন্য তাঁর মুখাপেক্ষী। যদি আজকেও (তাদের ভেতর থেকে) তাঁকে সরিয়ে দেওয়া হয়, তাহলে তৎক্ষণাৎ সকল বিশ্বজগৎ পুরোপুরি ধ্বংস হয়ে যাবে। যখন তিনি ছিলেন না, তখন কিছুই ছিল না এবং যদি তিনি না থাকেন, তবে কিছুই থাকবে না।"[২৯৭]

চিন্তা করুন এ সকল আকীদা-বিশ্বাস কুরআনের বর্ণনা থেকে কত দূরে! কুরআনে এমন কোনো আয়াত নেই যেখানে এ ধরনের বাতিনী বর্ণনা, দার্শনিক ধ্যাণ-ধারণা ও মতবাদ বিদ্যমান রয়েছে। কিন্তু আপনি যদি (বেরেলভীগণ থেকে) এ ধরনের আকীদাকে সরিয়ে দেন, তাহলে সঙ্গে সঙ্গে এ বেরেলভী মতবাদ পুরোপুরি ভেঙে পড়বে।

আহমাদ রেযা খাঁন অপর একটি বইয়ের ভূমিকায় লিখেছে:" সকল প্রশংসা তারই জন্য যিনি সকল সৃষ্টির পূর্বে নবীর নূর (নূরে মুহাম্মদী) সৃষ্টি করেছিলেন। অতঃপর তিনি তাঁর মাজাহির (অবতার/প্রকাশস্থল) -এর প্রতিবিম্ব হতে 'মাকামে আনওয়ার' (নূরসমূহের স্থান) সৃষ্টি করেছিলেন। নবী সাল্লাল্লাহু

[২৯৫] সালাতুস সফা ফী নূরুল মুস্তফা ফী মাজমু' রাসাইল, ১ম খণ্ড, পৃ-৩৭

[২৯৬] সালাতুস সফা ফী নূরুল মুস্তফা ফী মাজমু' রাসাইল, ১ম খণ্ড, পৃ-২০।

[২৯৭] প্রাগুক্ত।

আলাইহি ওয়া সাল্লাম নূরসমূহের মধ্যে একটি নূর। চন্দ্র-সূর্য তাঁর কাছ থেকে আলো (নূর) গ্রহণ করেছে, এজন্য আল্লাহ তাঁকে 'নূর' ও 'সিরাজুম মুনীর' বলেছেন। তিনি যদি সেখানে না থাকতেন তবে সূর্য আলো দিতো না। দিন-রাতের মাঝে কোনো পার্থক্য থাকতো না এবং সালাতের ওয়াক্তসমূহ জানা যেতো না।"[২৯৮]

লক্ষ্য করুন কিভাবে শব্দের অর্থ বিকৃতিকে এ আকীদার ভিত্তি বানানো হয়েছে। আবারো উদ্ধৃত করেছে, "মাটিতে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম -এর ছায়া পড়তোনা এবং তিনি ছিলেন পূরে নূর। তিনি যখন রোদে অথবা চাঁদের আলোয় হাঁটতেন, তখন তাঁর ছায়া দেখা যেতো না।"[২৯৯]

তার কবিতার কিছু পংক্তি শুনুন:

"আপনি নূরের ছায়া আপনার সর্বাংশই নূর

ছায়ার কোনো ছায়া নেই, আর নূরেরও কোনো ছায়া নেই।

আপনার পবিত্র বংশের প্রত্যেক শিশুই নূর হতে (সৃষ্টি)

আপনি পূর নূর এবং আপনার পূরো পরিবারই নূর হতে।"

অর্থাৎ তারা শুধু নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম -এর মানবত্ব কেই অস্বীকার করেনি, বরং তাঁর সকল সন্তানকেই নূর হতে সৃষ্ট বলে ঘোষণা দিয়েছে।

এ সকল বাতিনী আকীদার কারণে পুনর্জন্মবাদ/জন্মান্তরবাদের আকীদা তাদের মধ্যে প্রবেশ করেছে এবং এর ভিত্তিতে ইসলামী আকীদায় ইহুদী ও খৃষ্টানদের আকীদা প্রবেশ করানোর মাধ্যমে সে দীন ইসলামকেই ব্যঙ্গ করেছে।

এক বেরেলভী কবি লিখেছে,

"এক সত্তা যিনি আরশের উপর সমুন্নত খোদা হিসেবে, (তিনিই) মদীনায় এলেন মুস্তফা হিসেবে।"

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর মানবীয় গুণাবলি বর্ণনা করার পর 'নূর' হিসেবে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে কেউ অনুধাবন

[২৯৮] ফী মাজমু' রাসাইল, পৃ-১৯৯।

[২৯৯] প্রাগুক্ত, পৃ- ২০২।

করতে পারবে না। এ ধরনের দৃষ্টিভঙ্গি বুঝার বাধগম্যতার অতীত, তা স্বীকার করে বেরেলভীর এক অনুসারী লিখেছে:

"আল্লাহ মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর প্রকৃতিকে 'নূর' হিসেবে বর্ণনা করেননি এবং আমরা এটি বুঝতেও পারি না। সুতরাং কোনো ভাবনা-চিন্তা বা বুঝ (এর চেষ্টা) ছাড়াই এতে ঈমান রাখা অপরিহার্য।"[৩০০]

অর্থাৎ বুদ্ধিমত্তা, বোধশক্তি, চিন্তা-ভাবনা বা বিচার-বিবেচনা/আকল ব্যবহারের কোনো প্রয়োজন নেই। কারণ এ ব্যাপারে যদি একটু চিন্তা-ভাবনা করা যায় তবে বেরেলভী মতবাদের পুরো কাঠামোই ভেঙ্গে চুরমার হয়ে যাবে। একে সুপ্রতিষ্ঠিত রাখতে চিন্তা-ভাবনা ও আকল বা বিচার-বিবেচনার উপর নিষেধাজ্ঞা আরোপ করা বেরেলভী মতবাদের জন্য অপরিহার্য বিষয়।

কুরআনের আয়াতের (অর্থ) পুরোপুরি বিকৃত করে বেরেলভীগণ লিখেছে, "'কুল' শব্দটি থেকে যা বুঝা যায়, তা হলো কেবল নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর জন্য একথা বলা জায়েয যে, 'বাশারুম মিছলুকুম' (তোমাদের মতই মানুষ)।"[৩০১]

এখন একথা তাকে কে বলবে যে, 'কুল' শব্দটি এ আয়াতেও এসেছে, أَنَّمَا إِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ - "ইন্নামা ইলাহুকুম ইলাহু ওয়াহিদ" (অর্থাৎ-তোমাদের ইলাহই একক ইলাহ")। সুতরাং এর দ্বারা কি এ কথা বুঝাবে যে, তোমার ইলাহ একক ইলাহ' একথা কেবল নবীর জন্যই খাস?

তারা বলে, "'বাশার' (মানব) বলা কাফিরদের কথা।"[৩০২]

যদি তা-ই হয় (আউযুবিল্লাহি মিনহা), তবে ইমাম বুখারী (ও অন্যান্যরা) বর্ণিত এ হাদীসের অর্থ কি যেখানে আয়েশা (ও অন্যান্য সাহাবীগণ (রাদিয়াল্লাহু আনহুম)) বলেন: "রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম 'বাশার' মানুষ ছিলেন।"[৩০৩]

---

[৩০০] মান হুয়া আহমাদ রেযা বেরেলভী আল-হিন্দীয়্যাহ, সুজাআত আলী বেরেলভী, পৃ-৩৯।

[৩০১] মুওয়ায়েজ নাঈমিয়্যাহ, আহমাদ ইয়ার গুজরাটী, পৃ-১১৫।

[৩০২] ফতোয়া রিযভীয়্যাহ, আহমাদ রেযা, ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃ-১৪৩; মুওয়ায়েজ নাঈমিয়্যাহ, পৃ-১১৫

[৩০৩] এ হাদীসসমূহ আমরা পূর্বে উল্লেখ করেছি।

আল্লাহ এ ভ্রান্ত ও বাতিল আকীদা-বিশ্বাস থেকে আমাদেরকে রক্ষা করুন। আমীন।

৬. রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর 'হাজির-নাযির' হওয়া প্রসঙ্গে

বেরেলেভীদের আকীদা-বিশ্বাস, যুক্তি; বুদ্ধি ও মানুষের বোধগম্যতাকে অতিক্রম করে যায়। বেরেলভীদের আকীদাসমূহের মধ্যে অন্যতম হলো, বেরেলভীর অনুসারীরা (সাধারণত) বলে থাকে যে,

"রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সর্বত্র হাজির (উপস্থিত) ও নাযির (দর্শনকারী) এবং স্বশরীরে একই সাথে একাধিক স্থানে উপস্থিত থাকতে পারেন।'

এ আকীদা শুধু কুরআন ও সুন্নাহর সম্পূর্ণ বিরোধিতার উপরই ভিত্তিশীল নয়, বরং তা জ্ঞান, শিক্ষা, বুদ্ধিমত্তা ও প্রজ্ঞা-বর্জিতও বটে। ইসলামী শরীয়াত এমন মিথ্যা ও হিন্দুয়ানী আকীদা- বিশ্বাস হতে মুক্ত ও পবিত্র।

বেরেলভীদের বিশ্বাস হলো, "কোনো স্থান ও সময়ই "রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম (এর উপস্থিতি) হতে মুক্ত নয়।"[৩০৪]

সে লিখেছে, "জগৎসমূহের মালিক রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর মহান ক্ষমতা ও নবুয়াতী নূরের পক্ষে অস্বাভাবিক নয় যে, একই সময়ে পূর্ব ও পশ্চিমে, উত্তর ও দক্ষিণে, উপরে নীচে, সকল দিকে ও দূরবর্তী শত্রুদের অবস্থান স্থলেও তাঁর পবিত্র স্বত্ত্বা অথবা তাঁর মিছালীরূপে পবিত্র শরীরসহ উপস্থিত থেকে তাঁর বিশ্বস্ত ওলীদেরকে তাঁর চেহারার সৌন্দর্য্যের যিয়ারত (দর্শন) এবং তাঁর সম্মানিত হেফাযতের রহমত বরকত প্রদান করতে পারেন।"[৩০৫]

অর্থাৎ এটি অসম্ভব ব্যাপার নয় যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম একই সময়ে অসংখ্য স্থানে সশরীরে উপস্থিত থাকতে পারেন।

এ আকীদা কুরআন ও সুন্নাহ, ইসলামী শরীয়াত, আল্লাহ ও তাঁর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর বাণীসমূহ হতে এবং বুদ্ধি-বিবেচনা হতেও

---

[৩০৪] তাসকীন আল খাওয়াতির ফী আসআলাহ আল হাজির ওয়া নাযির, আহমাদ সাইয়্যিদ কাজমী, পৃ-৮৫।

[৩০৫] প্রাগুক্ত, পৃ-১৮

বহু দূরবর্তী। হ্যাঁ, যদি এটা শরীয়াতে অসম্ভব বিষয় না হতো এবং বেরেলভী মতবাদের ইমাম জনাব আহমাদ রেযা সাহেব বেরেলভীর নিজের আবিষ্কৃত দর্শন না হতো, তবে সেটা হতো আলাদা বিষয়।

অপর বেরেলভী অনুসারী উদ্ধৃত করেছে, "আল্লাহর ওলীগণ একই সময়ে বহু স্থানে উপস্থিত থাকতে পারেন এবং তারা একই সময়ে বহু দেহ ধারণ করতে পারেন।"[৩০৬]

অর্থাৎ আল্লাহর ওলীগণের পক্ষে যদি এটা করা সম্ভব হয়, তবে "রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম -এর পক্ষে এটা কেন অসম্ভব হবে?

"নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম -এর তাঁর সাহাবাগণের রুহসমূহকে সাথে নিয়ে সারা বিশ্ব ঘুরে বেড়ানোর ক্ষমতা আছে। অনেক আল্লাহর ওলীগণ তাঁকে দেখেছেন।"[৩০৭]

দাবি ও তার প্রমাণ একই সঙ্গে উল্লেখ করা হয়েছে! দাবি হলো, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর সাহাবীগণসহ একই সময়ে বহু স্থানে উপস্থিত হতে পারেন এবং দলীল হলো, 'অনেক ওলীগণ তাকে দেখেছেন।'

আবার বলা হচ্ছে: "তাঁর উম্মতের আমল দেখা-শোনা করা, তাদের গুনাহর জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করা, তাদের বালা-মুসিবত দূর হওয়ার উদ্দেশ্যে দুআ করা, পৃথিবীর চতুর্দিকে ঘুরে বেড়ানো, এতে বরকত প্রদান করা এবং যদি কোনো নেককার ব্যক্তি মারা যায় তার জানাযায় উপস্থিত হওয়া- এসবগুলো হলো রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম -এর কর্ম।"[৩০৮]

এখন শুনুন নেককারগণের সম্পর্কে আহমাদ রেযা কী বলে: "তাকে জিজ্ঞেস করা হলো যে, 'আউলিয়াদের জন্য একই সময়ে কয়েকস্থানে উপস্থিত থাকা সম্ভব কি-না। সে উত্তর দিল, 'যদি তারা ইচ্ছা করেন, তবে দশ হাজার শহরের দশ হাজার স্থান হতে আহ্বান কবুল করতে পারেন (আহ্বানে সাড়া দিতে পারেন)।"[৩০৯]

[৩০৬] জাআল হাক্ব, পৃ-১৫০।

[৩০৭] প্রাগুক্ত, ১৫৪।

[৩০৮] জাআল-হাক্ব, গুজরাটি বেরেলভী, পৃ-১৫৪।

[৩০৯] মালফুযাত, পৃ-১১৩।

সে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম -এর সম্পর্কে লিখেছে: "রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর রূহ মুবারক বিশ্বের সকল মুসলিমের বাড়িতে হাজির আছে।"[৩১০]

কে জানে কোথা হতে বেরেলভীরা এই হীন শিক্ষা অবলম্বন করেছে?

বেরেলভীর এক অনুসারী লিখেছে: "রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম -এর মুবারক দর্শন (যিয়ারত) বিশ্বে সব সময় প্রতি মুহূর্তে সংঘটিত বিষয় এবং তিনি সালাতের জামাআতে, কোরআন তিলাওয়াতে, মিলাদে এবং না'ত খাওয়ানী এবং বিশেষভাবে নেককার দের জানাযায় সশরীরে উপস্থিত থাকেন।"[৩১১]

বেরেলভীর সেই একই অনুসারী পুনরায় লিখেছে:" রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আদমের সৃষ্টি, তাঁকে সম্মাননা প্রদান, তাঁর ভুলের জন্য জান্নাত থেকে বের করে দেওয়া, অতঃপর তাঁর তাওবা কবুল হওয়া ও পরবর্তী ঘটনাবলির প্রত্যক্ষদর্শী ছিলেন এবং তিনি ইবলিসের সৃষ্টি ও অন্যান্য ঘটনাবলি দেখেছেন এবং রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম -এর চিরন্তন তাওয়াজ্জুহ (মনোযোগ) যখনই আদম (আলাইহিস সালাম) থেকে সরে গিয়েছিল, তখনই তাঁর থেকে বিস্মৃতি এবং তার ফলাফল সংঘটিত হয়েছিল।"[৩১২]

অর্থাৎ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এমনকি দুনিয়ায় প্রেরিত হওয়ার পূর্বেও তিনি হাজির ও নাযির ছিলেন!

"ওলীগণ প্রায়ই জাগ্রত অবস্থায় তাদের চর্মচোখে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর উপস্থিতি লক্ষ্য করেন।"[৩১৩]

অন্যত্র সে লিখেছে, "অন্তর্দৃষ্টি সম্পন্ন লোকেরা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে তাদের সালাতের ভেতরও দেখে থাকেন।"[৩১৪]

আরো শুনুন। সে লিখেছে, "রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর পবিত্র রূহ এবং দেহ মুবারকসহ (তাঁর কবরে) জীবিত এবং নিঃসন্দেহে পৃথিবীর চারিপাশে এবং ফেরেশতাদের জগতের চারিপাশে তিনি ঘুরে বেড়ান। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর মৃত্যুর পূর্বে যে আকৃতিতে ছিলেন,

[৩১০] খালিসুল ইতিকাদ, পৃ-৪০।

[৩১১] জা-আল-হাক্ব, পৃ-১৫৬।

[৩১২] প্রাগুক্ত, পৃ-১৫৫।

[৩১৩] তাসকীন আল খাওয়াতির, পৃ-১৮।

[৩১৪] তাসকীন আল খাওয়াতির, পৃ-১৮।

এখনও সেই একই আকৃতিতে বিদ্যমান রয়েছেন এবং তাঁর কোনো কিছুই পরিবর্তন হয়নি। আসলে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম জাহিরী (বা মানবীয়) দৃষ্টি হতে অন্তরীণ (আত্মগোপন করে) রয়েছেন যেমন ফেরেশতারা গোপন রয়েছে যদিও তারা সশরীরে জীবিত। যখন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম -এর দর্শন দানের মাধ্যমে আল্লাহ কাউকে সম্মান ও অনুগ্রহ করতে চান, তখন তিনি তাঁর থেকে হিজাব (পর্দা) সরিয়ে দেন, ফলে সেই ব্যক্তি সেই আকৃতিতে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কে দেখে যে আকৃতিতে তিনি এখন আছেন।"[৩১৫]

জনাব আহমাদ রেযা বেরেলভী বলেছে, "যে কৃষ্ণ কানহিয়া একজন কাফির ছিল এবং একই সময়ে সে যদি শত শত স্থানে আবির্ভূত (হাজির) হতে পারে এবং যদি ফাতাহ মুহাম্মদ একই সময়ে অনেক স্থানে উপস্থিত (হাজির) হয়, তবে তাতে বিস্ময়ের কী আছে? তুমি কি ধারণা করছ যে, শায়খ একই সময়ে এক স্থানে থাকতেন এবং অন্য স্থানেও থাকতেন, এ (ঘটনা) গুলো কেবল উপমা? আউযুবিল্লাহ! কিন্তু শায়খ নিজে সেই সকল স্থানে (বাস্তবিকই) উপস্থিত থাকতেন। গুপ্ত রহস্যাদি জাহিরী জ্ঞানের বাইরে। কাশফ ও বিবেক-বুদ্ধির তুলনা করা অনুচিত।"[৩১৬]

সুবহানাল্লাহ!

কোনো আয়াতে বা হাদীসে তাদের দাবির পক্ষে কোনো প্রমাণ নেই। দলীল হলো যদি কৃষ্ণ (হিন্দু দেবতা) কাফের হয়ে শত শত স্থানে উপস্থিত থাকতে পারে, তবে আল্লাহর ওলীরা কেন কয়েকস্থানে উপস্থিত থাকতে পারবে না?

অদ্ভুতভাবে যুক্তি দেখানো বেরেলভীদের একটি বিশেষ বৈশিষ্ট্য। তাঁর এ 'বাতিনী রহস্য জাহিরী জ্ঞানের বাইরে' এবং কাশফ ও বিবেক-বুদ্ধির (আকল) তুলনা করা অসংগত" কথাটি বিশ্লেষণ করুন।

এ হলো তাদের সুন্দর যুক্তি যার ব্যাখ্যা করা যায় না!?

বেরেলভী ইমামের এক অনুসারী লিখেছে, "নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আদম (আলাইহিস সালাম) এর সময় হতে তাঁর শারীরিকভাবে অস্তিত্বলাভ করা (জন্মগ্রহণ করা) পর্যন্ত হাজির (উপস্থিত) ছিলেন।"[৩১৭]

[৩১৫] তালকীন আল খাওয়াতির, পৃ-১৮

[৩১৬] ফতোয়া রিজভীয়্যাহ, বেরেলভী, ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃ- ১৪২; প্রাগুক্ত মালফুযাত, পৃ-১১৪।

[৩১৭] জা্আল-হাক্ব, পৃ-১৬৩।

আল্লাহর বাণীর সাথে এ বেরেলভীদের আকীদা তুলনা করুন।

আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿وَمَا كُنتَ بِجَانِبِ ٱلْغَرْبِيِّ إِذْ قَضَيْنَآ إِلَىٰ مُوسَى ٱلْأَمْرَ وَمَا كُنتَ مِنَ ٱلشَّٰهِدِينَ ۝٤٤ وَلَٰكِنَّآ أَنشَأْنَا قُرُونًا فَتَطَاوَلَ عَلَيْهِمُ ٱلْعُمُرُ ۚ وَمَا كُنتَ ثَاوِيًا فِىٓ أَهْلِ مَدْيَنَ تَتْلُوا۟ عَلَيْهِمْ ءَايَٰتِنَا وَلَٰكِنَّا كُنَّا مُرْسِلِينَ ۝٤٥ وَمَا كُنتَ بِجَانِبِ ٱلطُّورِ إِذْ نَادَيْنَا وَلَٰكِن رَّحْمَةً مِّن رَّبِّكَ لِتُنذِرَ قَوْمًا مَّآ أَتَىٰهُم مِّن نَّذِيرٍ مِّن قَبْلِكَ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ﴾

"আর (হে নবী) আমি যখন মূসাকে বিধান দিয়েছিলাম তখন তুমি (তূর পাহাড়ের) পশ্চিম পার্শে উপস্থিত ছিলে না। আর তুমি প্রত্যক্ষদর্শীদের অন্তর্ভুক্তও ছিলে না। কিন্তু আমি অনেক প্রজন্মকে সৃষ্টি করেছি। তারপর তাদের উপর বহু যুগ অতিবাহিত হয়েছিল। তুমি তো মাদইয়ানবাসীদের মধ্যে অবস্থানকারী ছিলে না যে, তাদের নিকট আমার আয়াতগুলো তুমি তিলাওয়াত করবে। কিন্তু আমিই রাসূল প্রেরণকারী। আর যখন আমি (মূসাকে) ডেকেছিলাম তখন তুমি তূর পর্বতের পাশে উপস্থিত ছিলে না। কিন্তু তোমার রবের পক্ষ থেকে রহমতস্বরূপ জানানো হয়েছে, যাতে তুমি এমন কওমকে সতর্ক করতে পার, যাদের কাছে তোমার পূর্বে কোনো সতর্ককারী আসেনি। সম্ভবত তারা উপদেশ গ্রহণ করবে।" (সূরা আল কাসাস ২৮: ৪৪-৪৬)

মারইয়ামের ঘটনা বর্ণনা করার পর তিনি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলেন,

﴿ذَٰلِكَ مِنْ أَنۢبَآءِ ٱلْغَيْبِ نُوحِيهِ إِلَيْكَ ۚ وَمَا كُنتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يُلْقُونَ أَقْلَٰمَهُمْ أَيُّهُمْ يَكْفُلُ مَرْيَمَ وَمَا كُنتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يَخْتَصِمُونَ﴾

, "এটি গায়েবের সংবাদসমূহের অন্তর্ভুক্ত, যা আমি তোমার প্রতি ওহী পাঠাচ্ছি। আর তুমি তাদের নিকট ছিলে না, যখন তারা তাদের কলম নিক্ষেপ করছিল, তাদের মধ্যে কে মারইয়ামের দায়িত্ব নেবে? আর তুমি তাদের নিকট ছিলে না, যখন তারা বিতর্ক করছিল।" (সূরা আলে ইমরান ৩: ৪৪)

﴿تِلۡكَ مِنۡ أَنۢبَآءِ ٱلۡغَيۡبِ نُوحِيهَآ إِلَيۡكَۖ مَا كُنتَ تَعۡلَمُهَآ أَنتَ وَلَا قَوۡمُكَ مِن قَبۡلِ هَٰذَاۖ فَٱصۡبِرۡۖ إِنَّ ٱلۡعَٰقِبَةَ لِلۡمُتَّقِينَ﴾

"এগুলো গায়েবের সংবাদ, আমি তোমাকে ওহীর মাধ্যমে তা জানাচ্ছি। ইতঃপূর্বে তা না তুমি জানতে এবং না তোমার কওম। সুতরাং তুমি সবর কর। নিশ্চয় শুভ পরিণাম কেবল মুত্তাকীদের জন্য।" (সূরা হুদ ১১: ৪৯)

﴿ذَٰلِكَ مِنۡ أَنۢبَآءِ ٱلۡغَيۡبِ نُوحِيهِ إِلَيۡكَۖ وَمَا كُنتَ لَدَيۡهِمۡ إِذۡ أَجۡمَعُوٓاْ أَمۡرَهُمۡ وَهُمۡ يَمۡكُرُونَ﴾

"এগুলো গায়েবের সংবাদ, যা আমি তোমার কাছে ওহী করছি। তুমি তো তাদের নিকট ছিলে না যখন তারা তাদের সিদ্ধান্তে একমত হয়েছিল অথচ তারা ষড়যন্ত্র করছিল।" (সূরা ইউসুফ ১২ : ১০২)

আল্লাহ মাসজিদুল হারাম হতে মাসজিদুল আকসা পর্যন্ত রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম -এর ভ্রমণ সম্পর্কে বলেন-

﴿سُبۡحَٰنَ ٱلَّذِيٓ أَسۡرَىٰ بِعَبۡدِهِۦ لَيۡلٗا مِّنَ ٱلۡمَسۡجِدِ ٱلۡحَرَامِ إِلَى ٱلۡمَسۡجِدِ ٱلۡأَقۡصَا ٱلَّذِي بَٰرَكۡنَا حَوۡلَهُۥ لِنُرِيَهُۥ مِنۡ ءَايَٰتِنَآۚ إِنَّهُۥ هُوَ ٱلسَّمِيعُ ٱلۡبَصِيرُ﴾

পবিত্র মহান সে সত্তা, যিনি তাঁর বান্দাকে রাতে নিয়ে গিয়েছেন আল মাসজিদুল হারাম থেকে আল মাসজিদুল আকসা পর্যন্ত, যার আশপাশে আমি বরকত দিয়েছি, যেন আমি তাকে আমার কিছু নিদর্শন দেখাতে পারি। তিনিই সর্বশ্রোতা, সর্বদ্রষ্টা। "(সূরা আল ইসরা ১৭ : ১)

অর্থাৎ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হাজির-নাযির হতেন তবে, মাসজিদুল হারাম হতে মাসজিদুল আকসা পর্যন্ত ভ্রমনের তাঁর কোনো প্রয়োজন ছিল না। তিনি সেখানে উপস্থিতই থাকতেন।

আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿إِلَّا تَنصُرُوهُ فَقَدۡ نَصَرَهُ ٱللَّهُ إِذۡ أَخۡرَجَهُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ ثَانِيَ ٱثۡنَيۡنِ إِذۡ هُمَا فِي ٱلۡغَارِ إِذۡ يَقُولُ لِصَٰحِبِهِۦ لَا تَحۡزَنۡ إِنَّ ٱللَّهَ مَعَنَاۖ فَأَنزَلَ ٱللَّهُ سَكِينَتَهُۥ عَلَيۡهِ

وَأَيَّدَهُۥ بِجُنُودٍ لَّمۡ تَرَوۡهَا وَجَعَلَ كَلِمَةَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ ٱلسُّفۡلَىٰۗ وَكَلِمَةُ ٱللَّهِ هِيَ ٱلۡعُلۡيَاۗ وَٱللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ﴾

"যদি তোমরা তাকে সাহায্য না কর, তবে আল্লাহ তাকে সাহায্য করেছেন যখন কাফিররা তাকে বের করে দিল, সে ছিল দু'জনের দ্বিতীয়জন। যখন তারা উভয়ে পাহাড়ের একটি গুহায় অবস্থান করছিল, সে তার সঙ্গীকে বলল, 'তুমি পেরেশান হয়ো না, নিশ্চয় আল্লাহ আমাদের সাথে আছেন'। অতঃপর আল্লাহ তার উপর তাঁর পক্ষ থেকে প্রশান্তি নাযিল করলেন এবং তাকে এমন এক সৈন্য বাহিনী দ্বারা সাহায্য করলেন যাদেরকে তোমরা দেখনি এবং তিনি কাফিরদের বাণী অতি নিচু করে দিলেন। আর আল্লাহর বাণীই সুউচ্চ। আর আল্লাহ পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাবান।" (সূরা আত তাওবা ৯ : ৪০)

﴿وَلَقَدۡ نَصَرَكُمُ ٱللَّهُ بِبَدۡرٍ وَأَنتُمۡ أَذِلَّةٞۖ فَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ لَعَلَّكُمۡ تَشۡكُرُونَ﴾

"আর অবশ্যই আল্লাহ তোমাদেরকে বদরে সাহায্য করেছেন অথচ তোমরা ছিলে হীনবল। অতএব তোমরা আল্লাহকে ভয় কর, আশা করা যায়, তোমরা শোকরগুজার হবে।" (সূরা আলে ইমরান ৩ : ১২৩)

﴿إِذۡ أَنتُم بِٱلۡعُدۡوَةِ ٱلدُّنۡيَا وَهُم بِٱلۡعُدۡوَةِ ٱلۡقُصۡوَىٰ وَٱلرَّكۡبُ أَسۡفَلَ مِنكُمۡۚ وَلَوۡ تَوَاعَدتُّمۡ لَٱخۡتَلَفۡتُمۡ فِي ٱلۡمِيعَٰدِ وَلَٰكِن لِّيَقۡضِيَ ٱللَّهُ أَمۡرٗا كَانَ مَفۡعُولٗا لِّيَهۡلِكَ مَنۡ هَلَكَ عَنۢ بَيِّنَةٖ وَيَحۡيَىٰ مَنۡ حَيَّ عَنۢ بَيِّنَةٖۗ وَإِنَّ ٱللَّهَ لَسَمِيعٌ عَلِيمٌ﴾

"যখন তোমরা ছিলে নিকটবর্তী প্রান্তরে, আর তারা ছিল দূরবর্তী প্রান্তরে এবং কাফেলা ছিল তোমাদের চেয়ে নিম্নভূমিতে, আর যদি তোমরা পরস্পর ওয়াদাবদ্ধ হতে, (যুদ্ধে মুখোমুখি হওয়ার ব্যাপারে) তাহলে অবশ্যই সে ওয়াদার ক্ষেত্রে তোমরা মতবিরোধ করতে, কিন্তু আল্লাহ (তাদেরকে একত্র করেছেন) যাতে সম্পন্ন করেন এমন কাজ যা হওয়ারই ছিল, যে ধ্বংস হওয়ার সে যাতে সুস্পষ্ট প্রমাণ পাওয়ার পর ধ্বংস হয়, আর যে জীবিত থাকার সে যাতে সুস্পষ্ট প্রমাণ পাওয়ার পর বেঁচে থাকে, আর নিশ্চয় আল্লাহ সর্বশ্রোতা, সর্বজ্ঞ।" (সূরা আনফাল ৮: ৪২)

﴿لَّقَدۡ رَضِيَ ٱللَّهُ عَنِ ٱلۡمُؤۡمِنِينَ إِذۡ يُبَايِعُونَكَ تَحۡتَ ٱلشَّجَرَةِ فَعَلِمَ مَا فِي قُلُوبِهِمۡ فَأَنزَلَ ٱلسَّكِينَةَ عَلَيۡهِمۡ وَأَثَٰبَهُمۡ فَتۡحٗا قَرِيبٗا﴾

"অবশ্যই আল্লাহ মুমিনদের উপর সন্তুষ্ট হয়েছেন, যখন তারা গাছের নিচে আপনার হাতে বাই'আত গ্রহণ করেছিল; অতঃপর তিনি তাদের অন্তরে কি ছিল তা জেনে নিয়েছেন, ফলে তাদের উপর প্রশান্তি নাযিল করলেন এবং তাদেরকে পুরস্কৃত করলেন নিকটবর্তী বিজয় দিয়ে।" (সূরা আল ফাতহ ৪৮ : ১৮)

﴿لَّقَدْ صَدَقَ ٱللَّهُ رَسُولَهُ ٱلرُّءْيَا بِٱلْحَقِّ ۖ لَتَدْخُلُنَّ ٱلْمَسْجِدَ ٱلْحَرَامَ إِن شَآءَ ٱللَّهُ ءَامِنِينَ مُحَلِّقِينَ رُءُوسَكُمْ وَمُقَصِّرِينَ لَا تَخَافُونَ ۖ فَعَلِمَ مَا لَمْ تَعْلَمُوا۟ فَجَعَلَ مِن دُونِ ذَٰلِكَ فَتْحًا قَرِيبًا﴾

"অবশ্যই আল্লাহ তাঁর রাসূলকে স্বপ্নটি যথাযথভাবে সত্যে পরিণত করে দিয়েছেন। তোমরা ইনশাআল্লাহ নিরাপদে তোমাদের মাথা মুণ্ডন করে এবং চুল ছেঁটে নির্ভয়ে আল-মাসজিদুল হারামে অবশ্যই প্রবেশ করবে। অতঃপর আল্লাহ জেনেছেন যা তোমরা জানতে না। সুতরাং এ ছাড়াও তিনি দিলেন এক নিকটবর্তী বিজয়। "(সূরা আল ফাতহ ৪৮ : ২৭)

এ সকল আয়াত প্রমাণ করে যে, কোনো এক ব্যক্তির জন্য একই সময়ে একাধিক স্থানে উপস্থিত থাকার আকীদা সঠিক নয়। কুরআনের আয়াতের অর্থ এসকল অনৈসলামী মতবাদের বিরোধিতা করে। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এবং তাঁর সাহাবাগণের প্রত্যেক্যের একটি করে সত্তা ছিল। (অর্থাৎ একই সময়ে তারা কেবল একটি স্থানে উপস্থিত থাকতে পারতেন।) এবং যখন তারা মদীনায় উপস্থিত ছিলেন, তখন বদরে উপস্থিত ছিলেন না, তা না হলে বদরের দিকে যাত্রা করা অর্থহীন হয়ে যায়। অনুরূপভাবে, মক্কা বিজয় হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত তারা মক্কায় উপস্থিত ছিলেন না (যখন তারা মদীনাতেও উপস্থিত ছিলেন)।

এ আয়াত ছাড়াও বাস্তবতা ও প্রকৃত ঘটনাবলিও তাদের আকীদাকে বাতিল করে দেয়। যখন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর হুজরায় অবস্থান করতেন তখন তিনি মসজিদে হাজির থাকতেন না, তাই সাহাবীগণ তাঁর জন্য (মসজিদে) অপেক্ষা করতেন। তিনি যদি সর্বত্র হাজির-নাযির হতেন তবে তাঁর সাহাবীগণের তাঁর জন্য অপেক্ষা করার কোনো অর্থ থাকে না। অনুরূপ, তিনি যখন মদীনায় ছিলেন তখন তিনি হুনায়নে হাজির ছিলেন না। যখন তাবুকে হাজির ছিলেন তখন তিনি মদীনায় হাজির ছিলেন না এবং যখন আরাফায় ছিলেন, তখন তিনি মদীনায় বা মক্কায় হাজির ছিলেন না।

এ সকল আয়াত ও স্পষ্ট ও প্রকাশ্য ঘটনাবলিকে পাশ কাটিয়ে বেরেলভীগণ এ আকীদা পোষণ করে যে, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সব সময় সকল স্থানে উপস্থিত (হাজির)।[৩১৮]

সে আরও বলেছে, "রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আল্লাহকে জানেন এবং সকল অস্তিত্বশীল বিষয়ের এবং সকল সৃষ্টি সম্পর্কে পূর্ণাঙ্গ ও চূড়ান্ত জ্ঞান তাঁর রয়েছে। অতীত বা ভবিষ্যতের অবস্থাবলির কোনো কিছুই তাঁর থেকে লুকায়িত নয়।"[৩১৯]

সে অন্যত্র লিখেছে, "রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর মুবারক চোখে সারা বিশ্ব দেখেন (নাযির)।"[৩২০]

জনাব বেরেলভী লিখেছে, "রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কারো কাছ থেকে দূরে নন, আর না তিনি অনবহিত।"[৩২১]

সে আরো লিখেছে, "রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম -এর জীবন ও মৃত্যুর মাঝে কোনো পার্থক্য নেই, (তা বোঝা যায়) এঘটনা থেকে যে, তিনি তাঁর উম্মাতকে দেখছেন এবং তিনি (তাদের) অবস্থাসমূহ, অভিপ্রায়, পরিকল্পনা এবং তাদের অন্তরের ভীতিকেও চিনতে পারেন এবং এ সবকিছু তাঁর নিকট (উজ্জ্বল ও) স্পষ্ট এবং এর মধ্যে কোনো কিছুই (তাঁর নিকট) গোপন নেই।"[৩২২]

সে অন্যত্র লিখেছে, "রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হাজির ও নাযির। তিনি পৃথিবীতে যা ঘটছে এবং যা ঘটবে, তা তিনি লক্ষ্য করেন (দেখেন)। তিনি সকল স্থানে হাজির (উপস্থিত) আছেন এবং তিনি সকল কিছু দেখেন।"[৩২৩]

শুধু নবীগণ ও ওলীগণই রুবুবিয়াতের এ সিফাতে (গুণাবলিতে) শরীক নয়, বরং বেরেলভীদের আহমাদ রেযা স্বয়ং এ বিষয়ে শরীক। যেমন-

---

[৩১৮] তাসকীন আল খাওয়াতির ফী মাসআলাতিল হাজির ওয়ান নাযির, আহমাদ সাঈদ কাজমী, পৃ-৫।

[৩১৯] প্রাগুক্ত, পৃ-৩৯।

[৩২০] প্রাগুক্ত, পৃ-৯০।

[৩২১] খালিসুল ইতিকাদ, পৃ-৩৯।

[৩২২] প্রাগুক্ত, পৃ-৪৬।

[৩২৩] প্রাগুক্ত, পৃ-৪৬

তার এক অনুসারী লিখেছে, " আহমাদ রেযা বেরেলভী আজও আমাদের মাঝে হাজির। তিনি আসতে পারেন এবং আমাদের সাহায্য করতে পারেন।"[৩২৪]

এ হলো বেরেলভীদের আকীদা ও চিন্তাধারাসমূহ যার ধর্মের বা বিবেক-বুদ্ধির সাথে কোনো সম্পর্ক নেই।

আল্লাহর দীন বিবেক-বুদ্ধি ও প্রকৃতিগত স্বভাবের সাথে পরিপূর্ণভাবে সামঞ্জস্যপূর্ণ। আল্লাহ তা'আলা বলেন-

﴿قُلۡ هَٰذِهِۦ سَبِيلِيٓ أَدۡعُوٓاْ إِلَى ٱللَّهِۚ عَلَىٰ بَصِيرَةٍ أَنَا۠ وَمَنِ ٱتَّبَعَنِيۖ وَسُبۡحَٰنَ ٱللَّهِ وَمَآ أَنَا۠ مِنَ ٱلۡمُشۡرِكِينَ﴾

"বল, 'এটা আমার পথ। আমি জেনে-বুঝে আল্লাহর দিকে দাওয়াত দেই এবং যারা আমার অনুসরণ করেছে তারাও। আর আল্লাহ পবিত্র মহান এবং আমি মুশরিকদের অন্তর্ভুক্ত নই'।" (সূরা ইউসুফ ১২: ১০৮)

﴿وَأَنَّ هَٰذَا صِرَٰطِي مُسۡتَقِيمٗا فَٱتَّبِعُوهُۖ وَلَا تَتَّبِعُواْ ٱلسُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمۡ عَن سَبِيلِهِۦۚ ذَٰلِكُمۡ وَصَّىٰكُم بِهِۦ لَعَلَّكُمۡ تَتَّقُونَ﴾

"আর এটি তো আমার সোজা পথ। সুতরাং তোমরা তার অনুসরণ কর এবং অন্যান্য পথ অনুসরণ করো না, তাহলে তা তোমাদেরকে তাঁর পথ থেকে বিচ্ছিন্ন করে দেবে। এগুলো তিনি তোমাদেরকে নির্দেশ দিয়েছেন, যাতে তোমরা তাকওয়া অবলম্বন কর।" (সূরা আল আনআম ৬ : ১৫৩)

﴿أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ ٱلۡقُرۡءَانَ أَمۡ عَلَىٰ قُلُوبٍ أَقۡفَالُهَآ﴾

"তবে কি তারা কুরআন নিয়ে গভীর চিন্তা– ভাবনা করে না? নাকি তাদের অন্তরসমূহে তালা রয়েছে? " (সূরা মুহাম্মদ ৪৭ : ২৪)

এমন কেউ আছে কি যে বিবেক-বিবেচনা করবে, যে চিন্তা-ভাবনা করবে এবং এমন কেউ আছে কি যে বিচার-বিবেচনা করবে, যে ফিরে আসবে?

তাদের আকীদা -বিশ্বাস এবং কুরআন-সুন্নাহর মাঝে এত বেশি বৈপরীত্য ও অসঙ্গতির পর, অস্বীকার করার আর কোনো সুযোগ নেই যে, আল্লাহর

---

[৩২৪] আনওয়ার রেযা, পৃ-২৪৬।

শরীয়াত এবং বেরেলভীদের তরীকা এবং আকীদা সম্পূর্ণ আলাদা। এতদুভয়ের মাঝে কোনো মিল নেই। আল্লাহ সকলকে হেদায়েত লাভের তৌফিক দান করুন। আমীন।

তৃতীয় অধ্যায়

বেরেলভী মতবাদ ও তাদের শিক্ষা

১. বেরেলভীদের শিক্ষা:

যেহেতু বেরেলভীদের নির্দিষ্ট কিছু বিশেষ বিশেষ আকীদা-বিশ্বাস রয়েছে, তাই তাদের বিশেষ বিশেষ শিক্ষা রয়েছে যেগুলো যুক্তি-তর্ক, জীবিকা উপার্জন এবং পানাহারকে কেন্দ্র করে আবর্তিত হয়।

বেরেলভী মতবাদে অনেক মাসায়ালাই প্রণীত হয়েছে কেবল সরলমনা সাধারণ মুসলিমদেরকে ফাঁদে ফেলা এবং পানাহারের ব্যবসা প্রতিষ্ঠিত করার উদ্দেশ্যে।

বেরেলভী মোল্লারা নতুনভাবে প্রণীত বিদআতী মাসয়ালা-মাসায়িল ও নতুন নতুন বিদআত প্রবর্তন করেছে এবং ধর্মকে এমন একটি লাভজনক ব্যবসায় পরিণত করেছে যাতে কোনো রকম প্রাথমিক বিনিয়োগের প্রয়োজন না পড়ে।

(১) বেরেলভীগণ কবরের উপর গম্বুজ নির্মাণের নির্দেশ দিয়েছে এবং নিজেদেরকে সেগুলোর রক্ষক বানিয়েছে।

(২) মানতের নামে অজ্ঞ-জাহিল জনসাধারণ তাদেরকে রাশি রাশি অর্থ-সম্পদের ভাণ্ডার দান করেছে। তারা এসব সঞ্চয় করা শুরু করল এবং ধনী ও সম্পদশালীদের মধ্যে পরিগণিত হতে আরম্ভ করল। এ সকল লোকেরা যারা দরীদ্রদের রক্ত চুষে নেয় এবং যারা মানত হিসেবে প্রদত্ত সম্পদের উপর জীবন ধারণ করে, তারাই ধর্ম ব্যবসায়ী এবং দুনিয়াদার।

কোনো সমাজকে ততক্ষণ পর্যন্ত ইসলামী সমাজ বলা যায় না, যতক্ষণ তারা আল্লাহর তাওহীদ (একত্ব) সম্পর্কে অবহিত না থাকে। যতক্ষণ পর্যন্ত পাকিস্তানে শালীনতাবোধ ও সম্ভ্রম বর্জিত শিরক-বিদআতের এসব আখড়াসমূহ এবং এগুলোর রক্ষকরা বহাল থাকবে, ততক্ষণ পর্যন্ত ইসলামী (শাসন) ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার স্বপ্ন বাস্তবায়িত হতে পারে না।

এ সকল লোভী পীর ও মাশায়েখ, যাদের দৃষ্টি থাকে তাদের মুরীদগণের পকেটের দিকে, তারা যতক্ষণ পর্যন্ত একজন মানুষকে অপর মানুষের দাসত্বের নসীহত করতে থাকবে ততক্ষণ পর্যন্ত আমাদের সমাজ তাওহীদের মহিমা ও গৌরবের সাথে পরিচিত হবে না এবং যতক্ষণ পর্যন্ত কোনো সমাজের উপর

তাওহীদের দাবি প্রতিষ্ঠিত না হবে, ততক্ষণ পর্যন্ত নাস্তিকতা-ধর্মহীনতা ও ধর্ম সম্পর্কে অজ্ঞতার চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা করা সম্ভব হবে না।

নাস্তিকতা-ধর্মহীনতা এবং ধর্মীয় অজ্ঞতাকে রুখতে হলে মানবজাতির দাসত্বের শৃংখল ছিন্নভিন্ন করে দিতে হবে এবং সমাজের লোকেদের কাছে তাওহীদ প্রচার-প্রসার করতে হবে।

(৩) হায় আল্লাহ! কাওয়ালীর নামে ঢাক-ঢোলের তালে তালে নাচা, নাচার সময় মৃতদের নিকট সকাতর প্রার্থনা করা ও অনৈতিক কর্ম করা এবং সবুজ গিলাফের প্রান্তসমূহ ধরার সময় যাচনা করা এবং একে কবরের উপর চড়ানো, হাস্যকর ও মিথ্যা (বানোয়াট) কিচ্ছা-কাহিনীসমূহকে কারামত নামে চালানো এবং খানাপিনার জন্য উরসের মত বিদআতী প্রথার প্রবর্তন তারা করেছে!! যখন যুব প্রজন্ম ভাবে যে, এটাই ধর্ম তখন তারা কুফরীর ও ধর্ম সম্পর্কে অজ্ঞতার জালের শিকারে পরিণত হয়।

(৪) পরিত্যক্ত হোক এ সকল মোল্লা ও পীরেরা যারা ধর্মের নামে দুনিয়াবী ব্যবসায় নিজেদেরকে নিয়োজিত রাখে এবং ধর্মের সীমালংঘন করে। কবরপূজার এ লজ্জা, এ সকল বাৎসরিক উৎসব ও মেলা, একাদশী, কুলখানী, চল্লিশা পালন ইসলামের সাথে এসকল কর্মের কোনো দূরতম সম্পর্কও নেই। এসব কেবল দুনিয়ার ধন-সম্পদ কামাইয়ের হীন উপায় মাত্র। কিন্তু এ সকল বাতিনী পীর মাশায়েখদেরকে কে বোঝাবে!

এসকল লোকেরা সাধারণ মানুষদের চোখ বেঁধে দেয় যাতে তারা দেখতে না পায় এবং দুনিয়াতে তাদেরকে অসম্মানিত করে এবং তাদের আখিরাতও ধ্বংস করে।

(৫) যারা তাদেরকে এ সকল কাজ-কর্ম থেকে বিরত রাখতে চায় তাদেরকে এরা ঠাট্টা-বিদ্রূপ করে এবং ওয়াহাবী ও ওলীগণের অসম্মানকারী বলে ডাকে। তাদের কিতাবাদি পড়া[৩২৫] ও তাদের সঙ্গে উঠা-বসা করা[৩২৬] কে তারা অপরাধ বলে গণ্য করে, উদ্দেশ্য হলো লোকেরা যেন তাদের বক্তব্য ও উপদেশ দ্বারা প্রভাবিত হতে না পারে এবং সঠিক পথ চিনতে না পারে এবং তাদের ব্যবসা ক্ষতিগ্রস্ত না হয়!

---

[৩২৫] ফতোয়া রিযভীয়্যাহ, আহমাদ রেযা বেরেলভী, ৪র্থ খণ্ড, পৃ-৫৪ দ্র.।

[৩২৬] মাহি আদ-দালালাহ ফী ফতোয়া রিযভীয়্যাহ, আহমাদ রেযা বেরেলভী, ৫ম খণ্ড, পৃ-৮৯ দ্র.।

চলুন, এখন বেরেলভীদের শিক্ষা ও উপদেশ বিশ্লেষণ করি এবং সেগুলোকে কুরআন, সুন্নাহ এবং হানাফী ফিকহের মানদণ্ডে বিচার করি যেন জানা যায় যে, কুরআন-সুন্নাহ কিংবা হানাফী ফিকহের সাথে তাদের ধ্যান-ধারণা ও শিক্ষার কোনো সম্পর্ক নেই।

২. কবর পাকা করা ও তার উপর গম্বুজ নির্মাণ করা:

আহমদ ইয়ার গুজরাটী লিখেছে: "মৃত ব্যক্তির সম্মানে তাদের কবর পাকা করা বা কবরের উপর নির্মাণকার্য করা শরীয়াতে জায়েয।"[৩২৭]

আবার, "আলিম, আউলিয়া এবং নেককারগণের কবরের উপর সৌধ নির্মাণ জায়েয, যদি তাদের উদ্দেশ্য থাকে লোকদের নিকট তাদের সম্মান ও মর্যাদা বৃদ্ধি করা এবং যাতে কবরবাসীকে লোকেরা হীন মনে না করে।"[৩২৮]

যেখানে পরিষ্কার নিষেধাজ্ঞার হাদীস রয়েছে: জাবির (রাদিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত।

نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَنْ يُجَصَّصَ الْقَبْرُ. وَأَنْ يُقْعَدَ عَلَيْهِ. وَأَنْ يُبْنَى عَلَيْهِ.

"রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কবর চিহ্নিত করতে, কবর বাঁধাতে এবং কবরের উপর সৌধ বা গম্বুজ নির্মাণ করতে নিষেধ করেছেন।" (মুসলিম, কিতাবুল জানাইয, হা/৯৭০, তিরমিযী, হা/১০৫২; নাসাঈ, হা/২০২৭-২০৩১ (আলবানী, সহীহ সুনানে নাসাঈ); ইবনু মাজাহ, হা/১৫৫৩)

অনুরূপভাবে, আবুল হায়াজ আল আসাদী বলেন,

قَالَ لِي عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ: أَلَا أَبْعَثُكَ عَلَى مَا بَعَثَنِي عَلَيْهِ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم؟ أَنْ لَا تَدَعَ تِمْثَالًا إِلَّا طَمَسْتَهُ. وَلَا قَبْرًا مُشْرِفًا إِلَّا سَوَّيْتَهُ.

আলী ইবনু আবী তালিব আমাকে বলেন, আমি কি তোমাকে এমন কাজে পাঠাব না, যে কাজে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাকে পাঠিয়েছিলেন? তা হচ্ছে, কোনো ছবি দেখলে চুর্ণ-বিচুর্ণ না করে ছাড়বে না,

[৩২৭] জা আল-হাক্ব, আহমদ ইয়ার, পৃ-২৮২।

[৩২৮] প্রাগুক্ত, পৃ-২৮৫।

উঁচু কবরকে সমান না করে ছাড়বে না।" (সহীহ মুসলিম, কিতাবুল জানাইয, হা/৯৬৯, নাসাঈ, হা/২০৩১।)

حَدَّثَنِى عمرُو بنُ الحارِثِ أَنَّ أَبا عليٍّ الهَمْدانِيَّ حَدَّثَه قال: كُنا عِندَ فَضالَةَ بنِ عُبَيدٍ برُوذِسَ بأَرضِ الرُّومِ، فتوُفِّيَ صاحِبٌ لَنا، فأَمَرَ فَضالَةُ بقَبرِه فسوِّيَ ثُمَّ قال: سَمِعتُ رسولَ اللَّهِ -صلي الله عليه وسلم- يأمُرُ بتَسويَتِها.

আমর বিন হারিস সামামাহ হতে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেন: আমাদের একসাথী রোমে মৃত্যুবরণ করেন। তাই ফুযালাহ বিন উবায়দ (রাদিয়াল্লাহু আনহু) কবরকে মাটি সমান করে দেওয়ার নির্দেশ দেন এবং বলেন যে, তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে এ নির্দেশ দান করতে শুনেছেন।" (মুসলিম, ৯২ (৯৬); নাসাঈ, হা/২০৩০; আলবানী, সহীহ সুনানে নাসাঈ)।

৩. কবর পাকা করা ও তাতে গম্বুজ নির্মাণ করার ব্যাপারে হানাফী ফকীহদের মত

হানাফী মাযহাবের ইমামগণ কবর পাকা করা ও তাতে গম্বুজ নির্মাণ করার ব্যাপারে যা বলেছেন। ইমাম মুহাম্মদ ইবনে আল হাসান আশ শাইবানী ইমাম আবু হানীফা হতে বর্ণনা করেছেন, আবু হানীফার নিকট তার শায়খ নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হতে মারফু সূত্রে বর্ণনা করেন:

নিশ্চয় নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম, "কবরকে পাকা করতে নিষেধ করেছেন।"[৩২৯]

ইমাম মুহাম্মদ ইবনে আল হাসান আশ শাইবানীকে জিজ্ঞাসা করা হলো, কবরকে পাকা করা না-জায়েয (নিষিদ্ধ) কি-না। তিনি 'হ্যাঁ' সূচক জবাব দিয়েছিলেন।"[৩৩০]

ইমাম সারাখসী তার আল-মাবসুত কিতাবে বলেন: "কবরের নিজস্ব মাটি ছাড়া বাড়তি কিছু (মাটি, সিমেন্ট, পাথর) দ্বারা কবর মজবুত করোনা, কারণ এর নিষেধাজ্ঞা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হতে প্রমাণিত।"[৩৩১]

---

[৩২৯] কিতাবুল আসার, ইমাম মুহাম্মদ।

[৩৩০] কিতাবুল আসল, ইমাম মুহাম্মদ, ১ম খণ্ড, পৃ-৪২২।

[৩৩১] আল মাবসুত, ইমাম সারাখসী, ২য় খণ্ড, পৃ-২৬।

কাজী খাঁন তাঁর "ফতোয়া"-তে বলেন: "কবরসমূহকে মজবুত করা উচিত নয় এবং এগুলোর উপর গম্বুজ বা কোনো ভবন নির্মাণ করা উচিত নয় কারণ আবু হানীফা হতে এর নিষেধাজ্ঞা বর্ণিত হয়েছে।"[৩৩২]

ইমাম কাসানী বলেন: "কবরসমূহকে মজবুত করা নিন্দনীয় এবং ইমাম আবু হানীফা কবরসমূহের উপর গম্বুজ বা অনুরূপ কোনো সৌধ নির্মাণ করাকে নিন্দনীয় (মাকরূহ) মনে করতেন। এতে সম্পদের অপচয় রয়েছে। কিন্তু কবরের উপর পানি ছিটানোয় কোনো দোষ নেই; কিন্তু আবু ইউসুফ হতে কবরের উপর পানি ছিটানোও মাকরূহ বর্ণিত হয়েছে। কারণ এর কারণে কবর মজবুত হয়।"[৩৩৩]

অনুরূপ কথাই বর্ণিত আছে হানাফী ফিকহের সর্বজন মান্য কিতাবসমূহে। যেমন- বাহরুর রায়েক (২য় খণ্ড, পৃ-২০৯), বাদায়ে' ওয়াস সানায়ে' (১ম খণ্ড, পৃ-৩২০), ফতহুল কাদীর (১ম খণ্ড, পৃ-৪৭২), রদ্দুল মুহতার আলা দুররুল

মুখতার, (১ম খণ্ড, পৃ-২০১), ফতোয়া হিন্দিয়া (১ম খণ্ড, পৃ-১২২) ও ফতোয়া বাযযাযিয়া (৪র্থ খণ্ড, পৃ-৮১) ও কানযুদ দাকায়েক (পৃ-৫০) এবং অন্যান্য।

কাজী ইবরাহীম হানাফী বলেন: যে সকল গম্বুজ কবরের উপর নির্মাণ করা হয়েছে, সেগুলো সমান করে দেওয়া ওয়াজিব। কারণ তারা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের বিরোধিতা এবং অবাধ্যতা করে সেগুলো নির্মাণ করেছে এবং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের অবাধ্যতা করে যে সকল নির্মাণ কার্য সম্পাদন করা হয়েছে, তা সমান করে (মাটির সাথে মিশিয়ে) দেয়া 'মসজিদে যিরার' সমান করে দেওয়ার চেয়ে অধিক গুরুত্বপূর্ণ।"[৩৩৪]

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন:

"ইহুদী ও খৃষ্টানদের প্রতি লা'নত, তারা তাদের নবীগণের কবরকে মসজিদ (সিজদার স্থান) বানিয়েছে।" (সহীহ বুখারী, কিতাবুল জানাইয, হা/৪৩৫-৪৩৬; সহীহ মুসলিম, কিতাবুল মাসাজিদ, হা/৫৩১; সুনানে নাসাঈ, হা/২০৫১)।

[৩৩২] ফতোয়া কাজী খাঁন, ১ম খণ্ড, পৃ-১৯৪।

[৩৩৩] বাদায়ে' ওয়াস সানায়ে', আল্লামা কাসানী, ১ম খণ্ড, পৃ-৩২০।

[৩৩৪] মাজালিসুল আবরার, কাজী ইবরাহীম, পৃ-১২৯।

এ হলো কুরআন সুন্নাহর এবং হানাফী ফিকহের পরিষ্কার বক্তব্য। কিন্তু বেরেলভীগণ জোরেশোরে প্রচার করে যে, কবর বাঁধাই করা এবং এর উপর গম্বুজ/সৌধ নির্মাণ করা জরুরী।

জনাব আহমাদ রেযা খান বেরেলভী বলে: "গম্বুজ নির্মাণ এবং অনুরূপ অবকাঠামো নির্মাণ জরুরী যেন সাধারণ কবরসমূহ হতে মুবারক কবরসমূহকে আলাদা করা যায় এবং লোকেরা সেগুলোর প্রতি সম্মান-মর্যাদা দেয় এবং তাজিম করে।"[৩৩৫]

৪. কবরকে কাপড় ও পাগড়ী দিয়ে ঢেকে দেওয়া

"যদি লোকেরা একটি কবরের উপর কাপড় দেখে, তবে তাদের মনে করা উচিত এটি কোনো ওলীর কবর এবং একে ঘৃণা করা হতে লোকদের বিরত থাকা উচিত যেন অমনোযোগী কবর যিয়ারতকারীর মনে বিনয় ও সম্মান মর্যাদা জাগ্রত হয় এবং আমরা ইতোমধ্যে উল্লেখ করেছি,যে, আউলিয়াগণের রূহ মুবারক তাদের কবরসমূহের নিকট উপস্থিত থাকে। অতএব এটি জায়েয প্রথা এবং এ থেকে নিষেধ করা উচিত নয়।"[৩৩৬]

সে আরও লিখেছে: "কবরের সম্মানের উদ্দেশ্যে বাতি জ্বালানো জায়েয যদি সেটি কোনো ওলী বা আলিমের কবর হয়, যাতে তার রুহকে সম্মান করা যায় যা পৃথিবীর ধুলিকণাকে সুর্য্যের আলোর মাধ্যমে আলোকিত করে যেন লোকেরা জানতে পারে এটি কোনো নেককার লোকের কবর যাতে তারা এ থেকে উপকার লাভ করতে পারে।"[৩৩৭]

৫. কবরে মোমবাতি ও আগরবাতি জ্বালানো

অপর বেরেলভী আলিম লিখেছে: "যদি কোথাও একজন ওলীর কবর থাকে, তবে তার রূহের সম্মানের জন্য এবং এ কবর যে একজন ওলীর তা ঘোষণা করার জন্য এর নিকট বাতি জ্বালানো জায়েয যাতে লোকেরা এর ফায়েয থেকে উপকৃত হতে পারে।"[৩৩৮]

---

[৩৩৫] আহকামে শরীয়াত, আল-বেরেলভী, ১ম খণ্ড, পৃ-৭১।

[৩৩৬] আহকামে শরীয়াত, আল-বেরেলভী, ১ম খণ্ড, পৃ-৭১-৭২।

[৩৩৭] বারিক আল মানার বিশুমুউল মাজার, ফতোয়া রিযভীয়্যাহ, ৪র্থ খণ্ড, পৃ-১৪৪-১৪৫।

[৩৩৮] জা আল-হাক্ব, আহমদ ইয়ার গুজরাটী, পৃ-৩০০।

এ হলো বেরেলভী আকাবীরগণের ফতোয়া। কিন্তু হাদীসে এর পরিষ্কার নিষেধাজ্ঞা রয়েছে। আব্দুল্লাহ বিন আব্বাস (রাদিয়াল্লাহু আনহুমা) হতে বর্ণিত যে,

لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم زائرات القبور والمتخذين عليها المساجد والسرج.

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম লানত করেছেন সেই সকল নারীদেরকে যারা কবর যিয়ারত করে এবং সেই সকল লোকদেরকে যারা কবরসমূহের উপর (গম্বুজ) নির্মাণ করে এবং তাদেরকে যারা কবরের উপর বাতি/মোমবাতি জ্বালায়।" [যঈফ: আবু দাউদ, হা/৩২৩৬; নাসাঈ, হা/২০৪৩; তিরমিযী, হা/৩২০।]

৬. হানাফী ফিকহের শিক্ষা

মোল্লা আলী কারী হানাফী লিখেছেন: "কবরের উপর বাতি জ্বালানোর নিষেধাজ্ঞা এসেছে কারণ তা সম্পদের অপচয় এবং কারণ এতে জাহান্নামের আগুনের নিদর্শন (চিহ্ন) রয়েছে এবং এতে রয়েছে কবরকে সম্মান প্রদর্শন।"[৩৩৯]

কাজী ইবরাহীম কবর পূজারীদের ভিত্তি উল্লেখ করে বলেন: "আজকাল কিছু পথভ্রষ্ট লোকেরা (বেরেলভী ও তার অনুসারী অন্যান্য সুফীরা) কবরে হাজ্জ সম্পাদন করতে শুরু করেছে এবং এর জন্য বিধি-বিধান প্রনয়ণ করেছে। সেই সকল বিষয় যা দীন ও শরীয়াতের বিরুদ্ধে যায়, এদের মধ্যে রয়েছে যেমন- লোকেরা তাদের অসহায়ত্ব, ও দীনতা কবরের নিকট প্রকাশ করে এবং তার উপর বাতি জ্বালায়, কবরে চাদর চড়ায়, প্রহরী নিয়োগ করে, সেগুলো চুম্বন করে এবং তাদের নিকট জীবিকা ও সন্তান চায়... এসকল বিষয়ের কোনোটিই আলিমগণের ইজমা অনুসারে জায়েয নয়।"[৩৪০]

আহমাদ ইয়ার নিজেও "ফতোয়া আলমগীরী" হতে উদ্ধৃত করেছে: "কবরের উপর বাতি জ্বালানো একটি বিদআত। এটি ভিত্তিহীন।"

অনুরূপভাবে "ফতোয়া বায্যাযিয়াতে উল্লেখ করা হয়েছে: "কবরস্থানে বাতি নিয়ে যাওয়া বিদআত। এর কোনো ভিত্তি নেই।"[৩৪১]

---

[৩৩৯] মিরকাত, মোল্লা আলী কারী, ১ম খণ্ড, পৃ-৪৭০।

[৩৪০] মাজালিসুল আবরার, কাজী ইবরাহীম, পৃ-১১৮।

[৩৪১] জা আল-হাক্ক, পৃ-৩০২।

ইবনু আবিদীন শামী বলেন, "কবরে তেল বা বাতি দেওয়ার নযর মানত করা বাতিল।"[৩৪২]

আল্লামা হাসকাফী আল হানাফী বলেন: "নযর নিয়ায এবং মানত হিসেবে কবরসমূহের নিকট সাধারণ লোকেরা যা নিয়ে যায় তা নগদ অর্থ হোক কিংবা তেল হোক, এর উপর ফতোয়া হলো, তা বাতিল এবং নিষিদ্ধ।[৩৪৩]

ফতোয়া আলমগীরী' তে উল্লেখ করা হয়েছে: "কবরকে আলোকিত করা হলো জাহেলী প্রথার অন্তর্ভুক্ত।"[৩৪৪]

আল্লামা আলুসী আল-হানাফী বলেন: "কবরসমূহ হতে বাতি এবং মোমবাতি অপসারণ করা ওয়াজিব। এ ধরনের কোনো নযর মানত জায়েয নয়।"[৩৪৫]

অনুরূপভাবে, "চাদর বা অনুরূপ কিছু দিয়ে কবর ঢেকে দেয়া সঠিক নয়।"[৩৪৬]

আবার, "এসবই বাতিল। এ থেকে দূরে থাকা উচিত।"[৩৪৭]

আরো শুনুন, "বাতি জ্বালানো এবং চাদর চড়ানো হারাম।"[৩৪৮]

আলী (রাদিয়াল্লাহু আনহু) সম্পর্কে হানাফী আলিমগণ বলেন: "যখনই তিনি কোনো কবর অতিক্রম করতেন যা চাদর বা অনুরূপ কোনোকিছু দ্বারা আবৃত/ ঢাকা থাকতো, তিনি তা থেকে নিষেধ করতেন।"[৩৪৯]

৭. প্রথম যুগ

ইসলামী শরীয়াতে এ সকল বিদআতের কোনো ভিত্তি নাই, আর তা প্রথম তিন প্রজন্ম হতে প্রমাণিতও নয়। সেগুলোতে যদি কোনো দীনি ফায়দা থাকতো তবে, আমরা সাহাবীগণকে ও তাবিঈগণকে এর উপর আমল করতে

[৩৪২] রদ্দুল মুহতার, ইবনু আবিদীন শামী, ২য় খণ্ড, পৃ-১৩৯।

[৩৪৩] দুররে মুখতার, হাসকাফী, ২য় খণ্ড, পৃ-১৩৯

[৩৪৪] ফতোয়া আলমগীরী, ১ম খণ্ড, পৃ-১৭৮।

[৩৪৫] রূহুল মা'আনী, ১৫ খণ্ড, পৃ-২১৯।

[৩৪৬] ফতোয়া মাতালিব আল মু'মিনীন।

[৩৪৭] ফতোয়া আজিজিয়্যাহ, পৃ-৯।

[৩৪৮] ফতোয়া শাহ রফীউদ্দীন, পৃ-১৪।

[৩৪৯] মাতালিব আল মু'মিনীন।

দেখতে পেতাম। বরং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম দুআ করেছেন, "হে আল্লাহ! আমার কবরকে ঈদ (সমাবেশস্থল) বানিও না যার ইবাদত করা হয়।" [(মিশকাতুল মাসাবীহ, বাবুল মাসাজিদ; মুয়াত্তা মালিক ১/১৭২; মুসনাদে আহমাদ ২/২৪৬; আলবানী সহীহ বলেছেন। তাহকীক মেশকাত, ১/১৬৫, হা/৭৫০, মাকতাবা আল ইসলামী, বৈরুত।)]

৮. উৎসব ও উরস উৎযাপন করা

বেরেলভীগণ বহু বিদআতী প্রথা চালু করেছে। যেমন- উরস, মিলাদ উৎসব, ফাতিহা মানত, একাদশী এবং চল্লিশা ইত্যাদি যাতে তাদের খাদ্য সরবরাহের বিরামহীন ব্যবস্থা তারা করতে পারে। তাই তারা লিখেছে: "আউলিয়াগণ আল্লাহর রহমতের দুয়ার। দুয়ার হতেই রহমত পাওয়া যায়। কুরআনে বলা হয়েছে: "যখন যাকারিয়া তাঁর রবের নিকট প্রার্থনা করছিলেন।" সুতরাং (এ থেকে) জানা যায় যে, যাকারিয়া মারইয়ামের সামনে একজন সন্তানের জন্য দুআ করেছিল।[৩৫০] অর্থাৎ জানা যায় যে, কোনো ওলীর সম্মুখে দুআ করা জায়েয।[৩৫১]

আবার, "কবরে/মাজারে উরস পালন আউলিয়াগণের খিদমতের অন্যতম উপায় এবং এটি আল্লাহর নিদর্শনকে সম্মান করা এবং এতে বহুত ফায়দা রয়েছে।"[৩৫২]

৯. কুরআন ও ফাতিহা পাঠ করা এবং বাৎসরিক উৎসব পালন

আহমাদ রেযা সাহেবের আরেক ভক্ত লিখেছে: "ওলীদের কবরে উরস পালন এবং ফাতিহা পাঠ উপকার লাভের উপায়। প্রকৃতপক্ষে আল্লাহর ওলীগণ তাদের কবরে জীবিত এবং তাদের মৃত্যুর পর তাদের শক্তি আরও বেড়ে যায়।"[৩৫৩]

---

[৩৫০] দেখুন কিভাবে তারা কুরআনের আয়াতের অর্থ বিকৃত করেছে এবং নবুয়াতের মর্যাদার সাথে বিদ্রূপ করছে। এখানে যা ইঙ্গিত করা হয়েছে তা হলো, নবুয়াত এর চেয়ে বেলায়েত শ্রেষ্ঠ। আর এ আকীদা হলো পথভ্রষ্ট সুফী ইবনু আরাবীর আকীদা। আহমাদ ইয়ার গুজরাটী জাকারিয়া আলাইহিস সালামের মর্যাদাকে মারইয়ামের মর্যাদার চেয়ে নিচে নামিয়ে দিয়েছেন।

[৩৫১] মাওয়ায়িজ নাঈমিয়া, গুজরাটী, ১ম খণ্ড, পৃ- ২২৪।

[৩৫২] বাহারে শরীয়াত, আমজাদ আলী, ১ম খণ্ড, পৃ-৫৪।

[৩৫৩] এটি বেরেলভী শরীয়াতে প্রমাণিত হতে পারে, ইসলামী শরীয়াতে নয়।

নাঈমুদ্দীন মুরাদাবাদী লিখেছে: "উরস উদ্‌যাপন করা, এ উৎসবে আলোকসজ্জা করা, খাবার আয়োজন করা শরীয়াত থেকে প্রমাণিত এবং নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম -এর একটি সুন্নাত।"[৩৫৪]

আবার, "ওলীদের কবরে সালাত আদায় এবং তাদের রূহের নিকট সাহায্য প্রার্থনা করা ফয়েয-বরকত লাভের উপায়।"[৩৫৫]

"কবরকে চুমা দেওয়া শিরক'- ওয়াহাবীদের এ কথা তাদের বাড়াবাড়ির অন্যতম।"[৩৫৬]

আবার, "গাইরুল্লাহর নামে মানত/শপথ করার কারণে কেউ মুশরিক হয় না।"[৩৫৭]

বেরেলভী শরীয়াতে এমনকি কবরের চারপাশে তাওয়াফ করাও জায়েয।

"যদি কেউ অনুগ্রহ প্রার্থনার জন্য কবরের চারপাশে তাওয়াফ করে তবে এতে কোনো সমস্যা নেই।"[৩৫৮]

এবং এর কারণ: "ওলীদের কবরসমূহ আল্লাহর নিদর্শনসমূহের অন্যতম এবং তাদের সম্মান করার নির্দেশ রয়েছে।"[৩৫৯]

আবার, (কবরের চারপাশে) তাওয়াফ করাকে (না-জায়েয) ঘোষণা করা নিছক ওয়াহাবীদের আন্দাজ-অনুমান, বাড়াবাড়ি এবং মিথ্যাচার।"[৩৬০]

উরসের নামকরণ: "উরসকে উরস বলা হয় কারণ, এটা 'উরস'[৩৬১] কে দেখার দিন; অর্থাৎ মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বর হিসেবে দেখার দিন।"[৩৬২]

---

[৩৫৪] রিসালাহ আল মু'জিযাহ আল আজমী আল মুহাম্মদীয়া ফী ফতোয়া সদরুল ফাযিল, নাঈমুদ্দীন মুরাদাবাদী, পৃ-১৬০।

[৩৫৫] রিসালাহ হাজিয আল বাহরাইন ফী ফতোয়া রিযভিয়্যাহ, বেরেলভী, ২য় খণ্ড, পৃ-৩৩৩।

[৩৫৬] ফতোয়া রিজভীয়্যাহ, ১০ খণ্ড, পৃ-৬৬ (অপর সং- ২২)।

[৩৫৭] প্রাগুক্ত, পৃ-২১০।

[৩৫৮] বাহারে শরীয়াত, আমজাদ আলী রিজভী, ৪র্থ খণ্ড, পৃ-১৩৩।

[৩৫৯] ইলমুল কুরআন, আহমদ ইয়ার, পৃ-৩৬।

[৩৬০] হিকায়্যাত রিজভীয়্যাহ, পৃ-৪৬।

[৩৬১] উরস: শাব্দিক অর্থ 'কনে' বা 'নববধু'; বিশেষণ বিয়ে সম্বন্ধীয়, কনে সম্পর্কিত।

[৩৬২] জা আল-হাক্ব, পৃ-১৪৬।

আহমদ ইয়ার গুজরাটীর ফতোয়া: "কেবল এমন লোকের পিছনেই সালাত বৈধ, যে উরস'-এ অংশ গ্রহণ করে এবং যে এর বিরোধিতা করে, তার পিছনে সালাত আদায় বৈধ নয়।"[৩৬৩]

১০. ঈদে মিলাদুন্নবী পালন করা

ঈদে মিলাদুন্নবী, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর জন্মদিবস উদযাপন একটি অনৈসলামী উৎসব। প্রথম (তিনটি উত্তম যুগে) প্রজন্মে এ ধরনের উদযাপনের কোনো অস্তিত্ব ছিল না। দীদার আলী নিজেও স্বীকার করেছে যে, ঈদে মিলাদুন্নবী সালফে সালেহীনের সময় ছিল না বরং পরবর্তী সময়ে এটি (নতুনভাবে) উদ্ভাবন করা হয়েছিল।[৩৬৪]

এমনকি তা স্বীকার করার পরও তাদের আকীদা হলো: "নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম -এর জন্ম দিবস উদযাপন এবং (এর জন্য) সমাবেশ কায়েম করা, এ দিনে আতর ও তেল মাখা, গোলাপজল ছিটানো, শিরনী (মিষ্টি) বিতরণ করা, এদিনে যেকোনো জায়েয উপায়ে খুশী-আনন্দ প্রকাশ করা মুস্তাহাব এবং এর মধ্যে প্রভুত কল্যাণ রয়েছে। এমনকি আজও খৃষ্টানরা রবিবার দিন উদযাপন করে কারণ এ দিনে খাদ্য নাযিল হয়েছিল এবং সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম -এর আগমন আরও বড় নিয়ামত; তাই তাঁর জন্মদিবস হলো ঈদের দিন।"[৩৬৫]

আবার, "মিলাদ উৎযাপন কুরআন, হাদীস এবং নবীগণ হতে প্রমাণিত।"[৩৬৬]

অনুরূপ, "মিলাদ উৎযাপন ফেরেশতাগণের সুন্নাত এবং এ থেকে শয়তানরাই পালিয়ে যায়।"[৩৬৭]

দীদার আলী লিখেছে: "মিলাদ উদযাপন সুন্নাত ও ওয়াজিব।"[৩৬৮]

---

[৩৬৩] আল হাক্কুল মাঈন, আহমদ সাঈদ কাজমী, পৃ-৭৪।

[৩৬৪] রাসূলুল কালাম ফী বায়ানিল মাওলিদ ওয়াল কিয়াম, দীদার আলী, পৃ-১৫।

[৩৬৫] জা আল-হাক্ব, ১ম খণ্ড, পৃ-২৩১।

[৩৬৬] প্রাগুক্ত, পৃ-২৩১।

[৩৬৭] প্রাগুক্ত, পৃ-২৩১।

[৩৬৮] রাসূলুল কালাম ফী বায়ানিল মাওলিদ ওয়াল কিয়াম, দীদার আলী, পৃ-৫৮।

আবার, "এটি কি কুরআন দ্বারা প্রতিষ্ঠিত যে, যখন জন্মবৃত্তান্ত উল্লেখ করা হয়, তখন দাঁড়ানো উচিত!"[৩৬৯]

এ সেই দীদার আলী যে পূর্বে উল্লেখ করেছে যে, ঈদে মিলাদ উৎযাপন (আন নবী) সালফে সালেহীনের জামানায় ছিল না, বরং তা বিদআত।

আহমাদ রেযা বেরেলভী বলেছে: "জন্মের দিন এমন কোনো গল্প বা ঘটনাবলি উল্লেখ করা জায়েয নয়, যা কোনো লোককে কাঁদাতে পারে।"[৩৭০]

১১. প্রতারণার মাধ্যমে খাওয়া ও পান করা

একে বাতিল সুফী বেরেলভী তরীকা ইসলাম ধর্মের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত করেছে যা শরীয়াত সম্মত নয়, যাতে তারা এমন একটি উপলক্ষ পেতে পারে যেখানে তারা নিজেদের খানা-পিনার সাধ মেটাতে পারে। এ উদ্দেশ্যে তারা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম -এর নাম ব্যবহার করে এতদূর পর্যন্ত পৌঁছেছে যাতে তারা তাদের মুখ ও পেটকে পানাহারে ডুবিয়ে রাখতে পারে।

১২. ইসলামের শিক্ষা

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বিদআত করতে নিষেধ করেছেন:

مَنْ أَحْدَثَ فِي أَمْرِنَا هَذَا مَا لَيْسَ فِيهِ فَهُوَ رَدٌّ

"যে আমাদের এ (দীনী) কাজের মধ্যে এমন কিছু নতুন উদ্ভাবন করল যা এর মধ্যে নয়, তবে তা প্রত্যাখ্যাত।" (বুখারী, আস সহীহ, কিতাবুস সুলহ্, হা/২৬৯৭; মুসলিম, আস সহীহ, কিতাবুল আকযিয়া, হা/১৭১৮)

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন:

إِنَّ أَصْدَقَ الْحَدِيث كِتَابُ الله، وَأَحْسَنَ الْهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّد، وَشَرُّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا، وَكُلُّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ، وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ، وَكُلُّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ

"সর্বোত্তম বাণী আল্লাহর কিতাব, আর সর্বোত্তম আদর্শ মুহম্মদের সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আদর্শ, (দীনে) সবচেয়ে খারাপ বিষয় হলো নতুন উদ্ভাবিত বিষয়, প্রতিটি নতুন উদ্ভাবিত বিষয়ই বিদআত। আর প্রতিটি

[৩৬৯] প্রাগুক্ত, পৃ-৬০।

[৩৭০] আহকামে শরীয়াত, পৃ-১৪৫।

বিদআতই পথভ্রষ্টতা এবং সকল পথভ্রষ্টতাই জাহান্নামে যাবে।” (সহীহ: সুনানে নাসাঈ, হা/১৫৭৮; সহীহ মুসলিম, কিতাবুল জুমু'আ, হা/১৪৩৫।

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর জীবদ্দশায় কখনো কারো জন্মদিবস পালন করেননি, আর না কারো মৃত্যুর পরে কুরআন পাঠের মত কোনো অনুষ্ঠান পরিচালনা করেছেন। তাঁর পুত্রগণ, কন্যাগণ, তাঁর নেককার স্ত্রী খাদিজা (রাদিয়াল্লাহু আনহা), তাঁর চাচা হামযা (রাদিয়াল্লাহু আনহু)- সবাই তাঁর জীবদ্দশায় মৃত্যুবরণ করেছেন, তথাপিও তিনি এমন কোনো আচার-অনুষ্ঠান পালন করেননি যে সকল আচার অনুষ্ঠান (এ সকল বেরেলভী ও দেওবন্দী সুফীদের মাঝে- বাংলা অনুবাদক) পরিলক্ষিত হয়। এসকল আচার-অনুষ্ঠান উদ্‌যাপনের মাঝে যদি কোনো কল্যাণ থাকতো, অথবা এর মধ্যে কোনো সওয়াব অর্জন (এর ব্যাপার) থাকতো, তবে নিশ্চয়ই তিনি তা করতেন এবং সেগুলো করার জন্য তাঁর সাহাবীগণকে নির্দেশ দিতেন। উরসে যাওয়ায় যদি কোনো কল্যাণ থাকতো তবে হেদায়াতপ্রাপ্ত খুলাফায়ে রাশিদীন তা করার ক্ষেত্রে নিশ্চিতভাবে আমাদের ছাড়িয়ে যেতেন। তাঁদের চেয়ে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকেক বেশি ভালবাসার দাবি করতে পারে, এমন কে আছে? তথাপিও তাঁদের থেকে এ ধরনের আমলের কোনো প্রমাণ আমরা পাই না। এখন এটি জানা কথা যে, এসব আচার-অনুষ্ঠান ও উৎসব-উদ্‌যাপন নিছক দুনিয়াবী স্বার্থ/ লাভের জন্য করা হয় এবং কল্যাণ লাভ ও সওয়াবের কথা একটি প্রতারণা/ছুতো মাত্র।

শাহ ওয়ালীউল্লাহ দেহলবী বলেন: রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম শুধুমাত্র কবর যিয়ারতের উদ্দেশ্যে ভ্রমণ করতে নিষেধ করেছেন এবং কবরের নিকট সংঘটিত বিদআতসমূহ মন্দ প্রকৃতির। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নিজে দুআ করেছেন যে, তাঁর কবর যেন ঈদ (উৎসবের)-এর স্থল না হয়'। (মিশকাতুল মাসাবীহ, বাবুল মাসাজিদ; মুয়াত্তা মালিক ১/১৭২; মুসনাদে আহমাদ ২/২৪৬)”[৩৭১]

বিখ্যাত হানাফী মুফাস্‌সির কাজী সানাউল্লাহ পানিপথী বলেন: “আজকাল কিছু জাহিল লোকেরা কবরকে কেন্দ্র করে কিছু অবৈধ বিদআতী কর্মকাণ্ড চালু করেছে, এর পক্ষে তাদের নিকট কোনো দলীল নেই। উরস ও এসকল স্থানগুলোতে বাতি জ্বালানো- এসবই বিদআত।”[৩৭২]

---

[৩৭১] হুজ্জাতুল্লাহিল বালিগাহ, ২য় খণ্ড, পৃ-৭৭।

[৩৭২] তাফসীরে মাযহারী, ২য় খণ্ড, পৃ-৬৫।

১৩. কবরের চারপাশে তাওয়াফ করা ও হানাফী মাযহাবের শিক্ষা

ইবনু নুজাইম আল হানাফী কবরের চারপাশে তাওয়াফ করা সম্পর্কে বলেন, “কা'বা ব্যতীত অন্য যেকোনো কিছুর চারপাশে তাওয়াফ করা কুফরী।”[৩৭৩]

মোল্লা আলী কারী হানাফী বলেন, “রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম -এর কবর তাওয়াফ করা জায়েয নয়, কারণ এটি আল্লাহর ঘর (বায়তুল্লাহ)-এর অবমাননা এবং মর্যাদাহানী। ইদানিং কিছু জাহিল লোকেরা নিজেরা ‘আলিম’ সেজেছে এবং এ সকল জাহিলী কর্মকাণ্ডকে চালু করেছে। এ ধরনের কর্মকাণ্ডের কোনো অবকাশ নেই এবং এ সকল কর্মকাণ্ডের ভিত্তি জাহিলিয়াত (মুর্খতা) ছাড়া আর কিছুই নয়।”[৩৭৪]

১৪. ঈদে মিলাদুন্নবী সম্পর্কে কিছু কথা

মিলাদুন্নবী এর বিষয়টি হলো-৭ম হিজরী শতকের মুযাফ্‌ফরুদ্দীন (আবু সাঈদ কুকুবুরী) নামক (ইরাকের ইরবিল প্রদেশের) এক শাসকের নব-উদ্ভাবন বা বিদআত, যে বিদআতকে প্রশ্রয় দান করতো।

“সে একজন শাসক ছিল যে মুক্ত হস্তে তার সম্পদ ব্যয় করতো এবং মিলাদুন নবী উদযাপন করতো। সে-ই হলো প্রথম ব্যক্তি যে মিলাদুন্নবী উদযাপন চালু করেছিল।”[৩৭৫]

আবার “সে প্রতিবছর এ বিদআত (মিলাদুন্নবী) উপলক্ষে প্রায় তিন লক্ষ দীনার ব্যয় করতো।”[৩৭৬]

আবার, তার সাথে ছিল একজন পথভ্রষ্ট আলিম উমর বিন ওয়াহিয়া যে একাজে তার সাথে যোগদান করেছিল। তাই শাসক তাকে উপঢৌকন হিসেবে এক হাজার স্বর্নমুদ্রা দান করেছিল।”[৩৭৭]

উমার বিন ওয়াহিয়া সম্পর্কে “আল বিদায়া ওয়ান নিহায়া”তে এসেছে: “সে ছিল একজন (কায্‌যাব) মিথ্যুক, লোকেরা তার বর্ণনার উপর আমল করা

---

[৩৭৩] আল বাহরুর রায়িক।

[৩৭৪] শারহুল মানাসিক।

[৩৭৫] আল কওলুল মুতামিল ফী আমালিল মাওলিদ, আহমাদ বিন মুহাম্মদ আল মিশরী।

[৩৭৬] দাওয়ালাল ইসলাম, ইমাম যাহাবী।

[৩৭৭] আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া, ইমাম ইব্‌নু কাছীর, ১৩শ খণ্ড, পৃ-১৪৪।

পরিত্যাগ করেছিল এবং লোকজনের দৃষ্টিতে (একাজ) তাকে নিম্নস্তরে অবনমিত করে দিয়েছিল।"[৩৭৮]

ইমাম ইবনু হাজার রহিমাহুল্লাহ তার সম্পর্কে উল্লেখ করেছেন যে, "সে ছিল অত্যন্ত মিথ্যাবাদী। সে হাদীস বানাতো/জাল করতো এবং তারপর সেগুলো রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম -এর দিকে সম্বন্ধিত করতো। সে সালফে সালেহীনদের গালাগাল করতো। ইমাম ইসবাহানী তার সম্পর্কে একটি ঘটনা বর্ণনা করেছেন: একদিন সে আমার পিতার নিকট এলো এবং তার হাতে একটি জায়নামায ছিল। সে এটি চুমু খেলো এবং তার চোখে মুছল এবং বলল, "এই মুসাল্লা (জায়নামায) টি খুবই বরকতময়। আমি এর উপর অনেক নফল (সালাত) আদায় করেছি এবং বায়তুল্লাহতে এর উপর বসে বহুবার কুরআন খতম করেছি।"

আরেকটি ঘটনা ঘটলো: "সেইদিনই একজন ব্যবসায়ী আমার পিতার সাথে সাক্ষাত করতে এলো এবং বলল, আপনার অতিথি আমার নিকট থেকে একটি অতি মূল্যবান জায়নামায ক্রয় করেছে।' আমার পিতা উমার বিন দেহিয়া কর্তৃক আনীত সেই জায়নামাযটি তাকে দেখালো এবং সে বলল: 'এ হলো সেই জায়নামায যা সে তার নিকট হতে ক্রয় করেছিল। এর জন্য আমার পিতা উমর বিন দেহিয়াকে তিরস্কার করেছিল এবং তার বাড়ি থেকে বের করে দিয়েছিল।"[৩৭৯]

এ হলো সেই লোক যে মিলাদের বিদআতে শাসকের সঙ্গী হয়েছিল। মিলাদ শুরু হয়েছিল কেবল খৃষ্টানদের অনুকরণে এবং এর সাথে ইসলামী শরীয়াতের কোনো সম্পর্ক নেই।

মিলাদ মাহফিলে বেরেলভীরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সম্পর্কে রচিত আনাশীদ (সুরসহ কবিতা আবৃত্তি বা গান গাওয়া যা অনেক লোকের মাঝে বহুল প্রচলিত হয়ে গেছে) আবৃত্তির সময় দাঁড়িয়ে যায়, কারণ তাদের আকীদা হলো রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এ মাহফিলে উপস্থিত হন (আউযুবিল্লাহি মিন্‌হা)।

অনেক সময় বেরেলভীগণ কবিতার এ লাইনটি আবৃত্তি করে:

"প্রতি শ্বাস-প্রশ্বাসে দরুদ পড়,

[৩৭৮] প্রাগুক্ত, পৃ-১৪৫।

[৩৭৯] লিসানুল মীযান, ইমাম ইবনু হাজার আসকালানী, ৪র্থ খণ্ড, পৃ-২৯৬।

.... রাসূল এখানে আমাদের সাথে উপস্থিত।"

এক বেরেলভী লিখেছে: "রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সম্পর্কে রচিত কবিতা পাঠের সময় দাঁড়ানো বা কিয়াম করা ওয়াজিব।"

কিন্তু রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলতেন:

مَنْ أَحَب أن يَمْثُلَ له الرِّجَالُ قِياماً، فَلْيَتَبَوَّأْ مقعدَه مِن النَّارِ.

"যে ব্যক্তি পছন্দ করে যে, লোকেরা তার জন্য মূর্তির মত দাঁড়াক, সে যেন জাহান্নামে তার আবাসস্থল বানিয়ে নেয়।" (সুনানে আবু দাউদ, কিতাবুল আদাব, হা/৫২২৯, আলবানী, সহীহ আবু দাউদ; জামিউত তিরমিযী, কিতাবুল আদাব, ৫/৯০, হা/২৭৫৫; মেশকাত হা/৪৬৯৯। হাদীসটি সহীহ)।

আনাস (রাদিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন:

لم يكن شخص أحب إليهم من رسول الله صلى الله عليه وسلم وكانوا إذا رأوه لم يقوموا لما يعلمون من كراهيته لذلك .

তাঁদের (সাহাবীগণের) নিকট রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম -এর চেয়ে কোনো ব্যক্তিই অধিক প্রিয় ছিল না। অথচ তারা যখন তাকে দেখতেন তখন তাঁরা দাঁড়াতেন না। কেননা, তাঁরা জানতেন যে, তা তিনি পছন্দ করেননি।" (তিরমিযী, ৫/৯০, হা/২৭৫৪; মেশকাত, হা/৪৬৯৮; হাদীসটি সহীহ, দেখুন আলবানী, সহীহুত তিরমিযী ; তাহকীক মেশকাত।)

আশ্চর্যের বিষয় হলো, তারা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম -এর মৃত্যু দিবসে জন্মদিন (মীলাদ) পালন করে। কারণ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ১২ই রবিউল আউয়াল মৃত্যুবরণ করেন। তাঁর জন্ম তারিখ ৯ই রবিউল আউয়াল যা নতুন পঞ্জিকা দ্বারা প্রমাণিত। আরো আশ্চর্যের বিষয় হলো, মাত্র কয়েক বছর আগে তারা (বেরেলভীগণ) এদিনকে "বারোই ওয়াফাত" বলতো, কিন্তু এখন তারাই একে "ঈদে মিলাদুন্নবী" তে পরিণত করেছে।

১৫. খাদ্যের বিষয়

মৃতের ওয়ারিশদের নিকট হতে মৃত্যুর তৃতীয় দিনে, সপ্তম দিনে, ১০ম দিনে ও অন্যান্য দিন উপলক্ষ্যে খাদ্য ও পানীয় গ্রহণ করা বিদআত। কারণ তা ইসলামের সুদীর্ঘ সোনালী যুগের কারো থেকে প্রমাণিত নয়।

না রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হতে এসবের কোনো দলীল প্রমাণ আছে, আর না সাহাবীদের থেকে, আর না তাবেঈ ইমাম, মুহাদ্দিস ও ফকীহদের কারো থেকে। নিশ্চয় এটা হারাম ও নিষিদ্ধ হানাফী ফিকহের কিতাবসমূহে, যদিও তারা দাবি করে তারা হানাফী। আসলে এসকল লোকেরা (বেরেলভীগণ) হানাফী নয়, কারণ তাদের দাবি মিথ্যা, তারা হানাফী ফিকহের অনুসরণ তারা করে না, তাদের নিজস্ব ফিকাহ রয়েছে তারা যার অনুসরণ করে। মূলত তারা হানাফী মাযহাব হতে বের হয়ে গেছে। অথচ মুকাল্লিদ কখনো ইমামের কথার বিরোধীতা করে না এবং মাযহাব থেকেও বের হয় না। এসব বিষয়ে হানাফী ফকীহদের মতামত হলো: মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যে ইসলাম নিয়ে এসেছেন তাতে এগুলো নেই, বরং তা এসেছে অগ্নিপূজক, খ্রিষ্টান ও হিন্দুদের নিকট থেকে।

হানাফী ফিকহের ইমাম মোল্লা আলী কারী আল হানাফী বলেন, "আমাদের মাযহাবের আলেমগণের মাঝে ইজমা (ঐক্যমত) হয়েছে যে, ৩য়া বা ৭মী (পালন/উদযাপন) জায়েয নয়।"[৩৮০]

ইবনু বায্যায আল হানাফী বলেন: "৩য়া এবং ৭মী ইত্যাদি (পালন) মাকরূহ। অনুরূপ কল্যাণ (সওয়াব) লাভের উদ্দেশ্যে খাওয়া-দাওয়ার জন্য কোনো দিন নির্ধারণ করা এবং খতম দেওয়া[৩৮১] (বা দেওয়ানো উভয়ই) মাকরূহ।"[৩৮২]

কিন্তু বেরেলভীগণ কোনো লোকের মৃত্যুর পর তার কবরে 'কুল (খানী)' এবং এছাড়াও অন্যান্য বিষয়গুলো উদ্‌যাপন করা বাধ্যতামুলক মনে করে এবং সওয়াবের জন্য নিজেদের খানা-পিনার আয়োজন করে।

১১শী (যাকে তারা 'এগারো শরীফ' বলে) সম্পর্কে বেরেলভীদের আকীদা হলো: "যদি ১১শ দিনে নির্দিষ্ট অংকের (অর্থ) দ্বারা ফাতিহা অনুষ্ঠান কায়েম করা হয়, তবে বাড়িতে বরকত নাযিল হবে।" 'ইয়াযিদা মাজালিস' বইতে লেখা হয়েছে যে, "হযরত গাওস রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম -এর দ্বাদশ দিবসের অর্থাৎ মিলাদের (জন্মের) ১২শ দিবসের নিয়মিত উদযাপনকারী ছিলেন। একদিন মালিক[৩৮৩] স্বপ্নে তাকে বলেন: হে আব্দুল

---

[৩৮০] মিরকাত শরহে মিশকাতুল মাসাবীহ, ৫ম খণ্ড, পৃ.-৪৮৬

[৩৮১] কিছু ভাড়াটে দিয়ে কুরআন পাঠ (ও মৃত বক্তির উপর তার সওয়াব পৌঁছানো)।

[৩৮২] ফতোয়া বায্যাযিয়া, ৪র্থ খণ্ড. পৃ-৮১।

[৩৮৩] মালিক: লেখক রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কে বুঝিয়েছে।

কাদির! তুমি ১২শ দিবসে আমাকে স্মরণ করেছো, আমি তোমাকে একাদশী (১১ শরীফ) দিলাম। অর্থাৎ লোকজন তোমাকে একাদশী বা ১১ শরীফে তোমাকে স্মরন করবে। এ হলো মালিকের দান হতে একটি দান/অনুগ্রহ।"[৩৮৪]

এ হলো একাদশী (তাদের ১১ শরীফ) এবং 'ইয়াযিদাহ মাজালিস' হতে তার 'কীর্তিমান' দলীল। কে জানে, অনুগ্রহ লাভের জন্য কতগুলো দিন তারা নির্ধারণ করেছে! বেরেলভীদের মাঝে বৃহস্পতিবারের (হালুয়া) রুটি ব্যাপকভাবে প্রচলিত, কারণ "বৃহস্পতিবারে নেককারগণের রূহ তাদের বাড়িতে ফিরে আসে এবং দরজায় দাঁড়ায় এবং করুণ আর্তনাদের সাথে কান্নাকাটি করে (বলে): হে আমার আহলে বাইত (পরিবার-পরিজন)! হে আমার প্রিয়জন! দান-সদকার মাধ্যমে আমার প্রতি অনুগ্রহ কর।' তাই বৃহস্পতিবারে মৃতদের রূহ তার বাড়িতে আসে এবং দেখে তার পক্ষ হতে দান-সদকা করা হচ্ছে কি-না।"[৩৮৫]

শুধু বৃহস্পতিবারেই রূহগুলো আসে এবং দান-সদকা করার জন্য বলে, তা-ই নয়, বরং "রূহসমূহ ঈদের দিনে, মহিমান্বিত জুমার দিনে, আশুরার দিনে এবং (শবে) বারাআতের রাতেও আসে এবং দান-সদকা কামনা করে।"[৩৮৬]

বেরেলভী কর্তৃক খানা-পিনার উদ্দেশ্যে নব-উদ্ভাবিত 'খতম শরীফ'-এর রেওয়াজ বা প্রচলন অজ্ঞ-জাহিল লোকদের মাঝে সুবিদিত। এ (বিদআতী) প্রথার উদ্ভাবন ও ব্যাপক প্রচারের দ্বারা তাদের মোল্লারা ইসলামী শরীয়াতের উপর বিশ্বাস স্থাপন করতে অস্বীকার করেছে (অর্থাৎ শরীয়াতের পরিপূর্ণতাকে অস্বীকার করেছে) যেন তারা তাদের উদরপূর্তির নিয়মিত অনুষ্ঠান আয়োজন করে যেতে পারে। এ বিদআতী রেওয়াজ আলেমদের মর্যাদায় আঘাত করেছে, আমাদের মাঝে (বা আমাদের অঞ্চলে) এ প্রথাকে আলেমদের জন্য অভিশাপ হিসেবে গণ্য করা হচ্ছে। যতক্ষণ এ মোল্লাদের খানা-পিনার সরবরাহ থাকে, ততক্ষণ তারা আর কোনো কিছুরই পরোয়া করে না।

---

[৩৮৪] জা আল-হাক্ব, ১ম খণ্ড, পৃ-২৭০।

[৩৮৫] রিসালাহ ইতিয়্যান আল আরওয়াহ দার মাজমু'আহ, ২য় খণ্ড, পৃ-২৯; জা আল-হাক্ব, ১ম খণ্ড, পৃ-২৬২।

[৩৮৬] রিসালাহ ইতিয়্যান আল আরওয়াহ দার মাজমু'আহ, পৃ-৭০।

১৬. কুরআন পাঠের বিনিময়ে পারিশ্রমিক গ্রহণ করা:

তাই তারা সবাই একসাথে কোনো ধনী-সম্পদশালীর বাড়িতে জমায়েত হয়, কুরআন খতম করে এবং এর সওয়াব মৃত ব্যক্তিকে দান করে (পৌঁছায়)। ধনী লোকটি খুশী হয় যে, কিছু টাকা-পয়সা ব্যয় করে মৃত ব্যক্তি (যার জন্য এ আয়োজন করা হয়) (পাপ থেকে) মুক্ত হয় (বা নাজাত/মুক্তি লাভ করে)। আর এ লোকগুলো (বেরেলভী মোল্লারা) খুশী হয় যে, কিছু সময় ব্যয় করার মাধ্যমে তারা বিভিন্ন প্রকার খাবার-দাবার পায় এবং তাদের পকেটও ভর্তি হয়। কিন্তু হানাফী ফিকাহবিদগণ পরিষ্কারভাবে ব্যাখ্যা করেছেন যে, "যে ব্যক্তি মজুরীর বিনিময়ে কুরআন খতম করে, সে (নিজেই) কোনো সওয়াব লাভ করবে না, তাহলে কিভাবে সে তা (সওয়াব) মৃত ব্যক্তির নিকট পৌঁছাবে (যার জন্য খতম পড়া হচ্ছে)?"[৩৮৭]

আল্লামা আইনী বলেন: "যে এভাবে কুরআন খতমের জন্য অর্থ/ মজুরী গ্রহণ করে এবং যে দেয়, তারা উভয়ে পাপী। এভাবে এটি জায়েয নয়।"[৩৮৮]

এটি করা কোনো মাযহাবেই জায়েয নয়। এ আমলের জন্য কোনোই সওয়াব নেই।"[৩৮৯]

ইমাম শাফিঈ উল্লেখ করেছেন: "অর্থের বিনিময়ে কুরআন পাঠ এবং মৃতব্যক্তিকে এর সওয়াব প্রদান কারো থেকেই প্রমাণিত নয়। যখন কেউ অর্থের বিনিময়ে তেলাওয়াত করে, তখন সে নিজেই এর সওয়াব পায় না। সুতরাং মৃত ব্যক্তিকে সে কিভাবে তা দান করবে?"[৩৯০] আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿وَلَا تَشْتَرُواْ بِـَٔايَٰتِي ثَمَنٗا قَلِيلٗا وَإِيَّٰيَ فَٱتَّقُونِ﴾

"সামান্য অর্থের বিনিময়ে আমার আয়াতকে বিক্রি করো না।" (সূরা আল বাকারা ২: ৪১)

মুফাসসিরগণ বলেন: "এর অর্থ এর জন্য বিনিময়ে কোনো অর্থ-কড়ি গ্রহণ করোনা।"

[৩৮৭] শারহুদ দিরায়াহ, মাহমুদ বিন আহমাদ আল হানাফী।

[৩৮৮] আল বিদায়া শরহে হিদায়া, ৩য় খণ্ড, পৃ-২৫৫।

[৩৮৯] মাজমুআ' রাসাইল, ইবনু আবেদীন শামী, পৃ-১৭৩-১৭৪।

[৩৯০] প্রাগুক্ত, পৃ-১৭৫।

"শরহে আকীদা আত তাহাবীয়্যাহ"-তে উল্লেখ করা হয়েছে: "সালফে সালেহীনদের কারো থেকেই এটা প্রমাণিত নয় যে, কিছু লোক অর্থের বিনিময়ে কুরআন খতম করবে এবং তারপর এর সওয়াব মৃত ব্যক্তিকে দান করা (পৌঁছানো) হবে; এ ভাবে মৃত ব্যক্তির নিকট কোনো সওয়াব পৌঁছে না। এটা হলো তেমনই যেমন কোনো ব্যক্তি কাউকে নফল সালাত পড়ার জন্য টাকা দেয় এবং সে এর সওয়াব কোনো মৃত ব্যক্তিকে দান করে। এর মধ্যে কোনো ফায়দা নেই। যদি কোনো ব্যক্তি ওয়াসীয়াত করে যায় যে, তার সম্পদের একটি অংশ সেসব মজুরী হিসেবে দান করতে হবে যারা তাদের কুরআন তিলাওয়াতের (খতমের) সওয়াব তাকে প্রদান করবে, তবে সেই ওয়াসীয়াত বাতিল।"[৩৯১]

১৭. কবর যিয়ারত ও বরকত হাসিল (তাবাররুকাত) করা

যেকোনোভাবে ব্যক্তিগত আশা-আকাংখা পূরণের সাথে এই বিদআতটির সম্পর্ক থাকতে পারে, কিন্তু দীন ও শরীয়াতের সাথে এর কোনো সম্পর্ক নেই। বেরেলভীগণ অর্থ-সম্পদ কামানোর উপায় হিসেবে "তাবাররুকাত"[৩৯২] (বরকত হাসিল) -এর একটি বিদআত চালু করেছে যেন জুব্বা ও পাগড়ী প্রদর্শনীর মাধ্যমে পার্থিব সম্পদ আহরণ করা যায়।

১৮. নবী রাসূল ও ওলীদের কবর থেকে বরকত হাসিল করা

বেরেলভী আহমাদ রেযা বলে: "আউলিয়াগণের তাবাররুকাত আল্লাহর নিদর্শন সমূহের অন্যতম। সেগুলোকে সম্মান করা ওয়াজিব।"[৩৯৩]

আবার, "যে ব্যক্তি কল্যাণকর তাবাররুকাত প্রত্যাখ্যান/ অস্বীকার করে তবে সে ব্যক্তি কুরআন ও হাদীস প্রত্যাখ্যানকারী/ অস্বীকারকারী এবং সে গণ্ড-মুর্খ, বোধশক্তি রহিত, পথভ্রষ্ট এবং পাপী।"[৩৯৪]

---

[৩৯১] শরহে আকীদা আত তাহাবী, আবিল ইয্য হানাফী, পৃ-৫১৭

[৩৯২] তাবাররুকাত: একবচনে তাবাররুক; কোনো ওলী কর্তৃক পরিত্যক্ত খাবার বা তার হাদীয়া, পরিত্যক্ত কাপড়-চোপড় এবং দ্রব্যাদি।

[৩৯৩] মুকাদ্দিমা রিসালাহ বদরুল আনোয়ার ফী মাজমু'আ রাসাইল, আলা হযরত, ২য় খণ্ড, পৃ-৫১৭।

[৩৯৪] বদরুল আনোয়ার, আহমাদ রেযা, পৃ-৪৩।

এবং ”রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কে সম্মান করারই একটি অংশ হলো সেসকল বস্তুর মর্যাদা/সম্মান করা যা তাঁর বলে জানা যায়।”[৩৯৫]

সুতরাং যেকোনো বস্তুকেই রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম -এর প্রতি সম্বন্ধিত করা যেতে পারে এবং তখন এর যিয়ারত এবং (এর নামে) দান-সদকা ভিক্ষা ও নযর-নিয়ায সংগ্রহ করা যেতে পারে। সে তাবাররুকের রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম -এর সাথে কোনো সম্পর্ক রয়েছে কি-না তা যাচাই করার কোনো প্রয়োজন নেই! জনাব বেরেলভী ব্যাখ্যা করেছেন: “এর জন্য সনদের কোনো প্রয়োজন নেই। কিন্তু যদি কোনো জিনিস রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম -এর বলে বরণ করা হয়, তবে তার অতি ভক্তি করা দীনের নিদর্শনের অন্যতম।”[৩৯৬]

সম্মান ও তাজিম প্রদর্শনের পদ্ধতি কী হবে? জনাব আহমাদ রেযা বলে: “হাত দ্বারা (এর উপর) মোছা এবং দরজা, দেয়াল এবং ‘তাবাররুকাত’ চুম্বন করা, এমনকি যদিও এ সকল কাঠামোসমূহ সেই মুবারক সময়ে বর্তমান ছিল না, (তবুও) .... এবং এর প্রমাণ? একজন মাজনুন (পাগল) .... কোনো এক ব্যক্তির কী চমৎকার উক্তি

(কবিতা)

‘আমি লায়লার শহরের চারপাশে ঘুরে বেড়াই
এবং কখনো এ দেয়ালে চুমা খাই, কখনো সে দেয়ালে চুমা খায়।’
আর তা শহরের প্রতি প্রেমের জন্য নয়,
বরং তা শহরের অধিবাসী (প্রেমিকা)-এর জন্য।”[৩৯৭]

এছাড়া, (তাদের মতে) “সৎকর্মশীল বান্দাদের কবর যিয়ারতের সময় (মাজারের) দরজার চৌকাঠে চুম্বন করাও জায়েয।”[৩৯৮]

---

[৩৯৫] প্রাগুক্ত, পৃ-২১।

[৩৯৬] প্রাগুক্ত, ৪র্থ অধ্যায়, পৃ-৪৩।

[৩৯৭] রিসাল ইবরুল মাকান ফী মাজমু’আ রাসাইল, ২য় খণ্ড, পৃ-১৪১।

[৩৯৮] প্রাগুক্ত, পৃ-১৫৯।

১৯. ছবি ও মূর্তির মাধ্যমে বরকত হাসিল করা

বেরেলভীদের নিকট মদীনায় (রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম -এর কবরে) ও নেককার লোকদের কবরে চুম্বন করা ছাড়াও কবরের চিত্র এবং গম্বুজের চিত্রে চুমু খাওয়াও জরুরী। বেরেলভী সাহেব বলে: "দীনের আলিমগণ কাগজের উপর সাইয়্যেদুল বাশার (অর্থাৎ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) -এর পবিত্র পদযুগল এর চিত্র অংকন করা, সেগুলো চুম্বন করা, সেগুলো চোখে বুলানো এবং সেগুলো মাথায় রাখার নির্দেশ দিয়েছেন।"[৩৯৯]

এবং "দীনের আলিমগণ এসকল ছবির মাধ্যমে রোগমুক্তি ও প্রয়োজন পূরণের জন্য ওয়াসীলা (মধ্যস্থতা) কামনা করেন।"[৪০০]

বেরেলভী আহমাদ রেযা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম -এর পা-এর কাল্পনিক ছবির ফায়দা ব্যাখ্যা করেছে এবং লিখেছে: "যে ব্যক্তির নিকট এ মুবারক চিত্র রয়েছে সে জালিম ও হিংসুক হতে নিরাপদে থাকবে, প্রসব বেদনায় নারীর ডানহাতে এটি রাখবে, তাহলে সহজে প্রসবের কাজ সম্পন্ন হবে এবং তার রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম -এর কবরের যিয়ারত নসীব হতে পারে। যে সকল সেনাদল এটি রাখবে, তারা পলায়ন করবে না; যে কাফেলা এটি সাথে রাখবে, তাতে লুটতরাজ হবে না; যে জাহাজ এটি সাথে রাখবে, তা ডুববে না; এটি যে সম্পদের সাথে রাখা হবে, তা চুরি হবে না। যেকোনো প্রয়োজনে এর মাধ্যমে ওসীলা (দিয়ে দুআর করার) কামনা করা হলে তা দেয়া হবে এবং যেকোনো আশায় এটিকে সাথে রাখা হলে তা পূরণ হবে।"[৪০১]

এ কুসংস্কার ও জাহিলিয়্যাতের কুসংস্কারের মাঝে কোনো পার্থক্য নেই। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এ ধরনের সকল প্রকার কুসংস্কারের অবসান ঘটিয়েছেন, আর এসকল লোকেরা সেগুলোকে পুনরুজ্জীবিত করছে। খাঁন সাহেব বর্ণনা করেছে: "যদি সম্ভব হয়, তবে সেই ময়লা চুম্বন করবে যা মুবারক পায়ের প্রভাবে আর্দ্র হয়ে গিয়েছে, অথবা এর (অংকিত) চিত্র কে চুম্বন করবে।"[৪০২]

---

[৩৯৯] আবরুল মাকাম ফী কিবলাতুল জালাল, বেরেলভী, পৃ-১৪৩।

[৪০০] বদরুল আনোয়ার ফী আদবুল আসার, পৃ-৩৯।

[৪০১] প্রাগুক্ত, পৃ-৪০।

[৪০২] আবরুল মাকান, বেরেলভী, পৃ-১৪৭।

আবার "এ চিত্র অংকনের ফায়দার মধ্যে অন্যতম হলো যদি কোনো ব্যক্তির (রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম -এর) প্রকৃত কবর যিয়ারত করার সৌভাগ্য না হয়, তবে সে এটি চুম্বন করতে পারবে এবং এটি সাদৃশ্যের দিক দিয়ে প্রকৃত যিয়ারতের সমান হবে।"[৪০৩]

এবং "নূর জগতসমূহের মালিক হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম -এর মুবারক কবরের চিত্র অংকন দীনী বিষয়কে সম্মান প্রদর্শন করার অন্তর্ভুক্ত। শরীয়াতের দৃষ্টিতে এর সম্মান করা ও ভক্তি করা সহীহ ঈমানের ঈমানী দাবিসমূহের অন্যতম।"[৪০৪]

সে চিত্রসমূহের যিয়ারতের আদব সম্পর্কে লিখেছে: "সেগুলো যিয়ারত করার সময় সে (যিয়ারতকারী) মনে মনে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম -এর ছবি কল্পনা করবে (তাসাওরে রাসূল) এবং দরূদ পড়া বাড়িয়ে দিবে।"[৪০৫]

অন্যত্র সে লিখেছে: "যে ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম -এর পায়ের (নালাইন শরীফ বা জুতার) চিত্রের উপর (হাত বুলিয়ে) মুছে দেয়, বিচার দিবসে তার জন্য অতিরিক্ত সওয়াব রয়েছে এবং প্রকৃতই সে এ জগতে পরম সুখ, গৌরব, সম্মান ও আনন্দ লাভ করবে। বিচার দিবসের সফলতা লাভের উদ্দেশ্য নিয়ে এটা চুম্বন করবে। যে এর সাথে তার চেহারা (মুখমণ্ডল) ঘষাঘষি করবে, সে অনেক অভূতপূর্ব অনুগ্রহ লাভ করবে।"[৪০৬]

এখন আপনি চিন্তা করুন, বেরেলভীদের এ সকল কর্ম ও মূর্তিপূজারীদের কর্মে মাঝে আর কী পার্থক্য অবশিষ্ট রইল?

তারা তাদের নিজেদের হাত দিয়ে চিত্র অংকন করে এবং তারপর তাদের মনে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম -এর চেহারার ধ্যান করে (তাসাওরে রাসূল) এবং অতঃপর এতে চুম্বন করে, তাদের চোখের উপর রাখে এবং তাদের চেহারায় মোছে এবং সওয়াব ও অনুগ্রহ প্রত্যাশা করে।

একদিকে তাদের অংকিত ও খোদাই করা চিত্রের প্রতি এমন ভক্তি ও সম্মান রয়েছে, আবার অন্যদিকে তারা আল্লাহর সম্মান ও মর্যাদার প্রতি অত্যন্ত

[৪০৩] প্রাগুক্ত, পৃ-১৪৭।

[৪০৪] বদরুল আনোয়ার, পৃ-৫৩।

[৪০৫] প্রাগুক্ত, পৃ-৫৪।

[৪০৬] মাজমুআহ রাসাইল, আহমাদ রেযা, পৃ-১৪৪।

উদ্ধত ও অশিষ্ট এবং তারা বলে: "খোদাইকৃত মুবারক জুতার চিত্রের উপর 'বিসমিল্লাহ' লেখায় কোনো অসুবিধা নেই।"[৪০৭]

২০. নযর মানত করা

জনাব আহমাদ রেযা সাহেবই হলো এ শিরকী প্রথার আসল কারণ এবং এতে সে সীমা ছাড়িয়ে গিয়েছে, "তাওয়াফকারী নযরানা হিসেবে কিছু দিবে যেন (তা দ্বারা) মুসলিমগণ উপকৃত হতে পারে। এভাবে যে ব্যক্তি যিয়ারত করছে এবং যে তাকে সাহায্য করছে- তারা উভয়েই সওয়াব/পুরস্কার লাভ করে। একজন তাদেরকে তৃপ্তি ও অনুগ্রহ দান করে এবং অপরজন মাল-সামানা দ্বারা উপকার করে। একটি হাদীসে এসেছে: "যে ব্যক্তি সক্ষম হয় সে যেন তার মুসলিম ভাইকে যতবেশী সম্ভব উপকার করে।" তাই তার উপকার করা উচিত (তার মুসলিম ভাইয়ের মানে কবরপূজারী বেরেলভী মাজারের খাদেমদেরকে)। (যুক্তি প্রদানের পদ্ধতি লক্ষ্য করুন!)

২১. নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর শিক্ষা

হাদীসে আছে: "আল্লাহ তাঁর বান্দাকে সাহায্য করেন যতক্ষণ সে তার ভাইদেরকে সাহায্য করে।" বিশেষভাবে, যখন 'মুবারক লোকেরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম -এর আহলে বাইতের অন্তর্ভুক্ত হয়, তখন তাদের সেবা করা অনুগ্রহ ও সুখময়তার সর্বোত্তম গুনের অন্তর্ভুক্ত।"[৪০৮]

এ হলো বেরেলভী ধর্ম ও শরীয়াত এবং এগুলো হলো তাদের মূল ভিত্তি ও নিয়ম-বিধান। কিভাবে তারা সাধারণ লোকদের বোকা বানাচ্ছে ও তাদের ব্যবসা চালিয়ে যাচ্ছে এবং তাদের (নিজেদের) সম্পদের খাঞ্জা ভর্তি করছে!

কখনো কি চিন্তা করা যায় যে, ইসলাম ছবি-চিত্রাঙ্কন ও মূর্তিকে ভক্তি করার আদেশ দেয়? এও কি কল্পনা করা যায় যে, এসব চুম্বন ও স্পর্শ করা বরকত লাভের একটি মাধ্যম, আর এরপর এগুলোর জন্য মানত করতে ইসলাম উদ্বুদ্ধ করে? অবশ্যই না।

২২. ফন্দি করা (হীলাতুল ইস্কাত)

ধর্মকে একটি লাভজনক ব্যবসা বানিয়ে বেরেলভী পীরেরা বিদআত উদ্ভাবন করেছে যেন তারা দুহাতে জনসাধারণের সম্পদ লুট করতে পারে, যা কুরআন ও সুন্নাহর সম্পূর্ণ বিরোধী এবং কুরআন-সুন্নাহর বিরুদ্ধে স্পষ্ট ও

---

[৪০৭] প্রাগুক্ত, পৃ-৩০৪।

[৪০৮] বদরুল আনোয়ার ফী মাজমু'আ রাসাইল, পৃ-৫০।

প্রকাশ্য বিদ্রোহ। বেরেলভীদের বিশ্বাস যে, যদি কোনো ব্যক্তি সারাজীবনও সালাত আদায় না করে, সারাজীবন সিয়াম না রাখে, তথাপিও সে তার মৃত্যুর পর তার সম্পদ থেকে কিছু ব্যয় করে (জাহান্নাম থেকে) নাজাত পেতে পারে। তারা এর নাম দিয়েছে 'হীলাতুল ইস্কাত' বা ফন্দি করা।

এর পদ্ধতি লক্ষ্য করুন, অতঃপর বেরেলভী (মতবাদ ও) চিন্তা ধারার গুণকীর্তন (!) করুন: "যে ব্যক্তি মারা গেছে তার আয়ুষ্কালের ব্যাপারে অনুমান করতে হবে এবং পুরুষের ক্ষেত্রে ১২ বছর এবং নারীদের ক্ষেত্রে ৯ বছর (নাবালিগ থাকার সর্বনিম্ন মেয়াদ) বাদ দিতে হবে। তারপর বাকি জীবন অনুমান করতে হবে যে, জীবনে কত সংখ্যক ফরয আমল সে পালন করেনি, এমনকি তার কাযাও করেনি। অতঃপর প্রতি ওয়াক্ত (তরককৃত) সালাতের জন্য সাদাকাতুল ফিতরের সমপরিমাণ (অর্থ বা মাল) ফিদইয়া হিসেবে দান করতে হবে। আর সাদাকাতুল ফিতরের পরিমাণ হলো অর্ধ সা' গম বা এক সা' যব। সুতরাং বিতরসহ প্রতিদিনের ছয়টি সালাতের জন্য ফিদইয়া হলো ১২ সের। প্রতি মাসের জন্য ৯ মন এবং প্রতি বছরের জন্য তা হবে একশত আট মণ।"[৪০৯] আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿إِنَّ ٱلَّذِينَ يَأۡكُلُونَ أَمۡوَٰلَ ٱلۡيَتَٰمَىٰ ظُلۡمًا إِنَّمَا يَأۡكُلُونَ فِي بُطُونِهِمۡ نَارٗاۖ وَسَيَصۡلَوۡنَ سَعِيرٗا﴾

"নিশ্চয় যারা ইয়াতীমদের ধন-সম্পদ অন্যায়ভাবে ভক্ষণ করে তারা তো তাদের পেটে আগুন খাচ্ছে; আর অচিরেই তারা প্রজ্বলিত আগুনে প্রবেশ করবে।" (সূরা আন নিসা ৪ : ১০) আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿أَلَّا تَزِرُ وَازِرَةٞ وِزۡرَ أُخۡرَىٰ ٣٨ وَأَن لَّيۡسَ لِلۡإِنسَٰنِ إِلَّا مَا سَعَىٰ﴾

"কোনো বোঝা বহনকারী অন্যের বোঝা বহন করবে না।" "আর এই যে, মানুষ যা চেষ্টা করে, তাই সে পায়।" (সূরা আন নাজম ৫৩:৩৮-৩৯)

কিন্তু এ সকল বেরেলভী এসব 'হীলাহ' কোথা থেকে গ্রহণ করেছে কে জানে? এগুলোর উৎস ইসলাম বাদে অন্য কোনো ধর্ম হতে পারে কিন্তু ইসলামী শরীয়াতে এর কোনো ভিত্তি নেই।

[৪০৯] গয়াতুল ইহতিয়াত ফী যাওয়াইজ হীলাতুল ইস্কাত; বরাতে, বজলুল যাওয়াইজ, পৃ-৩৪; লাহোরে প্রকাশিত।

তারা বলে যে, কোনো লোক তার প্রিয়জনদের মাগফিরাত (ক্ষমা) লাভের জন্য এত অর্থ-সম্পদ ব্যয় করবে। তারপর এটা কমিয়ে দেয়ার মাধ্যমে তারা অন্য অনেক হীলাহর সমাধান করে যেন লোকেরা এটিকে তাদের সাধ্যাতীত ভেবে ছেড়ে না দেয়।

যেসকল লোকেরা এ ধরনের 'হীলাহ' করার পক্ষপাতি নয়, তারা তাদের সম্পর্কে বলে, "যারা মৃত্যুবরণ করে তাদের জন্য ওয়াহাবী ও অন্যান্যদের কোনো কল্যাণকামীতা নেই, আর ফুকারা ও গুরাবাদের (বেরেলভী মোল্লাদের) প্রতি তাদের কোনো সহানুভূতি নেই। যদি কেউ তার সাধ্য অনুযায়ী ফিদইয়া দেয়, তবে তা কতই না চমৎকার হয়!"[৪১০]

যদি কোনো জাতি তাদের প্রিয়জনদের নাজাতের উদ্দেশ্যে এ সকল হীলাহ বাস্তবায়ন করা শুরু করে দেয়, তাহলে তারা (বেরেলভী মোল্লারা) যেন সোনার খনির সন্ধান পেয়ে গেল।

এ সব হীলাহর কারণে সালাত ও সিয়াম পরিত্যাগকারীর সংখ্যা বেড়ে যাবে এবং বেরেলভী মোল্লাদের সিন্দুকসমূহ ভরে ওঠবে, কিন্তু যে সকল মৃতরা আল্লাহর শাস্তির উপযোগী, তারা নাজাত পাবেনা। কারণ এ সকল হীলাহ কুরআনেও উল্লেখ নেই, হাদীসেও নেই। এ দুনিয়াতে যে যা অর্জন করবে, আখিরাতে সে তা-ই পাবে। সে যদি নেককার হয়, তবে তার এসব 'হীলাহর' কোনো প্রয়োজন নেই এবং সে যদি বদকার বা পাপী হয়, তবে সে এ 'হীলাহ থেকে কোনো কিছুই (উপকার) পাবে না।

২৩. বৃদ্ধাঙ্গুলীতে চুমু খাওয়া

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম -এর নাম শুনে বৃদ্ধাঙ্গুলী চুমু খাওয়াও একটি বিদআত যা কোনো হাদীস দ্বারা প্রমাণিত নয়। বেরেলভীগণ এটা প্রমাণ করতে গিয়ে নিজেদের রচিত বানোয়াট কিচ্ছা-কাহিনী এবং জাল-বানোয়াট হাদীস ব্যবহার করে।

জনাব বেরেলভী সাহেব বলে: "খিজির (আলাইহিস সালাম) হতে বর্ণিত, কোনো ব্যক্তি যখন 'আশহাদু আন্না মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ' (আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি মুহাম্মদ আল্লাহর রাসূল) শোনে, তখন যদি সে ব্যক্তি তার বৃদ্ধাঙ্গুলীতে চুমু খায় এবং চোখে লাগায়, তবে তার চোখে কোনো অসুখ হবে না।"[৪১১]

[৪১০] হীলাতুল ইস্কাত, পৃ-৩৫।

[৪১১] মুনীরুল আইন ফী হুকুমু তাকীল আল বাহামীন- ফতোয়া রিজভীয়্যাহ, ২য় খণ্ড, পৃ-৩৮৩।

২৪. বৃদ্ধাঙ্গুলীতে চুমু খাওয়া খণ্ডন করা

জনাব আহমাদ রেযা এ বর্ণনাটি ইমাম সাখাবী হতে উদ্ধৃত করেছে। কিন্তু ইমাম সাখাবী এ হাদীস উল্লেখ করার পর লিখেছেন: "কিছু সুফী তাদের বইতে এ হাদীস উদ্ধৃত করেছে। এর সনদে যে সকল রাবীর নাম উল্লেখ করা হয়েছে, তারা অজ্ঞাত এবং মুহাদ্দীসীনের নিকট অপরিচিত। অর্থাৎ এটি একটি স্বরচিত বানোয়াট সনদ এবং খিযির হতে এটি কে শুনেছে তার কোনো উল্লেখ নাই।"[৪১২]

অর্থাৎ বর্ণনাটি ইমাম সাখাবী সুফীদের বিরুদ্ধে ব্যবহার করেছেন, যে বর্ণনাটির তিনি সমালোচনা করেছেন এবং একে বানোয়াট হাদীস ঘোষণা করেছেন, জনাব আহমাদ রেযা তার আলেম হওয়ার অযোগ্যতা প্রমাণ করে এর পক্ষে যুক্তি দিয়েছে যাতে করে একটি অনৈসলামী বিদআতের প্রচার প্রসার করা যায়। ইমাম সুয়ূতী লিখেছেন,: যে সকল বর্ণনায় বৃদ্ধাঙ্গুলী চুমু খাওয়ার কথা উল্লেখ আছে, সে সকল বর্ণনা জাল বা বানোয়াট।"[৪১৩]

অনুরূপভাবে, ইমাম সাখাবী, মোল্লা আলী কারী, মুহাম্মদ তাহির আল-পাটনী, আল্লামা শাওকানী এবং অন্যান্যরাও এসকল বর্ণনাকে জাল বলে ঘোষণা করেছেন।"[৪১৪]

কিন্তু জনাব আহমাদ রেযা সাহেব জোরে শোরে প্রচার করে যে, "বৃদ্ধাঙ্গুলী চুমু খাওয়াকে প্রত্যাখ্যান করা মুসলিম উম্মাহর (অর্থাৎ বেরেলভী উম্মাহর!) ইজমার বিরোধী।"[৪১৫]

এবং "কেবল সেই ব্যক্তিই একে (বৃদ্ধাঙ্গুলী চুমু খাওয়াকে) না জায়েয বলতে পারে যে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম -এর নাম বিদ্বেষী।"[৪১৬]

---

[৪১২] মাকাসিদুল হাসানা, ইমাম সাখাবী।

[৪১৩] তাইসীরুল মাকাল, ইমাম জালালুদ্দীন সুয়ূতী।

[৪১৪] আল মাউযুয়াত, আল-পাটনী; মাওযুয়াত, মোল্লা আলী কারী; ফাওয়াইদুল মাজমুআহ, শাওকানী ১৮ নং হাদীস।

[৪১৫] মুনীরুল আইন ফী হুকুমু তাকীল আল বাহামীন- ফতোয়া রিজভীয়্যাহ, ২য় খণ্ড, পৃ-৪৮৮।

[৪১৬] প্রাগুক্ত, পৃ-৪৯৪।

২৫. কাফনের উপর লেখা

বেরেলভী মতবাদের অন্যতম নোংরামী হলো, তারা বলে: কোনো ব্যক্তি "লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াহদাহু লা শারীকা লাহু ... "এ পূর্ণ দুআটি লিখে মৃত ব্যক্তির কাফনের সাথে রেখে দেয়, তাহলে সে (মৃতব্যক্তি) কবরের সংকুচিত হওয়া থেকে নিরাপদে থাকবে এবং মুনকার-নাকীর তার কাছে (প্রশ্ন করতে) আসবে না।"[৪১৭]

অনুরূপভাবে, বেরেলভীগণ 'আহাদনামা' নামক একটি দুআ ব্যবহার করেছে যার কোনো ভিত্তি নেই। এ সম্পর্কে তারা বিশ্বাস করে: "যার কাফনের সাথে এটা রাখা হবে, আল্লাহ তার সমস্ত গুনাহ মাফ করে দিবেন।"[৪১৮]

আহমাদ ইয়ার লিখেছে: "যে ব্যক্তি মারা গেছে সে যখন এ 'আহাদনামা' দেখে, তখন মুনকার-নাকীরের প্রশ্নের জবাব স্মরণ করতে পারবে।"[৪১৯]

২৬. জানাযার সালাত শেষে দুআ করা

তাদের এ সকল বিদআতের যারা বিরোধীতা করে তাদেরকে তারা গালি দেয়, অপবাদ দেয়, ওয়াহাবী বলে কুৎসা রটনা করে। যারা কিতাব ও সুন্নাতের অনুসরণ করে তাদেরকে পূর্ব যুগ থেকেই বিদআতী, প্রবৃত্তির অনুসারী, বক্র ও পথভ্রষ্টরা গালি, নিন্দা ও অপবাদ দিয়েই আসছে। সুতরাং অবাক হওয়ার কিছু নেই। এ সকল মুকাল্লিদ ও বিদআতীদের আরেকটি বৈশিষ্ট্য হলো কুরআন ও হাদীসের বিপরীতে গিয়ে জানাযার সালাত শেষে দুআ করা, যা হানাফী ফিকহেরও বিরোধী।

আহমাদ রেযা বেরলভী বলে, যারা জানাযার শেষে দুআ করে না তারা স্পষ্ট হানাফী ফিকহের বিরোধী, তারা নাজদী ওয়াহাবী ও মুর্খ। ফতোয়া রিজভীয়্যাহ, ৪র্থ খণ্ড, পৃ-২৫,২৬।

জানাযার সালাতের পরে ফিকহে হানাফীতে দুআ করা নিষেধ করা প্রসঙ্গে যা কিছু বর্ণিত হয়েছে সেগুলো সম্পর্কে বেরেলভী বলে, এগুলো সর্বদা করা নিষেধ। তারপর সে একটি নাপাক কবিতা দিয়ে দলীল দিয়েছে আর তার বিরোধীতাকারীদের গালাগালি দিয়েছে। ফতোয়া রিজভীয়্যাহ, ৪র্থ খণ্ড, পৃ-২৬।

---

[৪১৭] ফতোয়া রিজভীয়্যাহ, ৪র্থ খণ্ড, পৃ-১২৭।

[৪১৮] প্রাগুক্ত, পৃ-১২৯।

[৪১৯] জা আল-হাক্ব, পৃ-৩৪০।

২৭. কবরের উপর আযান দেয়া

বেরেলভীগণ কুরআন, সুন্নাহ ও হানাফী ফিকহের বিপরীতে এত বেশি বিদআত রচনা করেছে যার কোনো দলীল-প্রমাণ সালফে সালেহীনদের মাঝে পাওয়া যায় না। সেগুলোর মধ্যে রয়েছে কবরে আযান দেওয়া। খাঁন সাহেব বেরেলভী লিখেছে: "কবরে আযান দেওয়াটা অধিক পছন্দনীয়। এটি মৃতব্যক্তিদেরকে উপকার করে।"[৪২০]

এবং "কবরে আযান দেওয়ার কারণে শয়তান দৌড়ে পালায় এবং রহমত নাযিল হয়।"[৪২১]

কিন্তু এমনকি হানাফী ফিকহেও এর স্পষ্ট বিরোধিতা পাওয়া যায়।

আল্লামা ইবনুল হুমাম বলেন: "কবরের উপর আযান দেওয়া এবং অন্যান্য বিদআত পালন করা ঠিক নয়। সুন্নাহ কেবল এটাই প্রমাণ করে যে, যখন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম জান্নাতুল বাকী' (বাকী'উল গারকাদ) যিয়ারত করতেন, তখন তিনি বলতেন: "আস্ সালামু আলাইকুম দা-রা ক্বওমিন মু'মিনীন .... শেষ পর্যন্ত।" এ ব্যতীত অন্য কোনো কিছুই প্রমাণিত নয়। এসকল বিদআত হতে দূরে থাকা উচিত।"[৪২২]

ইমাম শামী বলেন: "আজকাল কবরে আযান দেওয়ার রীতি চালু হয়েছে। এর কোনো দালীল নেই, এটি বিদআত।"[৪২৩]

মাহমুদ বালখী লিখেছেন: "কবরের উপর আযান দেওয়ার কোনো ভিত্তি নেই।"[৪২৪]

সুতরাং এ হলো (কতকগুলো) বেরেলভী শিক্ষা যা কেবল কুরআন-সুন্নাহরই বিরোধী নয়, বরং তা হানাফী ফিকহেরও বিরোধী। কিন্তু বেরেলভীগণ দাবি করে যে তারা হানাফী ফিকহের উপর রয়েছে।

---

[৪২০] ফতোয়া রিজভীয়্যাহ, বেরেলভী, ৪র্থ খণ্ড, পৃ-৫৪।

[৪২১] জা আল-হাক্ব, ১ম খণ্ড, পৃ-৩১৫।

[৪২২] ফতহুল কাদীর, ২য় খণ্ড, পৃ-২২।

[৪২৩] রদ্দুল মুহতার, ১ম খণ্ড, পৃ-৬৫৯।

[৪২৪] জা আল-হাক্ব হতে উদ্ধৃত, পৃ-৩১৮।

২৮. উপসংহারঃ

আমরা আল্লাহর নিকট প্রার্থনা করি তিনি যেন আমাদেরকে তার কুরআন ও নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সুন্নাতের উপর প্রতিষ্ঠিত থাকার তৌফিক দান করেন এবং বিদআত ও কল্পকাহিনী থেকে দূরে রাখেন। আমীন।

চতুর্থ অধ্যায়

বেরেলভী মতবাদ ও

মুসলিমদেরকে তাকফীর করা (কাফের বলা)

আমরা নিজেরা প্রতিজ্ঞাবদ্ধ যে, আমরা এই দল সম্পর্কে কথা ও বিধান দেওয়াতে কঠোরতা অবলম্বন করবো না। কেননা শুধু তাদের মুখ থেকে তাদের আকীদা বর্ণনা করার জন্যই ইলমী আমানত দিয়ে আমরা এই কিতাবটি লিখেছি। তাদের আকীদাই তাদের ওপর বিধান বর্তাবে এবং তাদের কথাই সাক্ষ্য দিবে ও তাদের অবস্থান, মাসলাক ও মাযহাবকে নির্দিষ্ট করবে।

বিশেষভাবে এই অধ্যায়ে আমরা চেষ্টা করবো, যেন আমাদের মাঝে দয়া বা আবেগ চেপে না বসে এবং এখানে আমরা আমাদের কলমের লাগামকে ছেড়ে দিবো না, যেটি এই সম্প্রদায় থেকে সংঘটিত হওয়া গালিগালাজ ও তিরস্কার সম্পর্কে যা খুশি তাই লিখবে।

১. সকল মুসলিমদের কাফির বলা

তারা শুধু গালিগালাজ ও তিরস্কার করাতেই থেমে থাকেনি, বরং এই উম্মতের বিশিষ্ট ও পদস্থ ব্যক্তিদেরকে, মুসলিম নেতাদেরকে, মুসলিম মুহাদ্দীস ও ফকীহগণকে, সংশোধনকারীদের প্রধানদেরকে এবং সঠিক সালাফী দাওয়াতের মুজাদ্দীদদেরকে তারা ফাসিক এবং কাফির বলেছে।

তারপর আবেগ ও উত্তেজনা ইতিহাসের প্রবাহকে ও বাস্তব ঘটনাকে পরিবর্তন করতে পারবে না। আর কঠোরতা করা, ফাসিক বলা, অপদস্থ করা, অপবাদ দেওয়া এবং কাফির বলাতে কোনো কল্যাণ ও উপকার আসে না। এগুলো হককে বাতিলে পরিণত করে না এবং বাতিলকেও হকে পরিণত করে না। আর মুমিন কখনো বেশি বেশি লানতকারী ও গালি গালাজকারী হতে পারে না। হ্যাঁ, দয়া বা আবেগ হলো মানুষের সহজাত বৈশিষ্ট্য। মানুষ অপবাদ ও লানতের কারণে ব্যথিত হয় ও আঘাতপ্রাপ্ত হয় এবং প্রশংসা ও উত্তম কথার কারণে আনন্দিত ও খুশি হয়। কিন্তু এই সবগুলোর পরেও আমরা আবেগ ও ক্রোধ থেকে দূরে থাকবো এবং এই উম্মত ও উম্মতের বিশিষ্ট ব্যক্তিদের সম্পর্কে তাদের আকীদা বর্ণনা করবো।

২. বেরেলভীদের ইসলাম

এই সম্প্রদায় ইসলামকে শুধু সেই দলের মাঝেই সীমাবদ্ধ করেছে, যেই দল বিদআত ও নব আবিষ্কৃত বিষয়গুলোকে গ্রহণ করে, তাদের নেতা ও মাশাইখদের ইমামতকে মেনে নেয়। আর তারা আল্লাহ তা'আলার জন্য সাব্যস্ত করে যে, আল্লাহ তা'আলা হলেন, গুণশূন্য ও কর্মহীন। আল্লাহ তা'আলা কোনো কিছুরই মালিক নন, বরং তিনি তার ক্ষমতা ও ইচ্ছাকে এই বিষয়ের দায়িত্বশীলদের কাছে ও কিছু বান্দাদেরকে কাছে অর্পন করে দিয়েছেন, যেসব বান্দাকে এই সম্প্রদায়ের লোকজন সৎ মানুষ হিসেবে বিবেচনা করে। এরাই হলো সার্বিক ক্ষমতা, ইলাহী ইচ্ছা ও শ্বাশ্বত শক্তির অধিকারী। স্বয়ং আল্লাহ তা'আলাই তাদের যিয়ারত করার জন্য আরশ থেকে নেমে আসেন, তাদের চারিদিকেই কাবা প্রদক্ষিন করে এবং ফিরিশতাগণ তাদের দরজাগুলোর খাদেম। আসমান তাদের ডান হাতে ভাঁজ করা অবস্থাতে রয়েছে, আর যমীন রয়েছে তাদের বাম হাতে। তাদের আদেশে মেঘ নেমে আসে এবং তাদের ইঙ্গিতে রিযিক বন্টিত হয়। তারাই হলো জীবন, মৃত্যু, পুনরুত্থান, মৃতকে জীবিত করা, কবরে যে ব্যক্তি রয়েছে তাকে কথা শোনানো, দুঃখিত ভারাক্রান্তদের সাহায্য করা, সংকটাপন্ন ব্যক্তিদের সংকট দূর করা, সাহায্যপ্রার্থীদের সাহায্য করা এবং নিরূপায় ব্যক্তিদের সাহায্য করার মালিক। আমরা আল্লাহ তা'আলার নিকটে এগুলো থেকে আশ্রয় চাই। এছাড়াও অনেক কল্পকাহিনী ও মিথ্যা বানোয়াট কথা রয়েছে, যেগুলো পূর্বেই বর্ণনা করা হয়েছে।

তারা বলে, সকলের জন্য আবশ্যক হলো, নিজের মতকে বোকা বানানো, নিজের বিবেককে বাধা দেওয়া, অন্তরকে আচ্ছাদিত করা, এই ধরনের কথাবার্তা বলা ও এই বিশ্বাসগুলো নিজেরা বিশ্বাস করা। নইলে সে ইসলাম থেকেই বেরিয়ে যাবে। কেননা বেরেলভীদের ইসলামই হলো একমাত্র সঠিক ব্যাখ্যা।

তারা আরো বলে, আহলুল হাদীসগণ হলো কাফির ও পাপাচারী, তারা ইসলাম থেকে বেরিয়ে গেছে। কেননা তারা আল্লাহর কিতাবের অনুসরণের কথা বলে, যেই কিতাব আল্লাহ তা'আলা সকল মানুষের জন্য হিদায়াত ও মুমিনদের জন্য রহমত হিসেবে সর্বশ্রেষ্ঠ মানুষের ওপর নাযিল করেছেন। এছাড়াও আহলুল হাদীসগণ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সুন্নাতের অনুসরণের কথা বলেন, যেই রাসূলকে আল্লাহ তা'আলা হিদায়াত ও সঠিক দীন দিয়ে পাঠিয়েছেন, যাতে আল্লাহ তা'আলা অন্য সকল দীনের ওপর এই দীনকে

বিজয়ী করেন, যদিও মুশরিকরা এটি অপছন্দ করে। আহলুল হাদীসগ এই দুটি (কুরআন ও সুন্নাহ) আঁকড়ে ধরার কারণে তারা পথভ্রষ্ট হয়ে গেছে এবং অন্যদেরকে পথভ্রষ্ট করেছে। কেননা এগুলোর মাধ্যমে তারা আহমাদ রেযা বেরেলভীর আনুগত্যে প্রবেশ করতে পারে না। আর কুরআন ও সুন্নাহ তাদেরকে এর অনুমতিও দেয় না। তারা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সেই বাণীকে আঁকড়ে ধরে থাকেন, যাতে তিনি বলেছেন,

تَرَكْتُ فِيكُمْ أَمْرَيْنِ لَنْ تَضِلُّوا مَا تَمَسَّكْتُمْ بِهِمَا: كِتَابَ اللَّهِ وَسُنَّةَ رَسُولِهِ

আমি তোমাদের মাঝে দুটি জিনিস ছেড়ে যাচ্ছি। যতদিন তোমরা সেই দুটি জিনিস আঁকড়ে ধরে থাকবে, ততদিন তোমরা পথভ্রষ্ট হবে। সেগুলো হলো, আল্লাহ তা'আলার কিতাব ও তার রাসূলের সুন্নাত (মুআত্তা মালেক, হা/১৫৯৪, মিশকাত, হা/১৮৬)।

আহলুল হাদীসগণ আরো বলেন যে, আল্লাহ তা'আলা তাঁর কিতাবের বহু আয়াতে শুধু তার আনুগত্য করতে এবং তার রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আনুগত্য করার আদেশ করেছেন। আমরা এখানে শুধু তিনটি আয়াত বর্ণনা করছি। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ﴾

আর তোমরা আল্লাহ ও রাসূলের আনুগত্য করো, যাতে তোমাদের ওপর অনুগ্রহ করা হয় (সূরা আলে ইমরান: ১৩২)। আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন,

﴿ يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَا تَوَلَّوْا عَنْهُ وَأَنْتُمْ تَسْمَعُونَ ﴾

হে ঈমানদারগণ! তোমরা আল্লাহ ও তার রাসূলের আনুগত্য করো এবং তোমরা যখন তার কথা শোন তখন তা হতে মুখ ফিরিয়ে নিও না (সূরা আল আনফাল: ২০)। আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন,

﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ﴾

হে ঈমাদারগণ! তোমরা আল্লাহর আনুগত্য করো এবং রাসূলের আনুগত্য করো, (সূরা আন নিসা: ৫৯)।

এগুলোর কোথাও আহমাদ রেযাসহ অন্য কারো কথা বর্ণনা করা হয়নি এবং তার ওপর ঈমান আনাকেও আবশ্যক করা হয়নি।

আহলুল হাদীসগণ কেনই বা কাফের হবে না! অথচ তারা আল্লাহ তা‘আলার কিতাব ও তার রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সুন্নাতের দিকে আহবান করে, কিন্তু সেই কিতাব তাদেরকে অন্তর্ভুক্ত করেনি এবং সুন্নাত তাদের মতানুযায়ীও হয়নি।

৩. শাইখ মুহাম্মাদ ইবনু আব্দিল ওয়াহাব রহিমাহুল্লাহ ও তার অনুসারীগণ কাফের

আর শাইখ মুহাম্মাদ ইবনু আব্দিল ওয়াহাব রহিমাহুল্লাহর অনুসারীগণও কাফের ও পাপাচারী। কেননা বেরেলভীদের বিদআত, নব আবিষ্কৃত বিষয়গুলো এবং তারা মহান আরশের অধিপতি রব সম্পর্কে ও সর্বশ্রেষ্ঠ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সম্পর্কে যা বিশ্বাস করে, সেগুলোকে মুহাম্মাদ ইবনু আব্দিল ওয়াহাব রহিমাহুল্লার অনুসারীরা অস্বীকার করে।

৪. দেওবন্দীগণ মুরতাদ

তারা বলে, দেওবন্দীরা মুরতাদ, দীন ইসলাম থেকে বেরিয়ে গেছে। কেননা বেরেলভীরা যেসব মিথ্যা কাহিনী বানিয়েছে এবং বিভিন্ন উপকথা ও কল্পকাহিনীর উদ্ভাবন ঘটিয়ে সেগুলোকে দীন ও শরীআত বানিয়েছে সেগুলোকে দেওবন্দীরা বিশ্বাস করে না।

৫. নাদভীরা অপবিত্র মুশরিক

তারা বলে, নাদভীরা অপবিত্র মুশরিক। কেননা তারা বেরেলভীর নিকটে বায়আত করেনি এবং তার ইমামত ও নেতৃত্বকে তারা মেনে নেয়নি। এছাড়াও তারা বেরেলভীদের কল্পকাহিনী ও রূপকথাগুলো বলে না। কেনই বা তারা দীন থেকে বেরিয়ে যাবে না, অথচ তারা তাদের ও সেই সম্প্রদায়ের মাঝে ফায়সালাকারী হিসেবে হানাফী ফিকহকে গ্রহণ করেছে? যদিও এই সম্প্রদায় নিজেদেরকে হানাফী বলে দাবী করে, কিন্তু হানাফী ফিকহ তাদের বিপরীত ও তাদের কর্মের বিরোধিতা করে।

৬. সংস্কারবাদী কবি, লেখক, সাহিত্যিক পথভ্রষ্ট ও অন্যদেরকে পথভ্রষ্টকারী

ভারতীয় উপমহাদেশে সংস্কারবাদী কবি, লেখক, সাহিত্যিক এবং এই দিকে আহবানকারীগণ সকলেই পথভ্রষ্ট ও অন্যদেরকে পথভ্রষ্টকারী। কেননা তারা যে মুসলিমদেরকে সংশোধনের দিকে আহবান করেন, এর মাধ্যমে তারা প্রাচীন রীতিনীতি, ঐতিহ্য, জাহেলী রেওয়াজ, হিন্দু পৌত্তলিকদের চিন্তা ভাবনা থেকে মানুষদেরকে দূরে সরান। হিন্দু পৌত্তলিকদের চিন্তা ভাবনাগুলো

হলো, মুর্তিপূজা ও কবর পূজা করা, মাজারের চৌকাট, করিডোর ও দরজার সামনে নত হওয়া, গাছ, পাথর, ছায়া, বিড়ালকে ভয় করাসহ আরো রয়েছে অনেক কুসংস্কার।

৭. জ্ঞান শিক্ষাদানকারীগণ নেত্রীবর্গ পাপাচারী ও নাস্তিক

আর জ্ঞান শিক্ষাদানকারীদের মধ্যে প্রধান প্রধান ব্যক্তিগণ হলো পাপাচারী ও নাস্তিক। কেননা মুসলিম উম্মতকে জ্ঞান শিক্ষা দেওয়ার মাধ্যমে তারা অজ্ঞতার অন্ধকারকে দূর করেন ও এমন মানুষের মাঝে জ্ঞানের আলো ছড়িয়ে দেন, যারা যুগ পরস্পরাতে মাশাইখদের ইবাদত করে, যেই মাশাইখরা আল্লাহর বন্ধু হওয়া ও আল্লাহর নিকটবর্তী হওয়া এবং সৃষ্টির জন্য আল্লাহ তা'আলার নিকটে সুপারিশ করার দাবী করে।

৮. রাজনীতিবিদগণ কাফির ও লানতপ্রাপ্ত

ঔপনিবেশিকতার শৃঙ্খল থেকে জাতিকে মুক্তিদানকারীগণ ও রাজনীতিবিদরা হলেন কাফির ও লানতপ্রাপ্ত। কেননা তারা শুধু ভারত পাকিস্থানের ভূমিকে বর্বর ইংরেজদের কবল থেকে মুক্ত করতে চায় না এবং দূর্বল নিপীড়িত মানুষদের শৃঙ্খলকে ভেঙে দিতে চায় না, বরং তারা এর সাথে সাথে ধর্মের নামে শোষক ও অত্যাচারীদের কারাগার ও শৃঙ্খল থেকে মানুষদেরকে মুক্ত করতে চায়।

৯. আল্লাহ তা'আলার রাস্তায় জিহাদ ও লড়াইয়ের পতাকা বহনকারীরা সীমালংঘনকারী

আল্লাহ তা'আলার রাস্তায় জিহাদ ও লড়াইয়ের পতাকা বহনকারীরা হলো সীমালংঘনকারী, তারা বাড়াবাড়ি করে ও মানুষের রক্তকে বৈধ করে। কেননা তারা দুর্বল ও অভাবীদের মধ্যে জিহাদের চেতনাকে ফুঁকে দেয়, তাদেরকে খানকা ও সূফী সাধকদের আশ্রম থেকে বের করে আনে, তাদেরকে বৃহত্তর জিহাদ থেকে ক্ষুদ্রতর জিহাদের দিকে নিয়ে যায় এবং মীলাদ, উরস ও কবরে উৎসব করাতে অর্থ খরচ করার পরিবর্তে অস্ত্র ও ঘোড়া কেনার জন্য আল্লাহ তা'আলার রাস্তাতে ব্যয় করার প্রতি তাদেরকে উৎসাহিত করে।

১০. ইসলামী সরকার, নববী খিলাফত ও শারঈ নেতৃত্বের অধিকারী ব্যক্তিগণ বিভ্রান্ত, পথভ্রষ্ট

ইসলামী সরকার, নববী খিলাফত ও শারঈ নেতৃত্বের অধিকারী ব্যক্তিগণ বিভ্রান্ত, পথভ্রষ্ট। কেননা তারা মানুষদেরকে ইসলামী রাষ্ট্রের দিকে দিক

নির্দেশনা দেন। বেরেলভীরা তাদের মহলে যেই রাষ্ট্র কায়েম করেছে ও তাদের সূফী সাধকদের আশ্রমে যেই খিলাফতকে বন্টন করেছে এবং নিজেদের মধ্যে যেই ইমারাত কায়েম করেছে সেগুলোর দিকে তারা মানুষদেরকে দিক নির্দেশনা দেন না।

এই সকল ব্যক্তিরা সকলেই ফাসেক ফাজের, কাফির, মুরতাদ, দীন থেকে তারা বেরিয়ে গেছে এবং তারা মাযহাবের গণ্ডির বাহিরে। কেননা তারা বেরেলভী ও তার সহমত ব্যক্তিকে অস্বীকার করে, তারা বেরেলভীর আকীদা ও তার বিশ্বাস করা বিষয়গুলোর ওপর ঈমান আনে না।

যেই ব্যক্তিই বর্ণিত কাজগুলো করেছে অথবা আমরা পূর্বে যেগুলো বর্ণনা করলাম সেগুলো বিশ্বাস করেছে, তাদের কেউই এই বেরেলভীদের থেকে রেহাই পায়নি, হোক সেই ব্যক্তি এই উপমহাদেশের অথবা বাহিরের, অথবা হোক সেই ব্যক্তি পূর্ববর্তীদের অথবা পরবর্তীদের মধ্যে থেকে। ইসলামের দিকে সম্পৃক্তকারী কোনো দল ও ফিরকাই কাফির বলার ক্ষেত্রে এমন চরম সীমাতে গিয়েছে বলে আমি মনে করি না, যেই চরম সীমাতে বেরেলভীরা গিয়েছে। ছোট-বড়, আকীদা ও মতামতের যেকোনো বিষয়েই তাদের সাথে মতভেদ হলেই তাকে তারা কাফির বলে। এমনকি তারা যাদেরকে কাফের বলে আখ্যায়িত করেছে, তার সাথে কেউ একমত না হলে তাকেও তারা কাফের বলে, যদিও সেই ব্যক্তি তাদের সাথে অন্য বিষয়ে মতভেদ না করুক। কেননা তাদের সাথে একমত না হওয়াটা তাদের মানহাজে অনুমোদিত নয়, ইখতেলাফ করা তো দূরের কথা। এটি তাদের ক্ষেত্রে সুবিদিত যে, একমত না হওয়াটা অনেক বিরোধিতা ও ইখতেলাফ থেকে তাদের নিকটে হালকা। বেরেলভীরা এমন বহু মানুষকে কাফের আখ্যায়িত করেছে, যারা তাদের সাধারণ বিশ্বাস ও বিশেষ বিশ্বাসের ক্ষেত্রে তাদের মতোই। কিন্তু তাদের সমস্যা হলো, বেরেলভীদের প্রতিপক্ষকে তারা নিজেরা যে দলীল ও নথি দিয়েছে তাতে তারা সাক্ষর করেনি, যেমন কাফির হওয়া ও মুরতাদ হওয়ার সাক্ষ্য দেওয়া। এসব মানুষদেরকে স্পষ্টভাবে কাফির আখ্যা দেওয়াতে তারা বেরেলভীদের সাথে একমত হয়নি এবং ঐসব লোকদের সম্পর্কে বেরেলভীরা যা বলেছে সেগুলো তারা বলেনি, যদিও প্রতিপক্ষের ক্ষেত্রে বেরেলভীদের চিন্তা চেতনা ও তাদের বিশ্বাসের মতোই তারাও বিশ্বাস পোষণ করে। বেরেলভীরা বলে যে, আমরা যাদেরকে কাফের বলে ঘোষণা করেছি, তাকে কাফের বলাতে কেউ যদি দ্বিধা করে ও বিলম্ব করে অথবা তার কুফরীতে যদি সন্দেহ পোষন করে, তাহলে সেই ব্যক্তিও কাফের। বিশিষ্ট হানাফী আলেম শাইখ আব্দুল বারী লক্ষনভী, যিনি অনেক বিশ্বাসে তাদের সাথে একমত ছিলেন, তাদের

সমর্থক ছিলেন এবং তাদের মতামতকে সমর্থন করতেন, এমন ব্যক্তিকেও তারা কাফের বলে ঘোষণা করেছিল। সায়্যেদ বেরেলভী নিজেই শাইখ আব্দুল বারী লক্ষনভীর কাফের হওয়ার কারণ বর্ণনা করে বলে যে, তিনি কিছু হানাফী আলেমকে স্পষ্টভাবে কাফের বলতে দ্বিধা করেছিলেন, যেই আলেমগণ সায়্যেদ বেরেলভীর ও বেরেলভী মতবাদের বিরোধী ছিলেন (মুসাহহিহু দিমাগি মাজনূন, ১৪ পৃ.)।

সায়্যেদ বেরেলভী বলে, তার কুফরীটা একেবারে স্পষ্ট কুফরী। তারপর সে শাইখ আব্দুল বারীর কাফের হওয়ার বিষয়ে অন্যান্য ফাতওয়াগুলোর সাথে তার ফাতওয়াকে যুক্ত করে দেয়। সায়্যেদ বেরেলভীর পুত্র তার এই ফাতওয়াগুলো একটি স্বতন্ত্র কিতাবে একত্রিত করে, যার নাম হলো, 'আত-তরী আদ-দারী লি হাফওয়াতি আব্দিল বারী'।

যেসকল মুসলিমরা বেরেলভীকে অস্বীকার করেছে, তাদেরকে সে ও তার অনুসারীরা কাফের বলার পরেও কতই না কথা বলেছে! যে ব্যক্তি সেই কাফের আখ্যা দেওয়াতে সন্দেহ করবে সেও কাফের হয়ে যাবে।

১১. বেরেলভীদের বিষয়ে সায়্যেদ আব্দুল হাই লক্ষণভী

বিখ্যাত ইসলামী লেখক সায়্যেদ আবূল হাসান আলী আন নাদাভীর পিতা সায়্যেদ আব্দুল হাই লক্ষণভী এই কথারই সাক্ষ্য দিয়েছেন। তিনি তার কিতাব 'আহমাদ রেযা বেরেলভীর জীবনী' তে বলেন,

আহমাদ রেযা ফিকহী ও তর্কশাস্ত্রের মাসআলাতে অনেক কঠোর ছিল, খুবই দ্রুত অন্যকে কাফের বলে আখ্যায়িত করতো, শেষ যুগে ভারতবর্ষে সে কাফের আখ্যায়িত করার ও মুসলিমদেরকে বিচ্ছিন্ন করার পতাকা বহন করেছিল। সে নেতৃত্ব দিয়েছির এবং সেই সম্প্রদায়ের নেতাতে পরিণত হয়েছিল, যেই সম্প্রদায়ের লোকজন তাকে সমর্থন করতো, তার দিকে নিজেদেরকে সম্পৃক্ত করতো এবং তার বক্তব্য প্রমাণ হিসেবে ব্যবহার করতো। যারা তার বিশ্বাস ও উপলব্ধিতে তার সাথে একমত হয়নি, অথবা যারা মনে করেছে যে, তার পথ পদ্ধতি ও তার পিতৃপুরুষদের পথ পদ্ধতিতে বিচ্যুতি রয়েছে, তাদের কাফের হওয়ার বিষয়ে সে কোনো উদারতা প্রদর্শন করেনি। সে ছিল সকল ধরনের সংস্কার আন্দোলনের ঘোর বিরোধী এবং সর্বদাই তাদের পিছনে লেগে থাকতো।

১৩১১ সালে কানপুরের (ভারতের একটি শহর) ফাইয আম মাদ্রাসাতে একটি অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছিল, যেখানে বিখ্যাত অনেক আলেম উপস্থিত

হয়েছিলেন। এই অনুষ্ঠানেই আলেমগণের একটি পরিষদ গঠন করা হয়েছিল। এই পরিষদের সবচেয়ে বড় লক্ষ্য ছিল মুসলিমদেরকে ঐক্যবদ্ধ করা, বিভিন্ন দলের আলেমগণের মাঝে সম্পর্কের পুনর্মিলন করা এবং ধর্মীয় শিক্ষার সংস্কার করা। মুফতী আহমাদ রেযা এই পরিষদে উপস্থিত ছিল এবং পরে সেখান থেকে বেরিয়ে যায়। আর সে এই পরিষদের বিরুদ্ধে লড়াই করার সিদ্ধান্ত নেয় এবং এজন্য সে একটি পত্রিকা বের করে, যার নাম দেয় 'আত তুহফাতুল হানাফীয়্যাহ লি মুআরাযাতি নাদওয়াতিল উলামাহ'।

এই পরিষদের খণ্ডন করার জন্য সে প্রায় এক হাজার পুস্তিকা ও কিতাব রচনা করে। আর সে এই পরিষদের আলেমগণের কাফের হওয়ার বিষয়ে ভারতের বিভিন্ন প্রান্তের আলেমগণের ফাতওয়া ও তাদের সাক্ষর গ্রহণ করে একটি কিতাবে সেগুলো জমা করে, যেই কিতাবের নাম দেয়, 'ইলজামুস সুন্নাহ লি আহলিল ফিতনাহ'। আর সে এর জন্য হারামাইনের আলেমগণের সমর্থনও গ্রহণ করে এবং সেটিকে ১৩১৭ সালে একটি সংকলনে প্রকাশ করে, যার নাম হলো, ফাতওয়াল হারামাইন বি রাজফি নাদওয়াতিল মাইন'।

১২. দেওবন্দের আলেমদেরকে কাফের বলা ও তার কারণ

তারপর সে দেওবন্দের আলেমদেরকে কাফের বলার দিকে গিয়েছে। দেওবন্দের আলেমদের মধ্যে রয়েছে, ইমাম মুহাম্মাদ কাসেম নানুতভী, রশীদ আহমেদ কানকূহী, শাইখ খলীল আহমেদ সাহরানপুরী, মাওলানা আশরাফ আলী থানভী এবং তাদের ঘনিষ্ট ব্যক্তিবর্গ।

আহমাদ রেযা তাদের দিকে এমন আকীদাকে সম্পৃক্ত করেছে, যেগুলো থেকে তারা সম্পূর্ণ মুক্ত। আহমাদ রেযা তাদের কাফের হওয়ার বিষয়ে দলীল পেশ করেছে, এর জন্য সে হারামাইনের আলেমগণের সমর্থন গ্রহণ করেছে অথচ সেই আলেমগণ প্রকৃত বিষয় সম্পর্কে অবগত ছিলেন না, তারপর সে একটি সংকলনে প্রকাশ করেছে, যার নাম দিয়েছে, 'হিসামুল হারামাইন আলা মানহারি আহলিল কুফরী ওয়াল মাইন'। সে তার সেই সংকলনে বলেছে, 'যে ব্যক্তি তাদের কাফের হওয়া সম্পর্কে ও তাদের শাস্তি হওয়া সম্পর্কে সন্দেহ করবে, সেই ব্যক্তি কাফের হয়ে যাবে'। আর সে এর দ্বারা প্রত্যাখ্যান, লড়াই ও বিরোধিতাতেই লিপ্ত থাকে, যেখানে কোনো নমনীয়তা নেই ও দুর্বলতাও সেখানে আসেনি। এমনকি অন্যকে কাফের বানানোই মানুষের চিন্তা ভাবনাতে পরিণত হয়েছে। আর এতে চরম ফিতনা ও অশান্তির সৃষ্টি হয়েছিল (নুঝহাতুল খাওয়াতির, ৮/৩৯)।

সে তার পদ্ধতি ও কাজ কর্মে একাই ছিল না। বরং তার দলের সকলেই তার পন্থা অবলম্বন করেছিল ও তার পথ অনুসরণ করেছিল এবং তার মতবাদ অনুযায়ী চলেছিল। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এবং তার অনুসারীগণ অনেক কষ্ট, যন্ত্রণা ও কঠিন মুহুর্ত সহ্য করে ও অনেক বাধা অতিক্রম করে তারা কাফিরদেরকে ইসলামে প্রবেশ করিয়েছিল। কাফিরদেরকে ইসলামে প্রবেশ করানোর পরে আহমাদ রেযা ও তার অনুসারীরা তাদের গদি ও সিংহাসনে বসেই সমগ্র বিশ্বকেই তারা কাফের বলে ঘোষণা দিলো এবং তাদেরকে ইসলাম থেকে বের করে দিলো।

সে ও তার অনুসারীরা কুফরী ধর্মকে ইসলামে প্রবেশ করিয়েছিল এবং তারা মুসলিম জাতিকে ইসলাম থেকে বের করে দিয়েছিল।

১৩. আহলুল হাদীসদেরকে কাফের বলার কারণ

তারা আহলুল হাদীসদেরকে কোনো অপরাধ ও পাপ ছাড়াই কাফের বলে ঘোষণা করেছে। তাদের অপরাধ শুধু এটিই ছিল যে, তারা এমন একটি অবস্থান বেছে নিয়েছে, যেটিকে তারা কুরআন ও সুন্নাহর সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ মনে করেছে, তারা মুসলিমদেরকে মতভেদ প্রত্যাখ্যান করতে আহবান করেছে এবং মতভেদপূর্ণ বিষয়গুলোকে তারা আল্লাহর কিতাব ও তার রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সুন্নাহর দিকে ফিরিয়ে দেওয়ার জন্য আহবান করেছে। কেননা আল্লাহ তা'আলা এমনটিরই নির্দেশ ও দিকনির্দেশনা দিয়েছেন। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ﴾

অতঃপর কোনো বিষয়ে তোমাদের মধ্যে মতভেদ ঘটলে তা ফিরিয়ে দাও আল্লাহ ও রাসূলের দিকে, যদি তোমরা আল্লাহ ও আখেরাতে ঈমান এনে থাক (সূরা আন নিসা ৪ : ৫৯)।

১৪. আহলুল হাদীসদের আকীদা-বিশ্বাস

(১) আহলুল হাদীসগণ বলেন যে, আল্লাহ তা'আলা মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উম্মাতের ওপর একমাত্র তাঁর ও তার নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আনুগত্য করাকে ফরয করেছেন। তা ব্যতীত অন্যদের আনুগত্যের বিষয়ে কুরআন থেকে কোনো প্রমাণ নেই, আবার সুন্নাহ থেকেও কোনো প্রমাণ নেই। তবে কারো বক্তব্য যদি এই দুই উৎস অর্থাৎ কুরআন ও

সুন্নাহর সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ হয় তাহলে ভিন্ন কথা। নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ওয়াহীর মাধ্যমে এমনটির আদেশ করেছেন, যেখানে তিনি বলেছেন যে, আমি তোমাদের মাঝে দুটি জিনিস ছেড়ে যাচ্ছি, সেগুলো হলো, আল্লাহর কিতাব ও আমার সুন্নাত। তোমরা যতদিন সেগুলো আঁকড়ে ধরে থাকবে, ততদিন তোমরা বিভ্রান্ত হবে না (দারাকুতনী, হা/৪৬০৬, সিলসিলা সহীহাহ, হা/১৭৬১)।

(২) পক্ষান্তরে অন্যান্য আলেম ও মাশাইখদের থেকে যা বর্ণিত হয়েছে তা তদন্ত করতে হবে। যদি সেগুলোর কোনো ভিত্তি থাকে, তাহলে সেগুলো গ্রহণ করা হবে, নইলে সেগুলোকে দেয়ালে ছুড়ে মারতে হবে।

(৩) পৌত্তলিক ও হিন্দুদের থেকে ইসলামের নামে যেসব কুসংস্কার বা ধর্মবিশ্বাস ও বিদআতের প্রবেশ করেছে আহলুল হাদীসগণ সেগুলোকে প্রতিহত করেছে এবং তারা বলেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামের যুগেই এই দীন পরিপূর্ণ হয়ে গিয়েছে। এই বিষয়ে আল্লাহ তা'আলা সাক্ষ্য দিয়ে বলেন,

﴿ الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا ﴾

আজ আমি তোমাদের জন্য তোমাদের দীনকে পরিপূর্ণ করলাম এবং তোমাদের ওপর আমার নেয়ামতকে সম্পূর্ণ করলাম এবং তোমাদের জন্য ইসলামকে দীন হিসেবে পছন্দ করলাম (সূরা আল মায়েদা: ৩)।

(৪) যেগুলো ইসলামের নামে উদ্ভাবন করা হয়েছে, যেগুলো সমর্থনে আল্লাহ তা'আলার কিতাবের কোনো আয়াত নেই অথবা সেগুলোর পক্ষে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নির্দেশনা নেই, সেগুলোর সবই বিদআত, সবই বর্জনীয়। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

مَنْ أَحْدَثَ فِي أَمْرِنَا هَذَا مَا لَيْسَ فِيهِ فَهُوَ رَدٌّ

কেউ যদি আমাদের এই শরীআতে এমন কিছুর উদ্ভাবন করে, যা তাতে নেই, তাহলে সেটি বর্জনীয় (সহীহ বুখারী, হা/২৬৯৭, সহীহ মুসলিম, হা/১৭১৮)। নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আরো বলেছেন,

إِنَّ أَحسن الْحَدِيثِ كِتَابُ اللهِ، وَخير الْهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّدٍ، وَشَرُّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا، وَكُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ، وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ، وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ

নিশ্চয়ই সর্বোত্তম বাণী হচ্ছে আল্লাহ তা'আলার কিতাব এবং সর্বোত্তম আদর্শ হচ্ছে মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আদর্শ। আর সবচেয়ে নিকৃষ্ট বিষয় হলো দীনের নামে নতুন জিনিস সৃষ্টি করা এবং (এ রকম) সব নতুন সৃষ্টিই হলো বিদআত। আর প্রতিটি বিদআতই হলো পথভ্রষ্টতা। আর প্রত্যেক পথভ্রষ্টতার পরিণাম জাহান্নাম (সহীহ মুসলিম, হা/৮৬৭, নাসাঈ, হা/১৫৭৮)।

(৫) যদি নব আবিষ্কৃত (বিদআত) এই বিষয়গুলো দীনের অন্তর্ভুক্ত হতো, তাহলে কখনোই আল্লাহ তা'আলা সেগুলো বর্ণনা করা থেকে বিরত থাকতেন না এবং তার রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামও সেগুলো অবশ্যই বিস্তারিত বর্ণনা করতেন। কুরআন ও সুন্নাহতে সেগুলো বর্ণিত না হওয়াই প্রমাণ করে যে, সেগুলো দীনের অন্তর্ভুক্ত নয়। কেননা সেগুলো যদি দীনের অন্তর্ভুক্ত হতোই অথচ কুরআন ও সুন্নাহতে সেগুলোর কোনো বর্ণনা আসেনি, তাহলে এই দীন পরিপূর্ণ থাকতো না।

(৬) বেরেলভীরা দেখলো যে, আহলুল হাদীসদের কারণে তারা যে কবরে উৎসব করে, মৃতদের জন্য উরস করে, খেল তামাশা করে, ঢাক ঢোলের তালে নাচানাচি করে, গান বাজনা শোনে এবং ধর্মের রং দিয়ে তারা বাদ্যযন্ত্র বাজায়, এগুলো বাতিল হয়ে যাবে। আর তারা ধর্মশালা, দুস্থদের সাহায্য করা, সংকটাপন্ন ব্যক্তিদেরকে সহযোগিতা করা, রোগীদের আরোগ্য করা, সন্তান দেওয়া, তাবিজ কবজ দেওয়ার নামে যেই ব্যবসা তারা চালু করেছিল সেগুলো হারিয়ে যাবে, তাদের পীর মাশাইখদের পথ বন্ধ হয়ে যাবে এবং তাদের গণকীর মাধ্যমে অর্থ উপার্জনও আর থাকবে না। যার ফলে তারা তাদের অন্যায় কাজের ওপরেই অটল থেকেছে এবং আহলুল হাদীসদের বিরোধিতাতে অনড় থেকেছে। কেননা আহলুল হাদীসগণ চান মানুষদেরকে তাদের তৈরি করা শৃঙ্খল থেকে মুক্ত করতে এবং মানুষদেরকে শিকার করার জন্য তারা যুগের পর যুগ যেই ষড়যন্ত্রের জাল পেতে রেখেছে তা থেকে মানুষদেরকে রেহাই দিতে। এই কারণে বেরেলভীরা আহলুল হাদীসদেরকে কাফির বলে আখ্যায়িত করেছে এবং তাদের বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ, আলেমগণ, কুরআন ও সুন্নাহর দিকে আহবানকারী, হক, হিদায়াত ও সত্যের প্রচারকদেরকে কাফির বলে বলে আখ্যায়িত করেছে। তাদের শীর্ষে রয়েছেন-

১৫. শাহ ওয়ালীউল্লাহ দেহলভী রহিমাহুল্লাহর নাতী শাহ ইসমাঈল শহীদ রহিমাহুল্লাহু

আহলে হাদীসদের আন্দোলনের পথপ্রদর্শক, নেতা, বীর মুজাহিদ, নিখুত আলেম, শাহ ওয়ালীউল্লাহ দেহলভী রহিমাহুল্লাহর নাতী শাহ ইসমাঈল শহীদ রহিমাহুল্লাহু, যিনি ব্রিটিশ উপনিবেশিকতা ও মুসলিম দেশ দখলকারী শিখদের বিরুদ্ধে জিহাদের পতাকা বহন করেছিলেন, যেই শিখরা কুফরী করেছিল ও মুসলমানদের রক্তকে বৈধ মনে করেছিল।

তিনি ভারতীয় উপমহাদেশের ভূখণ্ডের একটি অংশে একটি ইসলামিক রাষ্ট্র প্রতিষ্টার জন্য ইসলামের পতাকা বহন করেছিলেন, যাতে করে বিশুদ্ধ ইসলামী আইন সম্পূর্ণরূপে বাস্তবায়ন করা যায় এবং তিনি প্রকৃত ইসলামী দাওয়াতকে পুনরায় নবায়ন করেন এবং সঠিক সালাফী পথকে পুনরুজ্জীবিত করেন। যার কণ্ঠস্বর শতাব্দী আগে অদৃশ্য হয়ে গিয়েছিল, বিভিন্ন ধরনের বিদআত ও কুসংস্কারের অধীনে বিলুপ্ত হয়ে গিয়েছিল, পশ্চাতের খারাপ পথগুলোর মাধ্যমে যা পরিবর্তন হয়ে গিয়েছিল। এমনকি কবরের ইবাদত শুরু হয়েছিল, কবরের দিকে ও কবরের ওপরে সিজদাহ করা শুরু হয়েছিল, মাসজিদগুলো হিদায়াত ও দিক নির্দেশনা থেকে বিরান হয়ে গিয়েছিল, সেগুলো মুসল্লী শূন্য হয়ে পড়েছিল। পক্ষান্তরে তাদের উপাসনালয় আবাদ হতে থাকে ও সেগুলোর উন্নতি হতে থাকে। আর একমাত্র আল্লাহ তা‘আলার ইবাদতকে বর্জন করা হয়েছিল, আল্লাহ তা‘আলার হুদূদ ও শরীআতকে প্রত্যাখ্যান করা হয়েছিল, আর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কথার ওপরে প্রাধান্য বিস্তার করেছিল বিভিন্ন মানুষের কথা এবং সূফী ও জাহেলদের কাজকর্ম। হিদায়াতের বিনিময়ে গোমরাহীকে ক্রয় করা হয়েছিল এবং আলোর বিনিময়ে অন্ধকারকে ক্রয় করা হয়েছিল।

এমন পরিস্থিতিতে শাহ ইসমাঈল শহীদ রহিমাহুল্লাহ দাঁড়ালেন, তার কলম, জবান, হাত ও অস্ত্র দিয়ে তাদের প্রতিরোধ করলেন ও সংগ্রাম করলেন। তিনি একটি কিতাব রচনা করলেন এবং সেটি শিক্ষা দিতে, ব্যাখ্যা করতে ও স্পষ্টভাবে বর্ণনা করতে শুরু করলেন। তিনি মানুষকে তার আলো দিয়ে হিদায়াতের দিকে আহবান করতেন ও তারা রেশমী পর্দায় আবৃত থাকার পরে তিনি তাদেরকে তার শিক্ষা মেনে চলার আহবান জানিয়েছিলেন, যেই পর্দার পিছনে ছিল কবরের বরকত হাসিল করা, সেটি চুম্বন করা, শপথ বা কসম করা। তিনি আল্লাহ তা‘আলার কিতাবের আলোকে একটি কিতাব রচনা করলেন, যার নাম দিলেন ‘তাকবিয়াতুল ঈমান’। এর মাধ্যমে তিনি

মানুষদেরকে এক আল্লাহ তা'আলার ইবাদত করা ও বিশুদ্ধ তাওহীদের দিকে আহবান করেন এবং শিরক পরিহার করা ও আল্লাহ ছাড়া অন্য মাশাইখ ও কবরবাসীর নিকটে সাহায্য চাওয়াকে বর্জন করার জন্য আহবান করেন। আর তিনি মানুষকে আল্লাহ ব্যতীত অন্য কাউকে ডাকতে এবং তাঁর নামে শপথ করা থেকে বিরত রেখেছিলেন এবং তাদেরকে আল্লাহ তা'আলার কিতাবের দিকে এবং যিনি সেই কিতাব স্পষ্টভাবে বর্ণনা করেন সেই রাসূল মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দিকে আহবান করেছিলেন। সাথে সাথে তিনি বাপ দাদাদের ও মাযহাবের অন্ধ তাকলীদ বর্জন করার দিকে আহবান করেছিলেন। আবার আল্লাহ তা'আলার কালেমাকে উঁচু করার জন্য ও একটি ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্টা করার তিনি তাদেরকে যুদ্ধের ময়দানের দিকেও আহবান করেছিলেন, যেই ইসলামী রাষ্ট্রে আল্লাহ তা'আলার কিতাব ও রাসূল মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সুন্নাত অনুযায়ী ফায়সালা করা হবে। তিনি, তাঁর পরিবার ও তার ছাত্ররা জিহাদের ময়দানে চলেছেন। তিনি ও তারা আল্লাহ তা'আলার রাস্তাতে লড়াই করেছেন, সারা দিনব্যাপী তারা বর্শা ও তরবারী নিয়ে নিজেদেরকে উন্মোচিত করেছেন এবং সারা দিনব্যাপী তারা আল্লাহ তা'আলার কিতাব কুরআন মাজীদ ও রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সুন্নাহ শিক্ষা দিয়েছিলেন। তারপর যখন রাত চলে আসতো, তখন তারা বিছানা থেকে নিজেদেরকে দূরে রাখতেন (অর্থাৎ রাত ব্যাপী ইবাদত করতেন)। আর যখন সকাল হতো, তখন তারা আল্লাহ তা'আলার রাস্তায় লড়াই করতেন, তারা শত্রুদেরকে হত্যা করতেন এবং নিজেরাও নিহত হতেন। তারা রাত জেগে ইবাদত করতেন আর দিনের বেলাতে সিয়াম পালন করতেন। তারা আল্লাহ তা'আলার এই বাণীর সত্যায়ণ করেছেন, যেখানে আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿إِنَّ اللهَ اشْتَرَى مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَنْفُسَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللهِ فَيَقْتُلُونَ وَيُقْتَلُونَ وَعْدًا عَلَيْهِ حَقًّا فِي التَّوْرَاةِ وَالْإِنْجِيلِ وَالْقُرْآنِ وَمَنْ أَوْفَى بِعَهْدِهِ مِنَ اللهِ فَاسْتَبْشِرُوا بِبَيْعِكُمُ الَّذِي بَايَعْتُمْ بِهِ وَذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ﴾

নিশ্চয় আল্লাহ মুমিনদের কাছ থেকে তাদের জীবন ও সম্পদ কিনে নিয়েছেন (এর বিনিময়ে) যে, তাদের জন্য আছে জান্নাত। তারা আল্লাহর পথে যুদ্ধ করে, অতঃপর তারা মারে ও মরে তাওরাত, ইঞ্জীল ও কুরআনে এ সম্পর্কে তাদের হক ওয়াদা রয়েছে। আর নিজ প্রতিজ্ঞা পালনে আল্লাহর চেয়ে শ্রেষ্ঠতর কে

আছে? সুতরাং তোমরা যে ক্রয় বিক্রয় করেছ তার জন্য আনন্দিত হও। আর সেটাই তো মহাসাফল্য (সূরা আত তাওবাহ ৯ : ১১১)।

১৬. উপমহাদেশের সালাফী ও আহলুল হাদীসদের ইমাম শাইখ নাযীর হুসাইন দেহলভী রহিমাহুল্লাহ

শাহ ইসমাইল শহীদ রহিমাহুল্লাহর পরে বেরেলভীরা তাঁর দাওয়াত ও জিহাদের উত্তরাধিকারী হাদীস বিশারদ ও মহৎ আলেম, তাঁর যুগে সাহায্যপ্রাপ্ত দলের সম্মানিত শাইখ নাযীর হুসাইন দেহলভী রহিমাহুল্লাকে কাফের বলেছিল, যিনি ভারত পাকিস্থান উপমহাদেশে সুন্নাহর পতাকা বহন করেছিলেন। তিনি অজ্ঞতা ও গোমরাহীর মেঘ দূর করে কুরআন ও সুন্নাহর আলোয় আলোকিত করেছিলেন, শাহ ওয়ালী উল্লাহ মুহাদ্দীস দেহলভীর আসনে বসেছিলেন, তাঁর নির্দেশাবলী সংশোধন ও পরিমার্জিত করেছিলেন। কট্রোরপন্থীরা কুরআন ও সুন্নাহ থেকে বিমুখ হওয়ার পরে এবং সেগুলো থেকে নিজেদেরকে গুটিয়ে নেওয়ার পরে তিনি কুরআন ও সুন্নাহর প্রতি ভারতীয়দের আকাঙ্ক্ষাকে নবায়ন করেছিলেন এবং হাদীসের প্রতি আমল পরিত্যাগ করার দীর্ঘ সময় অতিবাহিত হওয়ার পরে তিনি হাদীস অনুযায়ী আমল করাকে পুনরুজ্জীবিত করেছিলেন। তিনি এই উপমহাদেশে হাদীসের প্রসারের জন্য নিজে সক্রিয় ছিলেন এবং তার ছাত্রদেরকেও সক্রিয় করেছিলেন। তার খ্যাতি দিগ দিগন্তে ছড়িয়ে পড়েছিল, এমনকি মিশরের একজন আলেম সায়্যেদ রশীদ রেযা বলেন, এই যুগে আমাদের ভাই, ভারতীয় আলেমদের যদি উলুমুল হাদীসের বিষয়ে মনোযোগ না থাকতো, তাহলে প্রাচ্যের দেশগুলো থেকে তা বিলুপ্ত হয়ে যেতো।

এগুলো লেখার পরে তিনি বলেন, এমনকি কট্রোরপন্থী মুকাল্লিদরা এই হাদীসের কিতাবগুলো বর্ণনা করার সময় সেগুলোর মাধ্যমে বরকত হাসিল করা ও নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ওপর দরুদ পাঠ করা ছাড়া আর কোনো ফায়েদা আছে বলে মনে করতো না।

বেরেলভী ও তার অনুসারীরা এই দুই গুরুত্বপূর্ণ ইমামকে কাফের বলেছিল, যেমনভাবে তার অনুসারীরা সালাফী আহলুল হাদীসদের অনুসারীদেরকে কাফের বলেছিল, বিশেষ করে প্রথম ইমামকে তারা কাফের বলেছিল। বেরেলভী সেই ইমামের কোনো তিরস্কার করার সুযোগ পেলেই তাকে তিরস্কার করেছে, কোনোভাবে আঘাত করার সুযোগ পেলেই আঘাত করেছে। আর সে তার দাবী অনুযায়ী ইমামের কাফের হওয়ার বিষয়ে একটি স্বতন্ত্র কিতাবই

লিখেছে, যার নাম দিয়েছে, 'আল কাওকাবাতুশ শাহাবিয়্যাহ আলা কুফরিয়্যাতি আবীল ওয়াহাবিয়্যাহ'।

সে তার ভাঙা আরবীতে বলে যে, 'হে মুনাফিক, মুরতাদ ও ফাসিক লোকেরা! তোমাদের নেতা দাবী করে যে, তোমাদের একে অপরের প্রশংসার মতো হলো রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রশংসা করা। তোমাদের মতে, এর চেয়েও কম হলো, তোমাদের মুখ থেকে বিদ্বেষ প্রকাশ পেয়েছে, আর তোমাদের অন্তর যা গোপন রেখেছে তা আরো ভয়াবহ। আল্লাহ তা'আলা তোমাদের বিদ্বেষকে প্রকাশ করে দিবেন। শয়তান তোমাদের ওপর প্রাধান্য বিস্তার করেছে। ফলে সে তোমাদেরকে আল্লাহ তা'আলার স্মরণ ও রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সম্মান থেকে ভুলিয়ে রেখেছে। আর তোমাদের লাঞ্ছিত হওয়ার বিষয়ে কুরআন স্পষ্টভাবেই বলেছে। শয়তান তার বিভ্রান্তি দিয়ে তার আনুগত্যকে তোমাদের ওপর আরো বাড়িয়ে দিয়েছে এবং তার বিভ্রান্তির মধ্যে তোমাদেরকে প্রদক্ষিণ করাচ্ছে। ফলে তোমাদের ঈমান হারানোতেই সে তোমাদেরকে ঈমান বৃদ্ধি করা বলে মনে করাচ্ছে। তোমরা যার ওপর রয়েছে এভাবেই মুমিনদেরকে আল্লাহ তা'আলা ছেড়ে দিবেন না, যতক্ষণ না তিনি ভালো থেকে খারাপ পৃথক করেন, আর তোমাদের কুফরীর বিষয়ে আল্লাহ তা'আলা উদাসীন নন ('আল কাওকাবাতুশ শাহাবিয়্যাহ আলা কুফরিয়্যাতি আবীল ওয়াহাবিয়্যাহ', ৭৮ পৃ.)।'

তারপর প্রশ্নকারীর প্রশ্নে প্রতি উত্তরে সে বলে, 'ওয়াহাবীরা, যারা মুকাল্লিদ নয় এবং তাদের ইমাম, বিভিন্ন দিক থেকে এবং ফকীহগণ ও বিশিষ্ট ফাতাওয়া প্রদানকারীদের স্পষ্ট বক্তব্য অনুযায়ী যার কাফের হওয়াটা নিশ্চিতভাবে বর্ণনা করা হয়েছে, তাদের ওপর কুফরীর এই বিধান প্রমাণিত হয়েছে, তা বলবত থাকবে, আর তাওহীদের কালেমা তাদের কোনো উপকারে আসবে না এবং তাদের থেকে কুফরীও দূর হবে না। তারা ও তাদের ইমাম তার 'তাকবীয়াতুল ঈমান' কিতাবে এটি স্বীকার করেছে, যেটিকে তারা কুরআনের মতো মনে করে, যেটি হলো তাদের স্পষ্ট ও প্রকাশ্য কুফরী ('আল কাওকাবাতুশ শাহাবিয়্যাহ আলা কুফরিয়্যাতি আবীল ওয়াহাবিয়্যাহ', ১০ পৃ.)।'

আর সে শহীদ দেহলভী রহিমাহুল্লাহর কিতাব 'তানবীরুল আইনাইন' থেকে দেহলভী রহিমাহুল্লাহর কথা বর্ণনা করে, যাতে তিনি বলেন, হায়! যদি আমি জানতে পারতাম যে, নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে বর্ণিত হওয়া বর্ণনাগুলো, যেগুলো স্পষ্টভাবে কোনো ইমামের বিপরীতকে প্রমাণ করে, সেই বর্ণনাগুলোর দিকে ফিরার সক্ষমতা থাকার পরেও কিভাবে কোনো নির্দিষ্ট

ব্যক্তির তাকলীদ করা জায়েয হতে পারে? যদি তার ইমামের কথা পরিত্যাগ না করে, তাহলে তাতে শিরকের দাগ থাকবে, একটি নির্দিষ্ট ব্যক্তির আনুগত্য করা বলে গণ্য হবে, যেখানে সে তার কথাকেই আঁকড়ে ধরে থাকবে, যদিও কুরআন ও সুন্নাহর দলীল দিয়ে তার বিপরীতটি প্রমাণিত হয়।'

এটিই হলো তার কুফরীর অন্তর্ভুক্ত। এজন্য তিনি কাফের ('আল কাওকাবাতুশ শাহাবিয়্যাহ আলা কুফরিয়্যাতি আবীল ওয়াহাবিয়্যাহ', ৪৯ পৃ.)। অর্থাৎ শহীদ দেহলভী কাফের হয়ে গেছেন। কারণ তিনি মনে করেন যে, কোনো ইমামের কথার বিপরীত কিছুকে প্রমাণকারী নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হাদীসের দিকে ফিরে যাওয়া সম্ভব হলে তখন আর নির্দিষ্ট কোনো ব্যক্তির তাকলীদ করা জায়েয নয়। আর কোনো ব্যক্তির কথার জন্য সুন্নাহকে পরিত্যাগ করা জায়েয নয়। বেরেলভীর দৃষ্টিতে এটি হলো কুফরী। তাহলে এটি যদি কুফরী হয়, তবে ইসলাম কোনটি তা আমাদের জানা নেই।

কতই না আশ্চর্যের বিষয় যে, আল্লাহ তা'আলার কিতাব ও তার রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সুন্নাতের দিকে আহবান করা হলো কুফরী, আর এই দুটি ছাড়া অন্য কিছুর দিকে আহবান করা হলো ইসলাম।

সুতরাং যে ব্যক্তি ইসলামের জন্য কাঁদতে চায়, সে কাঁদুক।

এই ধরনের কারণের মতো সত্তরটি কারণে বেরেলভী এই মহান ইমাম, মুজাহিদ, সুন্নাহকে পুনরুজ্জীবিতকারী ও বিদআতকে নির্মূলকারী শহীদ রহিমাহুল্লাহকে কাফের বলে আখ্যায়িত করেছে। আর সে তার আরেকটি পুস্তিকাতে বলে, 'তাকে (ইসমাইল শহীদ) ও তার অনুসারী ওয়াহাবীদেরকে কাফের বলা আবশ্যক। কেননা তারা নিজেদেরকে মুহাম্মাদ ইবনু আব্দুল ওয়াহাব রহিমাহুল্লাহর দিকে নিজেদেরকে সম্পৃক্ত করে। তিনিই ছিলেন তাদের প্রথম শিক্ষক। তিনি কিতাবুত তাওহীদ নামে একটি কিতাব লিখেছিলেন। আর 'তাকবিয়াতুল ঈমান' তো সেই কিতাবেরই উর্দু অনুবাদমাত্র।

সুতরাং তাদের ইমাম হলো, শাইখ মুহাম্মাদ ইবনু আব্দুর ওয়াহাব নাজদী রহিমাহুল্লাহ। ইসমাইল শহীদ দেহলভী তার মতকে গ্রহণ করেছিলেন এবং তারই কিতাবকে 'তাকবিয়াতুল ঈমান' নামে অনুবাদ করেছিলেন। সুতরাং তাদের প্রথম শিক্ষকের দিকে তাদের সম্পৃক্ত করে তারা হলো ওয়াহাবী, আর দ্বিতীয় শিক্ষকের দিকে সম্পৃক্ত করে তারা হলো ইসমাঈলী। এতেই প্রমাণিত হয় যে, এই ইসমাঈলী ও ওয়াহাবীরা বিভিন্ন দিক থেকে নিশ্চিতভাবে কাফের,

তারা সকলেই মুরতাদ, বরং সকলেই কাফের ('আল কাওকাবাতুশ শাহাবিয়্যাহ আলা কুফরিয়্যাতি আবীল ওয়াহাবিয়্যাহ', ৬০ পৃ.)।'

সে আরো বলে যে, 'নিশ্চয় ইসমাইল শহীদ দেহলভী হলো স্পষ্ট কাফের (দামানি বাগিন, ১৩৪ পৃ.)।'

একবার তাকে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল যে, ইসমাইল শহীদ দেহলভী সম্পর্কে কেমন আকীদা পোষণ করা উচিত। তখন সে উত্তরে বলেছিল যে, আমরা আকীদা হলো, সে ইয়াযীদের মতো। কেউ যদি তাকে কাফের বলে, তাহলে তাকে কাফের বলাতে বাধা দেওয়া যাবে না (মালফূযাত লিল বেরেলভীয়্যাহ, ১/১১০)।

বেরেলভী যখনই ইসমাইল শহীদ রহিমাহুল্লাহর মানহানি করার সুযোগ পেয়েছে, তখনই সে মানহানি করেছে। সে তার একটি কিতাবে বলে, যা কিছু হয়েছে এবং যা কিছু ঘটবে সবই রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জানতেন। আর এমনটিই আমাদের দীনের ইমামগণ বিশ্বাস করতেন। যে ব্যক্তিই এর সাথে দ্বিমত পোষণ করবে, সেই অবাধ্য, সীমালংঘনকারী হবে ও অভিশপ্ত শয়তাদের দাসে পরিণত হবে, অর্থাৎ এটি দিয়ে সে শাহ ইসমাঈল শহীদকে উদ্দেশ্য করেছে (আল আমনু ওয়াল উলা, ১১২ পৃ.)।

সে আরো বলে যে, ইসমাইল শহীদ ইয়াহূদী চিন্তাধারার ওপর ছিলেন (আল আমনু ওয়াল উলা, ১১২ পৃ.)। ।

১৭. তাকবীয়াতুল ঈমান

আর তার কিতাব 'তাকবীয়াতুল ঈমান' সম্পর্কে তারা বলে যে, এটি ঈমান শক্তিশালী করার কিতাব নয়, বরং এটি হলো ঈমান হারানোর কিতাব। আর সে বলে যে, ওয়াহাবী ধর্মের মিথ্যা কুরআনই (অর্থাৎ সেই কিতাবটি) হলো ঈমান হারানোর কিতাব (আল আমনু ওয়াল উলা, ৭২ পৃ.)।

সে আরো বলে যে, মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দেহলভীর নিকটে 'তাকবীয়াতুল ঈমান' নামে নতুন কুরআন পাঠিয়েছে (আল আমনু ওয়াল উলা, ১৯৫পৃ.)।

আর ইসমাইল শহীদ দেহলভীর লেখনী যেমন 'তাকবীয়াতুল ঈমান', 'তানবীরুল আইনাইন', 'ইযাহুল হাক', 'আস সিরাতুল মুস্তাকিম' এগুলো সম্পর্কে সে বলে যে, 'এই সবগুলোই হলো কুফরী কিতাব। এগুলো হলো

পেশাবের মতো অপবিত্র। কেউ যদি এমনটি বিশ্বাস না করে, তাহলে তার কী হবে? সে যিনদীক হয়ে যাবে (দামানি বাগিন, ১৩৪ পৃ.)।'

তারপর সে এতেও পরিতৃপ্ত ও সন্তুষ্ট হয়নি এবং তার স্বভাব ও মেজাজ অনুযায়ী একেও যথেষ্ট মনে করেনি। তারপর সে বলে যে, তাকবীয়াতুল ঈমান বইটা পড়া হলো মদ খাওয়া ও যেনা করার চেয়েও বড় হারাম কাজ (আল আতাআন নাববীয়্যাহ ফীল ফাতওয়ার রিযভীয়্যাহ, ৬/১৮৩)।

আর এটি সুবিদিত যে, এই রাগ ও ক্রোধের কারণ হলো, তাকবীয়াতুল ঈমান মানুষের অন্তরে প্রভাব বিস্তার করেছে, তাদেরকে তাওহীদুর রুবুবিয়্যাহ ও তাওহীদুল উলুহিয়্যাহ এর সঠিক বিশ্বাসের দিকে অনুপ্রাণিত করেছে, আর শিরক থেকে তাদেরকে বিরত রেখেছে। আর নিশ্চয় শিরক হলো সবচেয়ে বড় যুলম। আর কবর থেকে বরকত হাসিল করা, মৃতদের মাধ্যমে ওয়াসিলা তালাশ করা এবং যারা কোনো উপকার বা অপকার করার মালিক নয় এবং যারা খেজুরের বিচির আবরণেরও মালিক নয়, তাদের নিকট রোগের আরোগ্য চাওয়া থেকে মানুষদেরকে এই কিতাব বিরত রেখেছে।

আর বেরেলভী তার অনুসারীদের সকলের থেকে এটি ভালোভাবে জানতো যে, যে কেউ এই ছোট, কিন্তু অনন্য দরকারী বইটি পড়বে, যেই বই হিকমাতপূর্ণ কুরআনের আয়াত ও নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সম্মানিত হাদীস দিয়ে পরিপূর্ণ, সেই ব্যক্তি অবশ্যই প্রভাবিত হবে। কেননা আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿ إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ﴾

মুমিন তো তারাই, আল্লাহকে স্মরণ করা হলে যাদের হৃদয় কম্পিত হয় এবং তার আয়াতসমূহ তাদের নিকট পাঠ করা হলে তা তাদের ঈমান বর্ধিত করে। আর তারা তাদের রবের উপরই নির্ভর করে (সূরা আল আনফাল ৮ : ২)।

মুমিনদের সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন,

﴿وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنْزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَى أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ يَقُولُونَ رَبَّنَا آمَنَّا فَاكْتُبْنَا مَعَ الشَّاهِدِينَ﴾

আর রাসূলের প্রতি যা নাযিল হয়েছে তা যখন তারা শুনে, তখন তারা যে সত্য জানে তার জন্য আপনি তাদের চোখ অশ্রু বিগলিত দেখবেন। তারা বলে, হে আমাদের রব! আমরা ঈমান এনেছি; কাজেই আপনি আমাদেরকে সাক্ষ্যবহদের তালিকাভুক্ত করুন (সূরা আল মায়েদা ৫ : ৮৩)।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দিক নির্দেশনা ও শিক্ষার পরে মুমিনদের আর কোনো ইখতিয়ার থাকে না, কেননা মুমিনরা জানে যে,

﴿وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا ﴾

আর আল্লাহ ও তাঁর রাসূল কোনো বিষয়ে ফয়সালা দিলে কোনো মুমিন পুরুষ কিংবা মুমিন নারীর জন্য সে বিষয়ে তাদের কোনো (ভিন্ন সিদ্ধান্তের) ইখতিয়ার সংগত নয়। আর যে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলকে অমান্য করল সে স্পষ্টভাবে পথভ্রষ্ট হলো (সূরা আল আহযাব ৩৩ : ৩৬)।

তারা আরো জানে যে,

﴿وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا ﴾

আর কারো নিকট সৎ পথ প্রকাশ হওয়ার পর সে যদি রাসূলের বিরুদ্ধাচরণ করে এবং মুমিনদের পথ ছাড়া অন্য পথ অনুসরণ করে, তবে যেদিকে সে ফিরে যায় সে দিকেই তাকে আমরা ফিরিয়ে দেব এবং তাকে জাহান্নামে দগ্ধ করাব, আর তা কতই না মন্দ আবাস (সূরা আন নিসা ৪ : ১১৫)।

আর তাদের এটিও অবগতিতে রয়েছে যে, আল্লাহ তা‘আলা তাদেরকে আদেশ করেছেন,

﴿وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا ﴾

রাসূল তোমাদেরকে যা দেন তা তোমরা গ্রহণ করো এবং যা থেকে তোমাদেরকে নিষেধ করে তা থেকে বিরত থাকো (সূরা আল হাশর ৫৯ : ৭)।

কেননা ইসমাঈল শহীদ দেহলভী রহিমাহুল্লাহ তার মহান কিতাব ‘তাকবীয়াতুল ঈমান’ এ আল্লাহ তা‘আলার কিতাবের ও তার রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হাদীসের একটি অংশ একত্রিত করেছিলেন এবং

সেগুলোকে মানুষজনের ভাষাতে অনুবাদ করেছিলেন যাতে করে তাদের বোঝা সহজ হয়। বেরেলভী দেখলো যে, যদি মানুষজন কুরআন ও সুন্নাহ বুঝে ফেলে, তাহলে তো কবরপুজারীদের বিনা পুঁজিতে লাভজনক ব্যবসা আর থাকবে না। ফলে তার ও তার অনুসারীদের জন্য আবশ্যক হয়ে গেল এই মহান বীরকে কাফের বলে আখ্যায়িত করা, যিনি তাওহীদের আলো দিয়ে শিরকের অন্ধকারকে দূর করতে চেয়েছিলেন এবং তিনি সুন্নাহর আলোতে অজ্ঞতার মেঘকে দূর করতে চেয়েছিলেন। কিন্তু তারা আল্লাহ তা'আলার বাণী ও তার রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বাণী দিয়ে পরিপূর্ণ কিতাবকে গালিগালাজ করতো এবং এই কিতাব পড়াকে মদ খাওয়া ও ব্যভিচার করার চাইতেও বড় হারাম কাজ মনে করতো। কেননা কোনো ধরনের কষ্ট ও পরিশ্রম ছাড়াই তাদের যে রিযিক আসতো এই কিতাব তাদের সেই রিযিক বন্ধ করে দিয়েছিল। এ জন্য তারা ইসমাইল শহীদ রহিমাহুল্লাহকে কাফের বলেছে এবং তার প্রতিনিধি উত্তরাধিকারী সকলের শাইখ সায়্যেদ নাযীর হুসাইন দেহলভী রহিমাহুল্লাহকেও তারা কাফের বলেছে। কারণ তিনি সমগ্র দিল্লী, তার আশপাশকে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বাণী দিয়ে আলোকিত করেছিলেন। আর ভারতের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে ছাত্ররা তাঁর নিকট আসতে শুরু করে। ফলে তিনি আমাদের আকাঙ্খার স্থান, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হাদীসের ছাত্রদের আশ্রয়স্থল হয়ে উঠেন। তার খ্যাতি অনারবদের ছাড়িয়ে আরবদের কাছে পৌছেছিল। ফলে দূর ও কাছের সকল স্থান থেকে লোকজন তাঁর নিকট আসতে থাকে।

১৮. শাইখ নাযীর হুসাইন দেহলভী রহিমাহুল্লাহ সম্পর্কে

শাইখ নাযীর হুসাইন দেহলভী রহিমাহুল্লাহ সম্পর্কে সেই যুগের শাইখুল মুহাদ্দিসীন এবং আহলুস সুন্নাহর ইমাম শাইখ হুসাইন ইবনু মুহসিন আল-আনসারী রহিমাহুল্লাহ একটি প্রশ্নের উত্তরে বলেন, যখন তার নিকট নাযীর হুসাইন দেহলভী রহিমাহুল্লাহ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল,

'আমি নাযীর হুসাইন দেহলভী সম্পর্কে যা জানি, বিশ্বাস করি ও যা যাচাই করেছি, সে অনুযায়ী তিনি হলেন তার যুগের অদ্বিতীয় ব্যক্তিত্ব, যুগের গুরুত্বপূর্ণ আলেমের একজন। বরং তাঁর জ্ঞান, ধৈর্য ও তাকওয়ার দিক থেকে ভারত অঞ্চলে তার মতো দ্বিতীয় আর কেউ নেই। তিনি কুরআন ও সুন্নাহ অনুযায়ী আমল করার দিকে মানুষদেরকে দিক নির্দেশনা দানকারী এবং কুরআন ও সুন্নাহ শিক্ষাদানকারীদের একজন। বরং তিনি হলেন ভারতে এই

যুগের শ্রেষ্ঠ আলেম। অধিকাংশরাই তার ছাত্র। তার আকীদা সালাফদের আকীদা, কুরআন ও সুন্নাহর সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ।

সূর্য দেখতে পেলে শনি গ্রহ তো তোমার কোনো উপকারে আসবে না

সুতরাং অধিক নিন্দাকারী হিংসুক ও লাঞ্ছিত দুষ্টদের কথাকে পরিত্যাগ করো।

কেননা হিংসার শাস্তি তার কাছেই ফিরে আসবে ও তার ওপরই আপতিত হবে।

আল্লাহ তা'আলা তার নিজ অনুগ্রহে মানুষকে যা দিয়েছেন তার জন্য কি তারা হিংসা করে?

সুতরাং যে ব্যক্তি ইমামকে গালি দিবে, যিনি সর্বোত্তম মানুষ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সুন্নাতের দিকে দিক নির্দেশনা দেন, সেই ব্যক্তি স্পষ্ট ক্ষতির সম্মুখীন হবে। কবি কতই না সুন্দর কথা বলেছেন! যে,

জেনে রেখো! যে ব্যক্তি আমার হিংসা করে তাকে বলে দাও,

তুমি কি জানো যে, তুমি কার সাথে খারাপ আচরণ করেছো?

তুমি আল্লাহর রাজত্বে আল্লাহর সাথে খারাপ আচরণ করেছো।

কেননা আল্লাহ তা'আলা আমাকে যা দিয়েছেন তার ওপর তুমি সন্তুষ্ট হতে পারোনি।

হে আল্লাহ! আপনি এই ইমাম, মহান আলেম, মুহাদ্দীস, আল্লামার সম্মান ও মর্যাদা আরো বৃদ্ধি করে দিন এবং তাঁর শত্রু ও বিরোধীদেরকে লাঞ্ছিত করুন, তাদের কাউ কেউ আপনি রেহাই দিয়েন না। সায়্যেদ নাযীর হুসাইন রহিমাহুল্লাহ সম্পর্কে আমি এটিই জানি এবং এমনই বিশ্বাস করি। আর আল্লাহ তা'আলা গোপন বিষয় সম্পর্কে সম্যক অবগত।'

সায়্যেদ আবূল হাসান আলী আল-হাসানী আন-নাদাবী রহিমাহুল্লাহর পিতা শাইখ আব্দুল হাই আল হাসানী রহিমাহুল্লাহ তার কিতাবে যা লিখেছেন আমরা এখানে তার বর্ণনা করতে চাই, যদিও এতে আলোচনাটা একটু লম্বা হয়ে যাবে:

'মহান আলেম, মুহাদ্দীস, আল্লামাহ শাইখ নাযীর হুসাইন আল হুসাইনী আল বিহারী আদ দেহলভী রহিমাহুল্লাহ, যার মর্যাদা, জ্ঞান ও হাদীসের ওপর যার দক্ষতার বিষয়ে সকলেই একমত।' এভাবে তিনি এক পর্যায়ে লিখেছেন:

তিনি দারস প্রদান করা, উপদেশ দেওয়া ও ফাতওয়া দেওয়ার ক্ষেত্রে শীর্ষে অবস্থান করেছেন। তিনি প্রতিটি জ্ঞান ও শাখাতে কিতাবের দারস দিয়েছেন, বিশেষ করে ফিকহ ও উসূল বিষয়ে। হানাফী ফিকহের প্রতি তার প্রচন্ড আগ্রহ ছিল। কিন্তু পরবর্তীতে কুরআন ও হাদীসের প্রতি ভালোবাসা অনেক বেশি জোরদার হয়। ফলে তিনি কুরআন ও হাদীসের সাথে ফিকহ ছাড়া অন্য সবগুলোর দিকে মনোযোগ দেওয়াকে পরিত্যাগ করেন।

আমি ১৩১২ হিজরীতে তার দারসে উপস্থিত হই। আমি তাকে কুরআন ও হাদীসের ইমাম হিসেবে পেয়েছি। তিনি ছিলেন উত্তম আকীদার অধিকারী, দিন রাত শিক্ষাদানে নিবেদিতপ্রাণ, প্রচুর সালাত আদায়কারী, কুরআন তেলাওয়াকারী। এছাড়াও তিনি ছিলেন বিনয়ী ও অধিক কান্না করতেন। এগুলো বিপরীত যারা, তাদের প্রতি তিনি ছিলেন কঠোর। তিনি সহনশীল ছিলেন, রসিকতা করতেন এবং অত্যন্ত সাহসী ছিলেন। আল্লাহর জন্য তিনি কোনো নিন্দুকের নিন্দা পরোয়া করতেন না। আল্লাহ তা'আলা তাকে দীর্ঘ জীবন দান করেছেন। তিনি তার জ্ঞান দিয়ে বহু আরব ও অনারবকে উপকৃত করেছেন। ভারতে তিনিই হাদীসের ক্ষেত্রে শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিতে পরিণত হন।

তাকে রহিমাহুল্লাহ আল্লাহ তা'আলার জন্য অনেকবার কষ্ট দেওয়া হয়েছে। আর মানুষজন তাকে আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামাআত থেকে বের হয়ে যাওয়া এবং ভারতের শাসকের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করার অপবাদ দিয়েছে। ব্রিটিশরা তাকে আশি বা একাশি সালে গ্রেফতার করে এবং তারা তাকে পাঞ্জাবের রাওয়ালপিন্ডি নামক শহরে স্থানান্তরিত করে। তিনি পুরো একবছর কারাগারে ছিলেন। তারপর তারা তাকে মুক্ত করে দেয়। তারপর তিনি আবার দিল্লীতে ফিরে আসেন এবং দারস দেওয়ার কাজে ব্যস্ত থাকেন, যেটি তিনি কারাগারে যাওয়ার আগে করতেন। তারপর তিনি ১৩০০ হিজরীতে হিজাযে গমন করেন। সেখানে তারা শাইখকে আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামাআত থেকে বের হওয়ার অপবাদ দেয়, আরো অপবাদ দেয় যে, তিনি নাকি বলেছেন যে, শুকুরের চর্বি হালাল, কোনো ব্যক্তির জন্য তার ফুফু বা খালাকে বিবাহ করা জায়েয, ব্যবসায়িক সম্পদে কোনো যাকাত নেই, অথচ এগুলো থেকে শাইখ সম্পূর্ণ মুক্ত ছিলেন। তারপর তারা এই ঘটনাটি মক্কার গভর্নরকে জানায়, তখন গভর্নর তাকে গেফতার করেন, সেখানে তাকে জিজ্ঞাসাবাদ করা হয় ও এক

রাত-একদিন তাকে বন্দি করে রাখা হয়। তারপর গভর্নর তাকে মুক্ত করে দেন। তারপর শাইখ যখন আবার ভারতে ফিরে আসেন, তখন তারা তাকে বিদআতী বলেছে এবং কাফের বলেছে, যেমনভাবে সালাফগণের যুগে মুজতাহিদ ইমামগণের অনেককে মানুষজন কাফের বলেছে। আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে এর জন্য যথাযথ বদলা দিবেন। তাকওয়া, দীনদারিতা, দুনিয়া বিমুখতা, জ্ঞান, আমল, পরিতুষ্ট হওয়া, চারিত্রিক নিষ্কলুষতা, আল্লাহর ওপর ভরসা করা, মানুষদের থেকে অমুখাপেক্ষী হওয়া, সত্যবাদিতা, হক কথা বলা, আল্লাহ তা'আলাকে ভয় করা, আল্লাহ তা'আলা ও তার রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে ভালোবাসা, এগুলোর ক্ষেত্রে শাইখ ছিলেন আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে স্পষ্ট নিদর্শন ও উজ্জল নিয়ামত। আল্লাহ তা'আলা যাদেরকে কুরআন ও হাদীসের কিছু জ্ঞান দান করেছেন, তারা সকলেই শাইখ নাযীর হুসাইন দেহলভী রহিমাহুল্লাহর মর্যাদা সম্পর্কে একমত (নুযহাতুল খাওয়াতির, ৪৯৮ পৃ.)।'

শাইখ আব্দুল হাই আল হাসানী রহিমাহুল্লাহ তার কিতাবে আরো লিখেছেন যে, 'সায়্যেদ নাযীর হুসাইন রহিমাহুল্লাহ লেখালেখি নিয়ে তেমন বেশি ব্যস্ত থাকেননি। যদি তিনি লেখালেখি নিয়ে ব্যস্ত থাকতেন, তাহলে হাদীসের বিষয়ে তার এতো লেখনী থাকতো, যা করো পক্ষে সম্ভব নয়। তার বেশ কয়েকটি পুস্তিকা রয়েছে। সেগুলোর মধ্যে প্রসিদ্ধ হলো,

১. মিয়ারুল হাক

২. ওয়াকাআতুল ফাতওয়া ওয়া দাফিআতুল বালওয়া

৩. সুবুতুল হাক্কিল হাকীক

৪. রিসালাতুল ওয়ালী বিত্তিবাইন নাবী এবং

৫. ফারসী ভাষাতে 'মাজমুআতুল ফাতাওয়া'

৬. আরবী ভাষাতে মীলাদে সংঘটিত হওয়া বিভিন্ন আমল বাতিল হওয়া সম্পর্কে একটি পুস্তিকা

আর সারা দেশে ছড়িয়ে থাকা বিভিন্ন বিষয়ে ফাতওয়ার সংখ্যা গণনার বাহিরে। আমার ধারণা, যদি সেগুলোকে একত্রিত করা হয়, তাহলে তা বিশাল আয়তনের কিতাবে পরিণত হবে।

১৯. শাইখ নাযীর হুসাইন দেহলভী রহিমাহুল্লাহর ছাত্রবৃন্দ

তার ছাত্ররা বিভিন্ন স্তরের ছিল। তাদের মধ্যে কিছু ছাত্র ছিল সুপরিচিতি আলেম। সম্ভবত তাদের সংখ্যা এক হাজার হবে। আবার কিছু বৈশিষ্ট্যের দিক থেকে কিছু ছাত্র এই প্রথম স্তরের ছাত্রদের মতোই ছিল। আর কিছু ছাত্র ছিল দ্বিতীয় স্তরের নিচের পর্যায়ের। এই দুই স্তরের ছাত্রদের সংখ্যা হাজার হাজার। ভারতে তাদের মধ্যে সবচেয়ে বিখ্যাত ছাত্ররা হলো, তার সন্তান সায়্যেদ শরীফ হুসাইন রহিমাহুল্লাহ, যিনি নাযীর হুসাইনের জীবদ্দশাতেই মৃত্যুবরণ করেছেন, শাইখ আব্দুল্লাহ আল-গজনভী এবং তার মুত্তাকী সন্তানরা: মুহাম্মাদ, আব্দুল জাব্বার, আব্দুল ওয়াহিদ, আব্দুল্লাহ।

তার ছাত্রদের মধ্যে আরো রয়েছে, শাইখ মুহাম্মাদ বাশীর আল-উমারী আস-সাহসাওয়ানী, সায়্যেদ আমীর হাসান, তার সন্তান আমীর আহমাদ আল হুসাইনী আস-সাহসাওয়ানী, শাইখ মুহাদ্দিস আব্দুল মান্না আল-ওয়াযির আবাদী, 'ইশাআতুস সুন্নাহ' কিতাবের লেখক শাইখ মুহাম্মাদ হুসাইন আল বাত্তালাবী, আল্লামাহ আব্দুল্লাহ ইবনু আব্দুর রহীম আল-গাজিফৌরী, সায়্যেদ মুস্তফা ইবনু ইউসূফ আশ-শরীফ আল-হাসানী, সায়্যেদ আমীর আলী ইবনু মুয়াজ্জাম আলী আল-হুসাইনী আবাদী, কাযী মোল্লা মুহাম্মাদ ইবনু কাযী মুহাম্মাদ ইবনু হাসান আল-বাশাওয়ারী, শাইখ গোলাম রাসূল আল-কালাভী, আওনুল মাবুদের লেখক মুহাদ্দিস শামসুল হক ইবনু আমীর আলী আদ-দিয়ানভী, শাইখ আব্দুল্লাহ ইবনু ইদরীস আল-হাসানী আস-সানাসী আল-মাগরিবী, শাইখ মুহাম্মাদ ইবনু নাসির ইবনুল মুবাররক আন নাজদী, শাইখ সাদ ইবনু হামদ ইবনু আতীক আন নাজদী, এছাড়া রয়েছে অস্যংখ ছাত্র।

আলেমগণ সুন্দর সুন্দর কবিতার মাধ্যমে তার প্রশংসা করেছেন। শাইখ শামসুল হক তার 'গায়াতুল মাকসূদ' কিতাবের ভূমিকাতে সেগুলো অনুবাদ করেছেন। মৌলভী ফজল হুসাইন আল-মাহদানভী আল-মুজাফফরী তার 'আল হায়াতু বা'দাল মামাত' নামক একটি স্বতন্ত্র কিতাবে সেগুলো বর্ণনা করেছেন। নাযীর হুসাইন রহিমাহুল্লাহ সম্পর্কে উর্দু ভাষাতে এটি একটি বিস্তারিত বই।

দিল্লী শহরে আমি কয়েকদিন তার সাথে ছিলাম। তিনি আমাকে পরিপূর্ণ একটি সনদ দেন, আর ১৩১২ হিজরীতে তিনি তার পবিত্র নিজ হাতে সেই সনদ লিখে দেন। তিনি রহিমাহুল্লাহ ১৩২০ হিজরীর ২০ই রজব সোমবার মৃত্যুবরণ করেন। আল্লাহ তা'আলা তার দ্বারা আমাদেরকে উপকৃত করুন। আমীন (নুযহাতুল খাওয়াতির, ৫০০- ৫০১)।'

২০. শাইখ নাযীর হুসাইন দেহলভী রহিমাহুল্লাহকে তাকফীর করার কারণ

নাযীর হুসাইন রহিমাহুল্লার মাদ্রাসাতে বুখারা ও বাগদাদের মাদ্রাসার উজ্জলতা ও সৌন্দর্যতা এসেছে। আর এই শাইখ ও তার ছাত্রদের প্রভাবে ভারতের সমস্ত শহর ও গ্রামে পবিত্র তাকওয়াশীল মানুষদের কাছে হাদীসের অনুযায়ী আমল করা খুবই প্রিয় হয়ে উঠেছে। বেরেলভীদের ব্যবসাতে মন্দা পড়েছে ও তা নষ্ট হয়ে যাচ্ছে। যার ফলে অবশ্যই এই শাইখকে অপমান করতে হবে ও শাস্তি দিতে হবে। কারণ এই শাইখ হলেন ফাসাদ সৃষ্টিকারী, শিরক, ভ্রষ্টতা ও গোমরাহীকে বিনষ্টকারী, বিদআত, কুসংস্কার ও কল্পকাহিনীকে বাতিলকারী। ফলে বেরেলভী তার থেকে একটি তীর নিয়ে এই শাইখকের দিকে নিক্ষেপ করলো। সে বললো যে,

‘নাযীর হুসাইন হলো নাস্তিকদের ইমাম, যারা গাইরে মুকাল্লিদ তাদের মুজতাহিদ, বিভিন্ন বিদআত ও কল্পকাহিনীর উদ্ভাবক (হাজিযুল বাহরাইন, ২১০ পৃ.)।’

তার মতো ব্যক্তি কি শুধু এই ধরনের অপমান করাতেই পরিতৃপ্ত হতে পারে? কখনোই নয়, সে সর্বোচ্চ স্তরে পৌঁছা পর্যন্ত পরিতৃপ্ত হয়নি। সে তার দুর্বল আরবীতে বলে,

নাযীর হুসাইন দেহলভীর দিকে সম্পৃক্তকারীরা হলো মুরতাদ, বিদ্রোহী ও প্রতারক। তাদেরকে প্রতারিত করার জন্য শয়তান তাদের নিকট ওয়াহী করে (হিসামুর হারামইন আলা মানহারিল কুফরী ওয়াল মাইন, ১৯ পৃ.)।

সে আরো বলে যে, ‘তোমাদের জন্য এই বিশ্বাস রাখা আবশ্যক যে, যেসব ব্যক্তিদেরকে আমরা কাফের বলে বর্ণনা করেছি, নাযীর হুসাইন দেহলভী তাদেরই একজন কাফের, মুরতাদ। অনুরূপভাবে এটি বিশ্বাস করাও আবশ্যক যে, ওয়াহাবিদের অন্যান্য কিতাবগুলোর সাথে ‘মিআরুল হক’ নামক তার কিতাবটি একটি স্পষ্ট কুফরী কিতাব এবং পেশাবের চেয়েও সেটি অপবিত্র এবং খারাপ (দামানি বাগিন, ১৩৬ পৃ.)।’

দেহলভীরা যেহেতু কাফের, সুতরাং অবশ্যই তাদের অনুসারী সালাফী আহলুল হাদীসরাও তেমনই। সে বলে,

‘গায়রে মুকাল্লিদরা সকলেই খাঁটি শয়তান এবং অভিশপ্ত’ (দামানি বাগিন, ১৩৪ পৃ.)। সে তাদের নিন্দা ও অপবাদ দেওয়ার জন্য তার তৈরি করা একটি আরবী কবিতাতে বলে, আর সেটি কতই না নিকৃষ্ট ও নির্বুদ্ধিতাপূর্ণ কথা:

‘কিভাবে হিদায়াতের দিকে তোমাদের প্রত্যাবর্তন হবে?

অথচ তোমাদের অন্তরে ইসমাঈল (শহীদ দেহলভী) কে ঢুকিয়ে দেওয়া হয়েছে।

আর নিশ্চয় আহলুল হাদীসরা সকলেই কাফের, মুরতাদ (দামানি বাগিন, ১২৫-১২৬ পৃ.)।’

সে আরো বলে যে, ‘গায়রে মুকাল্লিদ আহলে হাদীসরা পথভ্রষ্ট ও অন্যদেরকে পথভ্রষ্টকারী, আর ফকীহগণের বক্তব্য অনুযায়ী তারা হলো কাফের, মুরতাদ (ফতোয়া রিযভীয়্যাহ, ৬/৩৩)।’

সে আরো বলে যে, ‘গায়রে মুকাল্লিদরা বিদআতী, প্রবৃত্তির অনুসারী ও জাহান্নামী।’ সে আরো বলে যে, নিশ্চয় আহলুল হাদীসরা ধর্মত্যাগী ও নাস্তিক। তোমরা তাদের সাথে খাবে না, তাদের সাথে কোনো কিছু পান করবে না এবং তাদের সাথে বিবাহও দিবে না। কোনো ব্যক্তি যদি তাদের সাথে কোনো মহিলাকে বিবাহ দেয়, তাহলে সেই মহিলার বিবাহ বাতিল হয়ে যাবে। আর সেটি শুধু যেনা ব্যভিচার বলেই গণ্য হবে (ফতোয়া রিযভীয়্যাহ, ৫/১৩৭)।’

এই ব্যক্তি গণকের পারিতোষিক ও মাজূসদের ধর্মীয় উৎসব উপলক্ষে তাদের খাবারকে বৈধ বলেছে। যখন তাকে কোনো এক ব্যক্তি জিজ্ঞাসা করে যে, এইসব খাবার এবং হিন্দুরা আল্লাহ তা‘আলার ইবাদত ব্যতীত অন্যের ইবাদতের যেসব মিষ্টি নিয়ে আসে ও মানত করে সেগুলো খাওয়া কি জায়েয? সে এর উত্তরে বলে যে, হারাম হওয়ার দলীল না থাকার কারণে এগুলো হালাল। তারপর মাজূসরা তাদের ধর্মীয় উৎসবের জন্য যেসব খাবার নিয়ে আসে সেগুলো হালাল হওয়ার বিষয়ে সে একজন ফকীহর বক্তব্য বর্ণনা করে (ফতোয়া রিযভীয়্যাহ, ১০/৬)।’

অনুরূপভাবে আল্লাহ ছাড়া অন্যের জন্য মানত করা খাবারকেও সে বৈধ বলে (ফতোয়া রিযভীয়্যাহ, ১০/২১৯)।’

তারপর সে তার অভ্যাস অনুযায়ী শুধু তাদের কাফের বলেই ক্ষান্ত হয়নি, বরং এর সাথে সে অভিশাপ দিয়েছে এবং কুৎসিত ও নোংরাভাবে গালমন্দ করেছে। সে বলে, ‘যারা নাযীর হুসাইন দেহলভীর অনুসারী আল্লাহ তা‘আলা তাদের ওপর লানত করুন, তারা চিরকালের জন্য অভিশপ্ত, মুরতাদ (ফতোয়া রিযভীয়্যাহ, ১০/৫৯)।

২১. বেরেলভীদের গালি ও নোংরামী

এই ধরনের অপমানও তার কাছে যথেষ্ট বলে মনে হয়নি। সে এর সাথে আরো বলে যে, গায়রে মুকাল্লিদরা জাহান্নামের কুকুর। আর যারা বলে যে, রাফেযীরা তাদের চেয়ে নিকৃষ্ট এই কথা রাফেযীদের ওপর যুলম এবং আহলুল হাদীসদের নিকৃষ্টতার বিষয়ে কম করে বলা (ফতোয়া রিযভীয়্যাহ, ৬/৯০)।'

এটিই যথেষ্ট নয়। বরং সে আরো বলে, 'বরং মাজূসরা ইয়াহূদী ও নাসারাদের চেয়ে বেশি অভিশপ্ত। আর হিন্দুরা মাজূসদেরও চেয়েও বেশি অভিশপ্ত। আর ওয়াহাবিরা হিন্দুদের চেয়েও বেশি অভিশপ্ত (ফতোয়া রিযভীয়্যাহ, ৬/১৩)।'

তারপর সে এই বিষয়টির ওপর ভীষণ কঠোরতা আরোপ করে বলে,

'যে ব্যক্তি আহলুল হাদীসদের পিছনে জানাযার সালাত আদায় করবে, তার ইকতেদা করা জায়েয নয় এবং তার বিবাহও বাতিল হয়ে যাবে (ফতোয়া রিযভীয়্যাহ, ৬/১২১)।'

শুধু তাই নয়, সে আরো বলে যে, যে ব্যক্তি তাদের সাথে মুসাফাহা করবে, সে কবীরা গুণাহ করবে ও নিশ্চিতভাবে একটি হারাম কাজ করবে। আর কোনো ব্যক্তির শরীর যদি অনিচ্ছাকৃতভাবে তাদের শরীরের সাথে লেগে যায়, তাহলে তার জন্য পুনরায় ওযূ করা মুস্তাহাব (ফতোয়া রিযভীয়্যাহ, ১/২০৯)।'

তারপর তার অনুসারীরা এই সম্মানিত ও ধার্মিক ব্যক্তিদের এবং তাদের অনুসারীদেরকে কাফের ঘোষণা দেওয়ার ক্ষেত্রে তার অনুসরণ করে। তার অনুসারীদের একজন বলে,

আহলুল হাদীসরা হলো নাযীর হুসাইন দেহলভী, আমীর আহমাদ সাহসাওয়ানী, আমীর হাসান সাহসাওয়ানী, বাশীর হাসান কানওয়াজী, মুহাম্মাদ বাশীর কানওয়াজীর অনুসারী। পবিত্র শরীআতের বিধান অনুযায়ী এরা সকলেই নিশ্চিতভাবে কাফের, মুরতাদ, চিরস্থায়ী কঠিন আযাবের হকদার ও একমাত্র মহান রবের লানতের হকদার (তাজানুবু আহলিস সুন্নাহ আন আহলিল ফিতনাহ, ২১৯ পৃ.)।'

সে অন্যত্র বলে, পবিত্র শরীআতের বিধান অনুযায়ী সানাউল্লাহ অমৃতসরীসহ এদের অনুসারীরা সকলেই কাফের, মুরতাদ (তাজানুবু আহলিস সুন্নাহ আন আহলিল ফিতনাহ, ২৪৮ পৃ.)।'

২২. শাইখুল ইসলাম (সানাউল্লাহ অমৃতসরী)

শাইখুল ইসলাম (সানাউল্লাহ অমৃতসরী), তার যুগের মুসলিমরা, ইসলামী সম্প্রদায়ের প্রতিনিধিরা, প্রতিরক্ষক এবং বিতর্ককারীরা, যাদের সম্পর্কে শাইখ রশীদ রেযা আল-মিসরী বলেন, তারা হলেন ভারতের ঐশ্বরিক পুরুষ' (মুজাল্লাতুল মানার, ৬৩৯), আর যিনি কাদিয়ানী, আর্য, হিন্দু, মাজূসসহ অন্যান্য সকল কাফির ও বাতিল ফিরকা এবং ইসলাম ও সকল আসমানী শরীআতের বিরোধী দলগুলোকে নীরব করে দিয়েছিলেন (অর্থাৎ সানাউল্লাহ অমৃতসরী) তার সম্পর্কে বেরেলভীরা বলে যে,

'নিশ্চয় সানাউল্লাহ অমৃতসরী ও গায়রে মুকাল্লিগ সালাফী আহলে হাদীসের নেতা হলো মুরতাদ (তাজানুবু আহলিস সুন্নাহ আন আহলিল ফিতনাহ, ২৪৭ পৃ.)।'

বেরেলভী নিজেই শাইখুল ইসলাম সম্পর্কে বলে যে, 'নিশ্চয় সানাউল্লাহ অমৃতসরী ইসলামের নাম দিয়ে নিজেকে গোপন রেখেছে, আসলে সে হিন্দুদের গোলাম (আল ইসতেমদাদ লিল বেরেলভী, ১৪৭ পৃ.)।'

যেহেতু ইসমাইল শহীদ দেহলভী রহিমাহুল্লাহ কাফের, শাহ ওয়ালিউল্লাহ মুহাদ্দিস দেহলভী রহিমাহুল্লাহ কাফের এবং তাদের ছাত্ররা ও তাদের অনুসারীরাও কাফের। সুতরাং এতে আবশ্যক হয় যে, তাদের পূর্ববর্তী নেতা, কুরআন ও সুন্নাহর দিকে আহবানকারীরাও কাফের, মুরতাদ, আমরা আল্লাহ তা'আলার নিকটে এ থেকে আশ্রয় চাই।

২৩. হাফেয ইবনু হাযম আন্দালুসী আয-যাহেরী রহিমাহুল্লাহ

প্রকৃতপক্ষে পূর্ববর্তীরা তার কথা অনুযায়ী কুফরী করেছে, যেমন শাইখুল ইসলাম মহান ইমাম ইবনু তাইমিয়্যাহ রহিমাহুল্লাহ, হাফেয ইবনু হাযম আন্দালুসী আয-যাহেরী রহিমাহুল্লাহসহ আরো অন্যান্য হকের দিকে আহবানকারী ও সত্যের পথপ্রদর্শক। তাদের সম্পর্কে বেরেলভী বলে,

'এই মানুষের শিক্ষক হলো নিকৃষ্ট ইবলীস, আল্লাহ তা'আলা তার ওপর লানত করুন। তাদের নেতা হলো ইবনু হাযম, যে হলো নিকৃষ্ট মনোভাবের অধিকারী, সিদ্ধান্তহীন ব্যক্তি, যাহেরী এবং নিকৃষ্ট প্রকৃতির মানুষ (সুবহানাস সাবূহ, ৩৭ পৃ.)।'

সে আরো বলে যে, 'ইবনু হাযম ছিলো ধর্মত্যাগী ও নিকৃষ্ট কথাবার্তা বলা মানুষ (হাজিযুল বাহরাইন, ২/২৩৭)।'

২৪. শাইখুল ইসলাম ইমাম ইবনু তাইমিয়্যাহ রহিমাহুল্লাহ

আর সে শাইখুল ইসলাম ও আহলুস সুন্নাতের ইমাম ইবনু তাইমিয়্যাহ রহিমাহুল্লাহ সম্পর্কে বলে যে, 'নিশ্চয় ইবনু তাইমিয়্যাহ হলো বিবেক ছাড়াই কথা বার্তা বলা ব্যক্তি (ফতোয়া রিযভীয়্যাহ, ৩/৩৯৯)।'

বেরেলভীর একজন খলীফা নাইমুদ্দীন আল-মুরাদাবাদী বলে, 'নিশ্চয় ইবনু তাইমিয়্যাহ শরীআতের রীতি নীতিকে নষ্ট করেছে। তারপর সে তার মতো একজনের কথা বর্ণনা করে, যেখানে বলা হয়েছে, ইবনু তাইমিয়্যাহ এমন এক গোলাম, যাকে আল্লাহ তা'আলা লাঞ্ছিত, পথভ্রষ্ট, অন্ধ, বধির করেছেন। আর নিশ্চয় সে বিদআতী, পথভ্রষ্ট, অন্যকে পথভ্রষ্টকারী, জাহেল এবং সীমালংঘনকারী (সাইফুল মুস্তফা লিল বেরেলভী, ৯২ পৃ.)।'

বেরেলভীর আরেক অনুসারী বলে, 'ইবনু তাইমিয়্যাহ হলো পথভ্রষ্ট ও অন্যকে পথভ্রষ্টকারী (ফাতাওয়া সাদরিল আফাযিল, ৩১-৩২ পৃ.)।'

'ইবনু তাইমিয়্যাহর মাযহাব খুবই খারাপ মাযহাব ছিল (জায়াল হাক্ক, আহমাদ রেযা)।'

২৫. হাফিয ইবনুল কাইয়্যিম রহিমাহুল্লাহ

ইবনুল কাইয়্যিম সম্পর্কে সে বলে যে, 'ইবনুল কাইয়্যিমের বক্তব্যের ওপর কোনো নির্ভরতা নেই। কেননা সে ছিল নাস্তিক (ফতোয়া রিযভীয়্যাহ, ৪/১৯৯)।'

২৬. ইমাম শাওকানী রহিমাহুল্লাহ

যেহেতু এমন ইমামরা ধর্মত্যাগী, নাস্তিক, সুতরাং এতে আবশ্যক হয় যে, তাদের পথ অনুসরণকারী ইমাম শাওকানী রহিমাহুল্লাহও তাদের মতোই। বেরেলভী ইমাম শাওকানী সম্পর্কে বলে যে,

'পরবর্তী ওয়াহাবিদের মতো শাওকানীর কম বিবেক সম্পন্ন ব্যক্তি (ফতোয়া রিযভীয়্যাহ, ২/৪৪২)।'

'শাওকানীর মাযহাব হলো খুবই খারাপ মাযহাব (সাইফুল মুস্তফা, ৯৫ পৃ.)।'

২৭. মুহাম্মাদ ইবনু আব্দুল ওয়াহাব রহিমাহুল্লাহ ও তার অনুসারীবৃন্দ

আরব উপদ্বীপে সালাফী দাওয়াতের মুজাদ্দিদ, তাওহীদপন্থিদের ইমাম, সুন্নাতকে পুনরুজ্জীবিতকারী, শিরক ও বিদআতকে উচ্ছেদকারী শাইখুল

ইসলাম মুহাম্মাদ ইবনু আব্দুল ওয়াহাব রহিমাহুল্লাহ ও তার অনুসারীরা হলেন, বেরেলভী ও তার অনুসারী যেমন আরব দেশে তার বিদআতী ও কবরপূজারী ভাইদের প্রধান লক্ষবস্তু। কেননা পৃথিবীর যেখানেই কোনো বিদআতী অথবা কবর পূজারীকে পাওয়া যেতো, তাকেই শাইখ তার পথের বাধা প্রতিবন্ধক মনে করতেন।

বেরেলভী ও তার অনুসারীরা এই মাযলূম ইমামের বিরুদ্ধে যত খারাপ শব্দ পেয়েছে, সবগুলো তার জন্য প্রয়োগ করেছে এবং ইমামের বিরুদ্ধে যত ফাতওয়া দিতে সক্ষম হয়েছে সবগুলোই তারা করেছে।

বেরেলভী বলে, ‘একটি হাদীস বর্ণিত হয়েছে যে, যাদের নাম হবে আহমাদ ও মুহাম্মাদ, কিয়ামতের দিন আল্লাহ তা‘আলা বলবেন, তোমরা উভয়েই জান্নাতে প্রবেশ করো। কেননা আমি নিজের ওপর লিখে দিয়েছি যে, যাদের নাম হবে আহমাদ, মুহাম্মাদ তাদেরকে আমি জাহান্নামে প্রবেশ করাবো না।’ তারপর তার মনে আসে যে, এই বর্ণনাতে তো তাহলে শাইখুল ইসলাম মুহাম্মাদ ইবনু আব্দুল ওয়াহাব রহিমাহুল্লাহও অন্তর্ভুক্ত হন, কেননা তার নাম হলো মুহাম্মাদ, তখন বেরেলভী বলে যে,

এই হাদীসসহ অন্যান্য হাদীস যেমন, ‘কোনো ব্যক্তির যদি কোনো সন্তান জন্মগ্রহণ করে, আর সে যদি তার নাম রাখে মুহাম্মাদ, তাহলে সে ও তার সন্তান উভয়েই জান্নাতে যাবে।’ এই বর্ণনাগুলোতে শুধু সহীহ আকীদার আহলুস সুন্নাহ অর্থাৎ শুধু বেরেলভীরাই অন্তর্ভুক্ত হবে। কেননা খারাপ মাযহাবের লোক জাহান্নামের কুকুর হবে। তাদের থেকে কোনো আমলই কবুল করা হবে না। তাদের কোনো ব্যক্তিকে যদি হাজরে আসওয়াদ ও মাকামে ইবরাহীমের মধ্যবর্তী স্থানে হত্যা করা হয়, আর সে যদি আল্লাহ তা‘আলার ক্ষমা ও প্রতিদান পাওয়ার আশাতে ধৈর্যধারণ করে, তবুও আল্লাহ তা‘আলা তার দিকে তাকাবেন না এবং তাকে জাহান্নামে নিক্ষেপ করবেন। আর এটি অনেক স্থানে আমার ফাতওয়াতে আমি স্পষ্টভাবে বলেছি। সুতরাং এই হাদীসে মুহাম্মাদ ইবনু আব্দুল ওয়াহাব নাজদীসহ অন্যান্য পথভ্রষ্টদের জন্য কোনো সুসংবাদ নেই (আহকামুশ শারীআহ, লিল বেরেলভী, ১/৮০)।’

সে আরো বলে যে, ‘সবচেয়ে নিকৃষ্ট মুরতাদ হলো ওয়াহাবিরা (আহকামুশ শারীআহ, লিল বেরেলভী, ১/১২৩)।’

সে আরো বলে, ইয়াহূদী, নাসারা, মূর্তিপূজক ও মাজূসদের চেয়েও ওয়াহাবিরা বেশি নিকৃষ্ট, অনিষ্টকর ও খারাপ (আহকামুশ শারীআহ, লিল বেরেলভী, ১/১২৪)।'

সে আরো বলে যে, ওয়াহিবা নিজেদেরকে মুহাম্মাদ ইবনু আব্দিল ওয়াহাব আন-নাজদীর দিকে সম্পৃক্ত করে। ইবনু আব্দিল ওয়াহাব আন-নাজদী কিতাবুত তাওহীদ নামক কিতাব লিখেছে, পবিত্র দুই হারামের অবমাননা করেছে, আল্লাহ তা'আলা যেন এই পবিত্র দুই হারামের মর্যাদা ও সম্মান আরো বাড়িয়ে দেন, সে দুই হারামে অভিযান চালিয়ে সেখানে অন্যায়, অবিচার ও হত্যাকাণ্ড চালিয়েছে। ইবনু আব্দুল ওয়াহাব তার দলের ব্যতীত অন্য সকল মুসলিমদেরকে মুশরিক হিসেবে গণ্য করেছে। সুতরাং অবশ্যই এই ওয়াহাবীদেরকে কাফের আখ্যায়িত করতে হবে। আর তার দলটি হলো খারেজীদের একটি শাখা, যেই খারেজীরা আমাদের নেতা আলী রাদিয়াআল্লাহ আনহুর বিরুদ্ধে বেরিয়েছিল, আল্লাহ তা'আলার সিংহকে হত্যা করার কারণে তারা জাহান্নামে প্রবেশ করেছে, যাদের সম্পর্কে হাদীসে বর্ণিত হয়েছে যে, কিয়ামত পর্যন্ত তাদের অবসান হবে না, যতদিন তাদের শেষ ব্যক্তি লানতপ্রাপ্ত দাজ্জালের সাথে বের না হবে। এই সত্য প্রতিশ্রুতির কারণে এই অভিশপ্ত সম্প্রদায় সর্বদাই ফিতনা ছড়াতেই থাকবে। এই তেরশ শতাব্দীতে তারা নাজদ এলাকাতে বের হয়েছে, আর সেখানে তারা নাজদী নামে প্রসিদ্ধ হয়েছে। আর তাদের ইমাম হলো শাইখ নাজদী। এমনকি শেষ পর্যন্ত আল্লাহ তা'আলা তাদের শক্তিকে শেষ করে দিয়েছেন, তাদের দেশকে ধ্বংস করেছেন এবং এবং মুসলিমদের দল ১২৩৩ হিজরিতে তাদের ওপর বিজয়ী হয়েছে (আল কাওকাবাতুশ শাহাবিয়্যাহ, ৫৮-৫৯)।'

জনৈক ব্যক্তি তাকে ওয়াহাবীদের দল সম্পর্কে জিজ্ঞেস করে, যারা খোলাফায়ে রাশেদীনের যুগে ছিল, এর উত্তরে বেরেলভী বলে যে,

'হ্যাঁ, এরা আলী রাদিয়াআল্লাহু আনহুর বিরুদ্ধে বের হয়েছিল। এখন তারা ওয়াহাবী নামে আত্মপ্রকাশ করেছে, আর তাদের ইমাম হলো ইবনু আব্দুল ওয়াহাব আন নাজদী। হাদীসে তাদের নিদর্শনসমূহ বর্ণিত হয়েছে, সেগুলো তাদের মাঝে পরিপূর্ণভাবে বিদ্যমান। সেগুলো হলো, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন যে, তাদের সালাতের নিকটে তোমাদের সালাতকে তোমরা তুচ্ছ মনে করবে, তাদের সিয়ামের কাছে তোমাদের সিয়ামকে তোমরা তুচ্ছ মনে করবে, তাদের আমলের কাছে তোমাদের আমলকে তোমরা তুচ্ছ মনে করবে। তারা কুরআন তিলাওয়াত করবে, কিন্তু

তা তাদের কণ্ঠনালী অতিক্রম করবে না। এমনটিই বলেছেন সর্বশ্রেষ্ঠ সৃষ্টি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম। তারা দীন থেকে তেমনভাবে বেরিয়ে যাবে, যেভাবে তীর তার লক্ষ ভেদ করে বেরিয়ে যায়। বিশেষভাবে তাদের মাথা মুণ্ডন করা থাকবে। ইবনু আব্দুল ওয়াহাব আন নাজদী মাথা মুণ্ডনের ক্ষেত্রে খুব অতিরঞ্জকারী ছিল। এমনকি এক মহিলা তার অপবিত্র দীনে প্রবেশ করেছিল। তখন সে সেই মহিলারও মাথা মুণ্ডন করতো (মালফূযাতু মুজাদ্দিদিল মিআতিল হাযিরাহ, ৬৬ পৃ.)। ’

এছাড়াও আরো অনেক কল্পকাহিনী রয়েছে।

সে আরো বলে, ‘ইবনু আব্দুল ওয়াহাবের পিতৃপুরুষ নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের যুগে ছিল। নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আবূ বকর সিদ্দীক ও উমার ফারূক রাদিয়াল্লাহু আনহুমাকে নির্দেশ দিয়েছিলেন তাকে হত্যা করার জন্য। তখন তাকে যদি হত্যা করা হতো, তাহলে আজ আর এই ফিতনা থাকতো না (মালফূযাতু মুজাদ্দিদিল মিআতিল হাযিরাহ, ৬৭-৬৮ পৃ.)।’

তার এক অনুসারী লিখেছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নাজদী এই ফিতনা সম্পর্কে ভবিষ্যদ্বাণী করেছেন, এই বলে যে, সেখানে ভূমিকম্প ও ফিতনা হবে। আর সেখানে শয়তানের শিং উদিত হবে। আর পৃথিবীর সকল আহলুস সুন্নাহ ও হানাফীরা একমত যে, মুহাম্মাদ ইবনু আব্দুল ওয়াহাব খারেজী ও সীমালংঘনকারী ছিল। যে ব্যক্তি তার আকীদাতে বিশ্বাস করে, সে হলো দীনের শত্রু, পথভ্রষ্ট ও অন্যকে পথভ্রষ্টকারী (আল হাক্কুল মুবীন, আহমাদ সাঈদ কাযিমী বেরেলভী, ১০-১২ পৃ.)।

আমজাদ আলী রেজভী আল-বেরেলভীও তার কিতাবে এমন কথাই বলেছে (বিহারু শারীআত, ১/৪৬-৪৭)।

অন্য আরেকজন ব্যক্তি, যে মিথ্যা অভিযোগ ও অপবাদ দেওয়ার ক্ষেত্রে পূর্ববর্তী মিথ্যাবাদীদেরকে ছাড়িয়ে গিয়েছে, সেই ব্যক্তি বলে যে, নাজদী ওয়াহাবীরা পবিত্র হারামাইনে মানুষদেরকে বিনা অপরাধে হত্যা করেছে, তাদের নারী ও কন্যাদের সাথে ব্যভিচার করেছে, তাদেরকে বন্দি করেছ, নারীদেরকে ক্রীতদাস বানিয়েছে এবং সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিদের ওপর ব্যাপকভাবে হত্যাযজ্ঞ চালিয়েছে। ইবনু সাউদ পবিত্র হারামাইনে যে কাজ করেছে প্রত্যেক হাজীদের কাছেই তা স্পষ্ট, আর আমি নিজে আমার দুই চোখ দিয়ে দেখে এসেছি (জাআল হাক্ক ও যাহাকাল বাতিল, আহমাদ ইয়ার, ৫৭৪ পৃ.)।

এর সাথে সাথে বেরেলভী ভবিষ্যদ্বানী করে যে, 'নাজদীরা পবিত্র হারামাইনে বেশি দিন শাসন করতে পারবে না। আল্লাহ্ তা'আলা তাদের শক্তিকে ভেঙ্গে দিবেন এবং তাদেরকে লাঞ্ছিত করবেন।'

মাযহার বেরেলভী যত নিকৃষ্ট কথা পেয়েছে সবগুলোই সে ওয়াহাবীদের সম্পর্কে বলেছে। সে বলেছে যে, 'নাজদীরা হলো নাজদ এলাকার নাস্তিক ও যিনদীক। নাজদের এই শয়তানরা তাদের নিকৃষ্ট অভিশপ্ত আকীদার কারণে নিশ্চিতভাবে তারা কাফের মুরতাদ (তাজানুবু আহলিস সুন্নাহ, ২৬৭-২৬৮)।'

আর সে মুম্বাইতে মসজিদের ইমাম আহমাদ ইউসূফ সম্পর্কে বলেছিল, যিনি ভারত সফরের সময় মুম্বাইতে সৌদি রাজপুত্রদেরকে অভ্যর্থনা জানিয়েছিলেন, তার সম্পর্কে সে বলে যে,

'ইবনু সাউদের পুত্রদেরকে আহমাদ ইউসূফ অভ্যর্থনা জানিয়েছিল, সে নাজদী সরকার, ইবনু সাউদ নাজদী ও তার পুত্রদের প্রশংসা করেছিল অথচ সেই সরকার কুফরী নিকৃষ্ট আকীদাতে বিশ্বাস করে। আর সে কাফের মুরতাদদেরকে সম্মান করেছিল, তাদেরকে স্বাগত জানিয়েছিল এবং নাজদী নিকৃষ্ট মিল্লাতকে সে সম্মান করেছিল। এর মাধ্যমে সে কুফরী করেছে এবং মুরতাদ হয়ে গিয়েছে। আর সে ইলাহী গযবের উপযুক্ত হয়ে গিয়েছে। সে ইসলাম ও সুন্নাহকে ধ্বংস করে ইলাহী আরশকে কাপিয়ে তুলেছে। যে ব্যক্তি তার কাফের হওয়ার বিষয়ে সন্দেহ করবে, সেও কাফের হয়ে যাবে (তাজানুবু আহলিস সুন্নাহ, ২৬৮-২৭২)।'

বেরেলভী ও তার অনুসারীদের নিকটে শাইখুল ইসলাম, তার অনুসারীদেরকে এবং সউদী সরকারকে কাফের বলা, ফাসেক বলা ও গাল মন্দ করা হলো সামান্য ব্যাপার।

আমরা এমন কাউকে দেখি না, যারা এই লোকদেরকে এতটা রাগান্বিত করেছিল, যতটা রাগান্বিত করেছিল তাওহীদপন্থী বান্দারা, যারা আল্লাহ তা'আলার কিতাবের ওপর বিশ্বাস করে এবং রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সুন্নাতকে আঁকড়ে ধরে। বেরেলভী সম্প্রদায়ের লোকজন যত কষ্টদায়ক ও নোংরা কথা পেয়েছে সবগুলোই তারা তাওহীদপন্থীদের জন্য প্রয়োগ করেছে। তাদের প্রবীণ ও কনিষ্টরা তাওহীদপন্থী বান্দাদের খণ্ডনে বহু কিতাব লিখেছে, যেগুলোতে তাদের খণ্ডন ছাড়া মুসলিমদেরকে উপদেশ দেওয়া নসীহত করা, আল্লাহ তা'আলার ইবাদতের প্রতি উৎসাহ দেওয়া, বান্দাদের হক আদায় করা, তাদের সাথে উত্তমভাবে চলাফেরা করা,

সদাচারণ, অন্যের হকের দিকে খেয়াল রাখাসহ অন্যান্য ইসলামী শিক্ষার বিষয়গুলো নেই বললেই চলে। অনুরূপভাবে যারা ইসলাম থেকে বেরিয়ে গেছে এবং ইসলামের নামে বাড়াবাড়ি করেছে যেমন, কাদিয়ানী, হিন্দু, খ্রিষ্টান, বাহাই, বাতিনী, রাফেযীসহ অন্যান্য সম্প্রদায়ের খণ্ডনের বিষয়ে তাদের কিতাবগুলো কোনো আলোচনা নেই।

গবেষক ও পাঠকরা যখন দেখে যে, এই সম্প্রদায়ের কিতাবগুলো এই উম্মতের সংস্কারক ও পথপ্রদর্শকদের বিরুদ্ধে সবচেয়ে জঘন্য, অনৈতিক ও কুৎসিত কথাতে পরিপূর্ণ, অথচ সেগুলো ইসলাম ও মুসলিমদের শত্রু, আল্লাহ তা'আলা ও তার রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের শত্রুদের বিরুদ্ধে কোনো আলোচনা নেই, তখন তারা অত্যন্ত আশ্চর্য হয়।

এটি হলো এই সম্প্রদায়ের স্বভাব, আর এটি হলো আহলুল হাদীস এবং শাইখুল ইসলাম মুহাম্মাদ ইবনু আব্দুল ওয়াহাব রহিমাহুল্লাহর অনুসারীদের সাথে তাদের অবস্থা।

ইমাম নুমান ইবনু সাবিত আল-কূফী রহিমাহুল্লাহর অনুসারী হানাফীদের ভাই দেওবন্দীরাও বেরেলভীদের হৃদয়ের কঠোরতা, তাদের জিহ্বার কঠোরতা, ফাসেক ও কাফের বলার শক্ত ফাতওয়া, তাদের নোংরা গালি গালাজ, ধারাবাহিকভাবে দেওয়া লানত থেকে নিরাপদ ছিল না। বরং দেওবন্দীরাই বেরেলভীদের জিহ্বা, তীক্ষ্ণ বর্শা ও তীরের সবচেয়ে বড় লক্ষ্যবস্তুতে পরিণত হয়েছিল। বেরেলভীরা তাদের ছোট বড় কাউকেই ছাড় দেয়নি, বরং প্রত্যেককেই তারা ফাসেক বলেছে এবং কাফের বলে আখ্যায়িত করেছে। আর তাদের মুরতাদ হওয়ার বিষয়ে যে ব্যক্তি সন্দেহ করেছে তাকেও বেরেলভীরা মুরতাদ বলেছে এবং তাদের কাফের হওয়ার বিষয়ে যে ব্যক্তি সন্দেহ করেছে তাকেও তারা কাফের বলেছে। বেরেলভী সর্বপ্রথম তাদেরকে কাফের বলা শুরু করেছে। তারপর বেরেলভীদের সর্বশেষ ব্যক্তিও তাদেরকে কাফের বলেছে এবং যারা তাদেরকে কাফের বলতে দেরী করেছে তাদেরকেও বেরেলভীরা কাফের বলেছে।

২৮. শাইখ ইমাম মহান আলেম কাসেম নানূতূভী

দেওবন্দী আলেমদের মধ্যে সর্বপ্রথম যাকে কাফের বলে ঘোষণা করা হয়, তিনি হলেন শাইখ দেওবন্দ আল-কাবীর, যিনি ভারতীয় উপমহাদেশে, বরং প্রকৃতপক্ষে সারা বিশ্বের মধ্যে 'দারুল উলুম দেওবন্দ' নামে সবচেয়ে বড় হানাফী মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠা করেন। তার সম্পর্কে শাইখ আব্দুল হাই আল-হাসানী

বলেন, ‘শাইখ ইমাম মহান আলেম কাসেম নানূতূভী হলেন একজন রব্বানী আলেম। তিনি সেই যুগে সবচেয়ে বড় দুনিয়া বিমুখ মানুষ ছিলেন। আর তিনি সবচেয়ে বেশি ইবাদতগুজার, সবচেয়ে বেশি আল্লাহর যিকিরকারী মানুষ ছিলেন। আর তিনি শুধু বাহ্যিকভাবে পাগড়ি, চাদর দিয়ে আলেমদের পোশাক পরা ও ফকীহ সাজা থেকে অনেক দূরে ছিলেন। সেই যুগে তিনি ফাতওয়া দিতেন না এবং প্রসিদ্ধও ছিলেন না। বরং তিনি সর্বদাই আল্লাহ তা‘আলার যিকিরে নিমগ্ন ছিলেন, এমনকি শেষ পর্যন্ত তার কাছে জ্ঞান ও সত্যের দ্বার উন্মুক্ত হয়। তারপর শাইখ ইমদাদুল্লাহ তাকে খলীফা হিসেবে নিযুক্ত করেন এবং শাইখ ইমদাদুল্লাহ এভাবে তার প্রশংসা করেন যে, কাসিমের মতো এই যুগে আর কেউ নেই। খ্রিস্টান ও আর্যদের বিরুদ্ধে বিতর্কের ক্ষেত্রে তার খুবই সুন্দর অবদান ছিল। তিনি ১২৯৭ হিজরিতে মৃত্যুবরণ করেন (নুঝহাতুল খাওয়াতির, ৭/৩৮৩-৩৮৪)।’

বেরেলভীরা এই শাইখকেও কাফের বলেছে, যেই শাইখ হলেন তার যুগে হানাফীদের ইমাম, ‘দেওবন্দী’ নামে পরিচিত আন্দোলনের প্রতিষ্ঠাতা। এই শায়খের সম্পর্কে বেরেলভী তার দুর্বল আরবীতে বলে,

‘কাসেমীরা ‘তাহযীরুন নাস’ কিতাবের লেখক কাসেম নানূতূভী এর দিকে নিজেদেরকে সম্পৃক্ত করে। সেই কিতাবে তিনি বলেন যে, ‘ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের যুগে অথবা তার পরবর্তীতে কোনো নতুন নবী আসতো, তবুও রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সর্বশেষ নবী হওয়াটা বাতিল হতো না। বরং সাধারণ মানুষরা মনে করতো যে, তিনি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সর্বশেষ নবী। যদিও জ্ঞানীদের নিকটে এই বিষয়ে মূলগতভাবে কোনো ফযীলত নেই।’ নানূতূভী হলো মুহাম্মাদ আলী কানপূরী, তিনি ‘হাকীমুল উম্মাহ আল-মুহাম্মাদীয়া’ নামক সংগঠনের প্রতিষ্ঠাতা। সুতরাং আমি সেই সত্তার পবিত্রতা বর্ণনা করছি, যিনি অন্তর ও দৃষ্টিসমূহের পরিবর্তনকারী। এক, পরাক্রমশালী, সর্বজয়ী ও মহাক্ষমাশীল আল্লাহ তা‘আলার শক্তি ছাড়া আর কোনো শক্তি নেই। এরা সকলেই হলো অবাধ্য, অভিশপ্ত ও ধর্মত্যাগী (হিসামুল হারামাইন আলা মানহারিল কুফরী ওয়াল মাইন, বেরেলভী, ১৯ পৃ.)।’

সে আরো বলে যে, কাসেমীরা, আল্লাহ তা‘আলা তাদের ওপর লানত করুন, তারা হলো অভিশপ্ত, চিরন্তন ধর্মত্যাগী (ফতোয়া রিযভীয়্যাহ, ৬/৫৯)।’

বেরেলভীর এক অনুসারী বলে যে, 'তাহযীরুন নাস' কিতাবটি মুরতাদ, নিকৃষ্ট নানূতূভীর কিতাব, যে ব্যক্তি দেওবন্দ প্রতিষ্ঠা করেছিল (তাজানুবু আহলিস সুন্নাহ, ১৭৩)।'

পক্ষান্তরে দেওবন্দের একজন নেতা ও তাদেরই একজন শাইখ সায়্যেদ আল-হাসানী নানূতূভী সম্পর্কে লিখেছেন যে,

'শাইখ ইমাম আল্লামাহ মুহাদ্দীস রশীদ আহমাদ ইবনে হিদায়াহ আহমাদ ইবনে পীর বাখশ ইবনে গোলাম হাসান ইবনে গোলাম আলী ইবনে আলী আকবর ইবনে কাযী মুহাম্মাদ আসলাম আল-আনসারী আল-হানাফী রামপূরী জানজূহী হলেন একজন মুহাক্কি আলেম এবং বিশিষ্ট গবেষক। সততা, চারিত্রিক নিষ্কলুষত, তাওয়াক্কুল, জ্ঞানার্জন, বীরত্ব, ঝুঁকি নেওয়ার সাহসিকতা, ধর্মে দৃঢ়তা, মতের ওপর অটলতার ক্ষেত্রে তার যুগে তার সমতুল্য আর কেউ ছিল না (নুঝহাতুল খাওয়াতির, ৮/১৪৮)।'

তার সম্পর্কে বেরেলভী ও তার অনুসারীরা বলে যে,

২৯. রশীদ আহমাদ গাংগুহী

ইসলামের নামে নিজেদেরকে গোপনকারী কাফেররা হলো রশীদ আহমাদ গাংগুহী ও আলী হযরত সামাদীর অনুসারী মিথ্যাবাদী ওয়াহাবীরা। ইসমাইল শহীদ দেহলভী যেই মতাদর্শের ওপর ছিল রশীদ আহমাদ ও আলী হযরত তারই অনুসরণ করেছে। আর আমি একটি স্বতন্ত্র কিতাবে তার বাজে কথার জবাব দিয়েছি, সেই কিতাবের নাম দিয়েছি 'সুবহানাস সুব্বুহ আন আইবি কাযিবিম মাকবূহ'। তারপর পোস্টের মাধ্যমে তার নিকটে এই কিতাব পাঠিয়েছি। তারপর এগার বছর থেকে এর উত্তর আসছে! তারা এটা প্রচার করেছে যে, সে নাকি এর জবাব লিখেছে এবং ছাপানোর জন্য তা পাঠিয়েছে। কিন্তু আল্লাহ তা'আলা বিশ্বাস ঘাতকদের ষড়যন্ত্রকে সফল করেন না। তারপর তারা উঠেও দাঁড়াতে পারেনি, আবার প্রতিশোধও নিতে পারেনি। এখন যে ব্যক্তি দুরদর্শিতা হারিয়ে গেছে আল্লাহ তা'আলা তাকে অন্ধ করে দিয়েছেন, সুতরাং তার থেকে কিভাবে জবাব আসবে। মৃত ব্যক্তি কি মাটির ভিতর থেকে বিতর্ক করতে পারে?

তারপর যুলম ও বিভ্রান্তিতে তার অবস্থা এতদূর পর্যন্ত গড়িয়েছিল যে, সে তার 'কাদ রআইতুহা বি খত্তিহি ওয়া খতিমিহি বি আইনাইয়্যা ওয়া তবাতু মিরারান বি মাবই ওয়া গয়রিহা মাআ রদ্দিহা' নামক ফাতওয়াতে সে স্পষ্টভাবে বলেছে যে, যে ব্যক্তি কাজের মাধ্যমে আল্লাহ তা'আলাকে মিথ্যারোপ করে এবং

স্পষ্টভাবে বলে যে, আল্লাহ তা'আলা মিথ্যা বলেছেন, আর এই ভয়ংকর কাজটি তার থেকে সংঘটিত হয়, তার ফাসেকীর দিকে তোমরা নিজেদেরকে সম্পৃক্ত করো না, বিভ্রান্তির দিকে সম্পৃক্ত করা তো দূরের কথা, আর কুফরীর দিকে সম্পৃক্ত করা তো আরো দূরের কথা। অনেক ইমামই এমনটি বলেছেন। আর তার বিষয়ে সংক্ষিপ্ত কথা যে, সে তার ব্যাখ্যাতে ভুলকারী। সুতরাং আল্লাহ তা'আলা ছাড়া সত্যিকার কোনো মাবুদ নেই, তিনি যথাসম্ভব এই মিথ্যারোপের খারাপ পরিণতি থেকে অবকাশ দেন। কিভাবে কাজের মাধ্যমে এমন মিথ্যারোপ করা হলো! যারা চলে গেছে তাদের জন্য এটিই ছিল আল্লাহ তা'আলার বিধান। এদেরকে আল্লাহ তা'আলা বধির করে দিয়েছেন, তাদের দৃষ্টিশক্তি ছিনিয়ে তাদেরকে অন্ধ করে দিয়েছেন। মহন সুউচ্চ আল্লাহ তা'আলা ছাড়া আর কোনো শক্তি ও ক্ষমতা নেই। এদেরই অন্তর্ভুক্ত হলো ওয়াহাবী শয়তানরা, তারা হলো রাফেযীদের একটি শয়তানী দল। তারা অভিশপ্ত শয়তান ইবলীসের অনুসারী। এছাড়াও তারা মিথ্যাবাদী কানকূহীর অনুসারী (হিসামুল হারামাইন, ২১ পৃ.)।'

সে আরো বলে যে, 'এই ব্যক্তিকে জাহান্নামের জ্বলন্ত আগুনে নিক্ষেপ করা হবে, জাহান্নামের আগুন তাকে পুড়াবে, আর তাকে বলা হবে যে, স্বাদ আস্বাদন করো, নিশ্চয় তুমি ছিলেন সম্মানীত ও পথপ্রদর্শক (খালেসুল ইতেকাদ, বেরেলভী, ৬২)।'

সে আরো বলে যে, রশীদ আহমাদের কাফের হওয়ার বিষয়ে যে ব্যক্তি দ্বিধা করবে, তার কাফের হওয়ার বিষয়েও কোনো সন্দেহ থাকবে না (ফাতাওয়া ইফরিকিয়্যাহ, বেরেলভী, ১২৪)।'

তার দলের আরেকজন ব্যক্তি বলে যে, 'নিশ্চয় রশীদ আহমাদ মুরতাদ।' একই পৃষ্ঠাতে সে চারবার এই কথার পুনরাবৃত্তি করে (তাজানুবু আহলিস সুন্নাহ, ২৪৫ পৃ.)।

বেরেলভী বলে যে, কানকূহীর কিতাব 'বারাহিন কাতিয়াহ' এই কিতাবটি পেশাবের চেয়েও অপবিত্র, কুফরী কথা দিয়ে পরিপূর্ণ। যে ব্যক্তি এমনটি বলে না, সে যিনদীক (সুবহানাস সাবূহ, ১৩৪ পৃ.)।'

৩০. ইমাম আশরাফ আলী থানভী রহিমাহুল্লাহ

অনুরূপভাবে একদলের শাইখ এবং হানাফী দেওবন্দীদের ইমাম আশরাফ আলীকে সে কাফের বলেছে। অথচ আশরাফ আলীর সম্পর্কে সায়্যেদ আবূল হাসান আলী আন-নাদভী তার পিতার কিতাবে বলেছেন যে,

'যেসব রব্বানী মাহন আলেমদের উপদেশ ও লেখনীর মাধ্যমে আল্লাহ তা'আলা অনেককে উপকৃত করেছেন তাদের মধ্যে আশরাফ আলী অন্যতম। তার মাজলিশী আলোচনার কিতাবে লিপিবদ্ধ করা হয়েছে এবং তার সংখ্যা চারশোতে পৌছেছে। আকীদা ও আমলের সংস্কারের ক্ষেত্রে তার কিতাব, মাজলিশ ও উপদেশ বিরাট উপকার করেছে। হাজার হাজার মুসলমান সেগুলো থেকে উপকৃত হয়েছে। কাফের, বিদআতী এবং প্রবৃত্তির অনুসারীদের সাথে দীর্ঘকাল মেলামেশার কারণে মুসলিমদের জীবনে, তাদের বাড়িতে, তাদের সুখ দুঃখের মধ্যে যেসব যেসব প্রচলিত রীতি নীতি ও জাহেলী রসম রেওয়াজ প্রবেশ করেছিল, সেগুলোকে তিনি বর্জন করেছিলেন, আর সেগুলোর সংখ্যা আল্লাহ তা'আলা ছাড়া আর কেউ জানে না। ধর্মীয় জীবনে চলার পথ সহজ করা, মাধ্যম থেকে লক্ষ্য-উদ্দেশ্যকে সংশোধন করা, আবরণ থেকে মূল জিনিসকে পৃথক করার ক্ষেত্রে তার বিরাট অবদান ছিল (নুঝহাতুল খাওয়াতির, ৫৮ পৃ.)।'

এই ধরনের মহান আলেমের সম্পর্কে বেরেলেভী বলে যে, 'এই শয়তানী ওয়াহাবী নেতাদের মধ্যে গাংগুহীর অনুসারীদের মধ্যে আরেকজন রয়েছে, তার নাম হলো আশরাফ আলী, যে ব্যক্তি একটি কিতাব লিখেছে, যেটি চার পৃষ্টাও হবে না। সেই কিতাবে সে স্পষ্টভাবে বলেছে যে, 'রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের গায়েব সম্পর্কে যেই জ্ঞান ছিল, তা প্রতিটি শিশু, পাগল এমনকি প্রতিটি পশু প্রাণীরও ছিল।' তার এই অভিশপ্ত কথাটি যদি নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পবিত্র সত্তাতে গায়ের বিষয় সম্পর্কে প্রজোয্য হয়, যেমনটি যায়েদ বলে থাকে, তাহলে প্রশ্ন হলো এর মাধ্যমে তার উদ্দেশ্য কী? কিছু গায়েবী বিষয় নাকি সকল গায়েবী? এখানে যদি শুধু কিছু গায়েবী বিষয়কে উদ্দেশ্য করা হয়, তাহলে এর মাধ্যমে রিসালাত থাকার পরে নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আর কীই বা বিশেষত্ব থাকে। কেননা এমন গায়েবী বিষয়ের জ্ঞান তো যায়েদ ও আমরেরও আছে, বরং প্রতিটি শিশু ও পাগলেরও রয়েছে, এমনকি সকল পশু প্রাণীরও রয়েছে। আর যদি এটি দিয়ে সকল গায়েবী বিষয়কে উদ্দেশ্য করা হয়, যাতে কোনো ব্যক্তিই এর থেকে পৃথক নয়, তাহলে দলীল ও বিবেক উভয়ের মাধ্যমেই তার এই বক্তব্য বাতিল। আমি বলছি যে, তুমি আল্লাহ তা'আলার মোহর মেরে দেওয়ার নিদর্শন দেখো যে, কিভাবে সে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে অমুক অমুককে সমান করেছে।

কিভাবে তার নিকটে গোপন থাকলো যে, যদি ধরে নেওয়া হয় আর এটিই অকাট্য জ্ঞান যে, যায়েদ ও আমরের জ্ঞান এবং এই শাইখদের মহান ব্যক্তিদের

জ্ঞান, আল্লাহর নবীদের জ্ঞানের নিকট পৌছবে না, নবী ছাড়া অন্যদের নিকটে যেই জ্ঞান পৌছেছে সেগুলো নবীদের জানানোর মাধ্যমেই তারা সেই জ্ঞান পেয়েছে। তুমি কি তোমার রবের কথা শোননি, আল্লাহ তা'আলা বলেছেন যে,

﴿وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُطْلِعَكُمْ عَلَى الْغَيْبِ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَجْتَبِي مِنْ رُسُلِهِ مَنْ يَشَاءُ﴾

অনুরূপভাবে গায়েব সম্পর্কে তোমাদেরকে অবহিত করা আল্লাহর নিয়ম নয়; তবে আল্লাহ তার রাসূলগণের মধ্যে যাকে ইচ্ছা মনোনীত করেন (সূরা আলে ইমরান: ১৭৯)। আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন,

﴿عَالِمُ الْغَيْبِ فَلَا يُظْهِرُ عَلَى غَيْبِهِ أَحَدًا (٢٦) إِلَّا مَنِ ارْتَضَى مِنْ رَسُولٍ فَإِنَّهُ يَسْلُكُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ رَصَدًا﴾

তিনিই গায়েবী বিষয়ের জ্ঞানী, তিনি তাঁর গায়েবের জ্ঞান কারও কাছে প্রকাশ করেন না তার মনোনীত রাসূল ছাড়া। সে ক্ষেত্রে আল্লাহ তাঁর রাসূলের সামনে এবং পিছনে প্রহরী নিয়োজিত করেন (সূরা আল জিন: ২৬-২৭)। খেয়াল করো, কিভাবে সে কুরআন পরিত্যাগ করেছে (হিসামুল হারামাইন, ২৭-২৯)।

এভাবে বলতে বলতে সে বলে যে, এই পাপাচারের দিকে খেয়াল করো, কিভাবে একটি পাপ আরেকটি পাপকে টেনে আনে, বিশ্বজগতের রব আল্লাহর নিকটে আমরা আশ্রয় প্রার্থনা করছি। সারকথা হলো, এই সবগুলো দলের সকলেই কাফের, মুরতাদ এবং মুসলিমদের ঐক্যমতে তারা ইসলাম থেকে বেরিয়ে গেছে। যে ব্যক্তি তাদের কাফের হওয়া ও তাদের শাস্তি হওয়ার বিষয়ে সন্দেহ করবে, সেও কাফের হয়ে যাবে। 'আশ শিফাউশ শারীফ' কিতাবে সে বলে যে, যে ব্যক্তি ইসলাম ব্যতীত অন্য কোনো ধর্মের দাবীদার তাকে যে ব্যক্তি কাফের বলে না, অথবা কাফের বলতে দ্বিধা করে, অথবা তাদের কাফের হওয়ার বিষয়ে সন্দেহ করে, তাকেও আমরা কাফের বলে আখ্যায়িত করি। সে 'বাহরুর রাইক' নামক কিতাবসহ অন্যান্য কিতাবে বলে যে, যে ব্যক্তি প্রবৃত্তির অনুসারীদের কথাকে ভালো বলবে অথবা এমন অর্থে কথা বলবে, তাহলে প্রবক্তার কথা যদি কুফরীমূলক হয়, তাহলে যে ব্যক্তি তার কথাকে ভালো বললো, সেও কাফের হয়ে যাবে। ইমাম ইবনু হাজার রহিমাহুল্লাহ তার 'আল-ইলামু ফী ফাসলিল কুফরী আল-মুত্তাফাকি আলাইহি বাইনা আয়িম্মাতিনাল আলাম' নামক কিতাবে বলেছেন,

'যে ব্যক্তি কুফরীমূলক শব্দ উচ্চারণ করবে, সে কাফের হয়ে যাবে। আর প্রত্যেক যে ব্যক্তি তার সেই কথাকে ভালো বলবে অথবা তাতে সন্তুষ্ট থাকবে সেও কাফের হয়ে যাবে। সুতরাং হে পানি ও মাটি সাবধান, সাবধান। কারণ দীন হলো সবেচেয় সম্মানীয়, যাকে সকল কিছুর ওপর প্রাধান্য দিতে হয়। আর কাফেরকে সম্মান করা যায় না। আর পথভ্রষ্টতা থেকে সবচেয়ে বেশি সতর্ক থাকতে হয়। আর মন্দ জিনিস শুধু মন্দই নিয়ে আসে। আর নিশ্চয় দাজ্জাল হলো প্রতীক্ষিত অনিষ্ট। আর তার অনুসারীদের সংখ্যা হবে অনেক বেশি। আর তার বিস্ময়কর বিষয়গুলো অধিক স্পষ্ট ও অনেক বেশি। আর কিয়ামত অধিক ভয়াবহ ও তিক্ততর। সুতরাং তোমরা আল্লাহ অভিমুখী হও। আল্লাহ ছাড়া আর কোনো শক্তি ও ক্ষমতা নেই। আমরা এই স্থানে বিশদ আলোচনা করলাম, কেননা এই বিষয়ে সতর্ক করা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয় (হিসামুল হারামাইন, ৩১ পৃ.)।'

সে আরো বলে যে, যে ব্যক্তি আশরাফ আলীর কাফের হওয়ার বিষয়ে দ্বিধা করে, সে কাফের হয়ে যাবে (ফাতওয়া ইফরিকিয়্যাহ, বেরেলভী, ১২৪ পৃ.)।

সে আরো বলে, 'বেহেশতী জেওর কিতাবের লেখক কাফের, আর সেই কিতাবের দিকে ভ্রুক্ষেপ করাও মুসলিমদের জন্য হারাম (ফতোয়া রিযভীয়্যাহ, ৬/৫৬)।'

সে আরো বলে যে, 'বেহেশতী জেওর কিতাবের লেখকের অনুসারীরাও মুরতাদ (ফতোয়া রিযভীয়্যাহ, ৬/১০৪)।'

আহমাদ রেযাও সেই লেখকের মুরতাদ হওয়ার বিষয়ে ফাতওয়া দিয়েছে। এই বিষয়ের জন্য দেখুন তার কিতার 'তাজানিবু আহলিস সুন্নাহ' (২৩৭ পৃ.) সহ অন্যান্য কিতাব। অনুরূপভাবে দেওবন্দীদের মধ্যে শাইখ খলীল, শাইখ মাহমূদ, শাইখ শাবীর আহমাদসহ আরো অনেক দেওবন্দীদের গণ্যমান্য ও জ্ঞানী ব্যক্তিদেরসে সে কাফের বলে আখ্যায়িত করেছে। খুব কম সংখ্যক মানুষই তার থেকে ও তার অনুসারীদের থেকে নিরাপদ থেকেছে। যেহেতু এই সকল ব্যক্তিরা কাফের, তাহলে এর মাধ্যমে তাদের অনুসারীদের কাফের হওয়াও অপরিহার্য হয়ে যায়। সে কারণে বেরেলভী তাদের অনুসারীদেরকে স্পষ্টভাবে কাফের ও মুরতাদ বলে ফাতওয়া দিয়েছে।

দেওবন্দীদের সম্পর্কে সাধারণভাবে বেরেলভী বলে যে, 'দেওবন্দীদের কাফের হওয়ার বিষয়ে যে ব্যক্তি সন্দেহ করবে, সেও কাফের (ফতোয়া রিযভীয়্যাহ, ৬/৮২)।'

তার কথা এতেই সীমাবদ্ধ নয়। বরং সে আরো বলে যে, যে ব্যক্তি কোনো দেওবন্দী পিছনে সালাত আদায় করবে, সেও মুসলিম নয় (ফতোয়া রিযভীয়্যাহ, ৬/৭৭)।'

অনুরূপভাবে যারাই তাদের আকীদাতে বিশ্বাসী হবে, তারাও কাফের, মুরতাদ (ফতোয়া রিযভীয়্যাহ, ৬/৪৩)।'

এতেও তার রাগ নিবারণ হয়নি, বরং সে সকল সীমা অতিক্রম করেছে। সে বলেছে যে, যে ব্যক্তি দারুল উলুম দেওবন্দের প্রশংসা করবে, অথবা তাদের আকীদা খারাপ হওয়ার বিষয়ে বিশ্বাস করবে না এবং তাদেরকে অপছন্দ করবে না, তার জন্য ইসলাম না থাকার বিধান দেওয়ার জন্য এটিই যথেষ্ট (ফতোয়া রিযভীয়্যাহ, ৬/১১০)।

তারপর তার রাগ ও গোস্বা আরো বেড়ে গিয়েছে। সে বলেছে যে, দেওবন্দীদের জীবনের ও মরণের ক্ষেত্রে তাদের সাথে লেনদেন করা, মুসলিমদের সাথে হারাম লেনদেন করার মতো। এমনকি তাদেরকে পারিশ্রমিকের বিনিময়ে খাদেম হিসেবে নিয়োগ করাও হারাম। বরং তাদের থেকে দূরে থাকা আবশ্যক (ফতোয়া রিযভীয়্যাহ, ৬/৯৫)।

সে আরো বলে, 'তাদেরকে কুরবানীর গোশত দেওয়াও হারাম (ফতোয়া রিযভীয়্যাহ, ৬/১৬৭)।'

তার দল ও অনুসারীদের জনৈক ব্যক্তি বলে যে, দেওবন্দীরা হলো বিদআতী, পথভ্রষ্ট, আর তারা সৃষ্টির সবচেয়ে নিকৃষ্ট (তাফসীরু মীযানিল আদইয়ান, ২/২৭০)।

তার আরেক অনুসারী বলে যে, দেওবন্দীরা মুসলিম হওয়ার দাবীদার। অথচ তারা পবিত্র শরীআতের বিধান অনুযায়ী কাফের মুরতাদ (তাজানুবু আহলিস সুন্নাহ, ১১২ পৃ.)।'

বেরেলভীর কিতাবে দেওবন্দীদের এই ধরনের কুফরী কথা কত বেশিই না রয়েছে!

তাদের কুফরী ও মুরতাদ হওয়ার সীমা কতদূর পৌঁছিয়েছে? এই সম্পর্কে বেরেলভী নিজেই বলে যে, দেওবন্দীরা হলো হিন্দু, খ্রিষ্টান ও কাদিয়ানীদের চেয়ে বড় কাফের।'

বেরেলভী আরো বলে যে, যদি কোনো ক্ষেত্রে হিন্দু, খ্রিষ্টান, কাদিয়ানী ও দেওবন্দীদের কারো সাথে একমত হওয়ার দরকার হয়, তাহলে সেক্ষেত্রে শুধু দেওবন্দীদের প্রতিউত্তর করা উচিত। কেননা তারা ইসলাম থেকে বেরিয়ে গেছে এবং মুরতাদ হয়ে গেছে। আর মুরতাদদের সাথে একমত হওয়ার চেয়ে কাফের সাথে একমত হওয়াই বেশি যুক্তিযুক্ত (মালফুযাতু মুজাদ্দিদিল মিআতিল হাযিরাহ, ৩২৫-৩২৬ পৃ.)।'

সে আরো বলে যে, 'হিন্দুদের জন্য রচিত কিতাবগুলোর চেয়েও দেওবন্দীদের কিতাবগুলো বেশি নোংরা। আর আশরাফ আলী দেওবন্দর কুফরীর বিষয়ে ও তার আযাব হওয়ার বিষয়ে সন্দেহ পোষণ করাটাও কুফরী। আর দেওবন্দীদের কিতাবগুলো দিয়ে ইস্তেনজা করা জায়েয নয়। ইস্তেনজা জায়েয না হওয়ার কারণ তাদের কিতাবের সম্মানের জন্য নয়, বরং যেই হরফগুলো দিয়ে সেই কিতাব লিখা হয়েছে সেগুলোর সম্মানের জন্য (ফতোয়া রিযভীয়্যাহ, ২/১৩৬)।'

সে আরো বলে যে, দেওবন্দীদের কিতাবগুলো থুথু ফেলার উপযুক্ত। বরং সেগুলোতে পেশাব করার উপযুক্ত। কিন্তু সেগুলোর ওপর পেশাবের কারণে তা নাপাক ও নোংরা হয়ে যাবে। হে আল্লাহ! আপনি আমাদেরকে ইবলীস ও তার সন্তানদের অর্থাৎ দেওবন্দীদের থেকে আশ্রয় দেয়। আমীন (সুবহানাস সাবূহ, ৭৫ পৃ.)।'

এগুলো হলো দেওবন্দীদের সম্পর্কে বেরেলভী ও বেরেলভী মতবাদের অনুসারীদের কথা, যেগুলো আমরা তাদের কিতাব থেকেও ও স্বয়ং তাদের থেকেই বর্ণনা করলাম।

পক্ষান্তরে নাদভী (অর্থাৎ আলেমদের পরিষদ দারুল উলুমের শিক্ষক, ছাত্র, তার সাথে সম্পৃক্ত ব্যক্তিবর্গ ও দায়িত্বশীল ব্যক্তিবর্গের) ভাগ্যও অন্যদের চেয়ে ভালো ছিল না, যখন বেরেলভীরা তাদেরকেও কাফের ও মুরতাদ বলে আখ্যায়িত করেছিল।

বারকাতী ও তাকে সত্যায়ণকারী বেরেলভীর প্রতিনিধি হাশমত আলী বলে যে, নাদভীরা হলো নাস্তিক, মুরতাদ ও নাস্তিক নেতাদের অনুসারী (তাজানুবু আহলিস সুন্নাহ, ৯০ পৃ.)।'

বেরেলভী নিজে বলে যে, 'এই পরিষদটা হলো ধ্বংসাত্মাক পরিষদ এবং এদের সকলেই জাহান্নামে যাবে (মালফুযাত বেরেলভী, ২০১ পৃ.)।'

এই পরিষদের আলেমগণের কাফের হওয়ার বিষয়ে সে ফাতওয়া জারি করে, তাতে সে তার দলের প্রবীণদের সাক্ষর নেয়, আর সে সেটিকে 'ইলজামুস সুন্নাহ লি আহলিল ফিতনাহ' নামে প্রকাশ করে। তারপর সে সেটিকে 'মাজমুআতু ফাতওয়াল হারামাইন বি রজফী নাদওয়াতিল মাইন' কিতাবে প্রকাশ করে, যেমনটি এই অধ্যায়ে সায়্যেদ আল-হাসানী সম্পর্কে তার থেকে যেমনটি বর্ণিত হয়েছে। 'আত-তাজানুব' কিতাবের লেখক একদল লোকের বর্ণনা নিয়ে এসেছে, যারা এই পরিষদের আলেমগণকে কাফের বলে ফাতওয়া দিয়েছে (মালফুযাত, বেরেলভী, ৯০ পৃ.)।'

৩১. আহলুল হাদীস ও দেওবন্দী সবাই ওয়াহাবী

তারপর সে সকলকে অর্থাৎ নাদভী, দেওবন্দী, শাইখুল ইসলাম মুহাম্মাদ ইবনু আব্দিল ওয়াহাব রহিমাহুল্লাহর অনুসারীদেরকে ও আহলুল হাদীস সালাফীদের সকলকে সে ওয়াহাবীদের অন্তর্ভুক্ত করে। কারণ তার দাবী হলো, এরা সকলেই শিরক, বিদআত ও বিভিন্ন কল্পকাহিনীর বিপরীতে তাদের আকীদার ক্ষেত্রে শাইখুল ইসলাম মুহাম্মাদ ইবনু আব্দিল ওয়াহাব রহিমাহুল্লাহর থেকে দিক নির্দেশনা নিয়ে থাকে। প্রথমত, বেরেলভী ও বেরেলভী মতবাদের অনুসারীরাই তাদেরকে এই নামে সম্বোধন করেছিল। আর সাধারণভাবে এই শব্দ দিয়ে এই চার দলকেই উদ্দেশ্য করা হতো। তারপরে তারা তাদেরকে নিকৃষ্ট নামে ডাকতে শুরু করে, তাদের বিরুদ্ধে মিথ্যা অপবাদ দেয়, তাদের থেকে মানুষকে বিচ্ছিন্ন করে দেয় এবং মিথ্যা ও অনৈতিক বর্ণনা দিয়ে তাদেরকে লোকদের মধ্যে অপমান করতে থাকে এবং তারা তাদের হুকুম আহকাম ও তাদের সাথে লেনদেনের বিধানসমূহ বর্ণনা করতে থাকে। তারা বলেছিল, এমনকি তাদের প্রধান নেতা বেরেলভী নিজেই বলেছিল যে, ওয়াহাবীরা ও তাদের নেতারা বিভিন্ন দিক থেকে কাফের। মুখে তাদের শাহাদাত পাঠ করাটা তাদের কুফরীকে নাকোচ করে না (আল কাওকাবাতুশ শাহাবিয়্যাহ, ১০ পৃ.)।'

সে আরো বলে যে, হাজারো কারণ ও উপায়ে এই দলের কুফরী প্রমাণিত হয়েছে (আল কাওকাবাতুশ শাহাবিয়্যাহ, ৫৯ পৃ.)।'

সে আরো বলে যে, ইমামদের অর্থাৎ বেরেলভী সম্প্রদায়ের ইমামদের ইজমার ভিত্তিতে ওয়াহাবীরা সকলেই কাফের মুরতাদ (আল কাওকাবাতুশ শাহাবিয়্যাহ, ৬০ পৃ.)।'

সে আরো বরে যে, ওয়াহাবীরা কাফের, মুরতাদ ও মুনাফিক। কারণ মুখে শাহাদাত উচ্চারণ করার মাধ্যমে তারা বাইরে বাইরে ইসলাম প্রকাশ করে মাত্র (আহকামুশ শারীআত, বেরেলভী, ১১২ পৃ.)।'

সে আরো বলে যে, ওয়াহাবীরা ইবলীসের চেয়েও নিকৃষ্ট ও পথভ্রষ্ট। কেননা শয়তান মিথ্যা কথা বলে না, কিন্তু তারা মিথ্যা কথা বলে (আহকামুশ শারীআত, বেরেলভী, ১১৭ পৃ.)।'

সে আরো বলে যে, আল্লাহ তা'আলা ওয়াহাবীদের ওপর লানত করুন, তাদেরকে লাঞ্ছিত করুন এবং তাদেরকে জাহান্নামের ইন্ধন বানান (ফাতওয়া ইফরিকাহ, ১২৫ পৃ.)।'

সে আরো বলে যে, ওয়াহাবীদেরকে আল্লাহ তা'আলা ধ্বংস করুন। তারা কোথায় ফিরে যাচ্ছে? (ফাতওয়া ইফরিকাহ, ১৭২ পৃ.)'

সে আরো বলে, ওয়াহাবীরা সর্বনিকৃষ্ট স্তরের (খালেসুল ইতেকাদ, ৪৫ পৃ.)।'

সে আরো বলে, আল্লাহ তা'আলা ওয়াহাবীদের ভাগ্যে কুফরীকে লিখে দিয়েছেন (ফতোয়া রিযভীয়্যাহ, ৬/১৯৮)।'

যেহেতু ওয়াহাবীরা কাফের মুরতাদ, তাই তাদের পিছনে সালাত আদায় করাও জায়েয নয় এবং তাদের জানাযার সালাতও আদায় করা জায়েয নয়। এই বিষয়ে বেরেলভী ও তার অনুসারীরা ফাতওয়া দিয়েছে।

ওয়াহাবীদের পিছনে সালাত আদায় করা সম্পর্কে জনৈক ব্যক্তি বেরেলভীকে জিজ্ঞেস করেছিল, তখন সে বলেছিল, তাদের সালাত সালাতেই নয় এবং তাদের জামাআত কোনো জামাআত নয় (মালফুযাত, ১০৫ পৃ.)।'

ওয়াহাবীরা যেই মাসজিদ নির্মাণ করে, সেই মসজিদের বিধান সম্পর্কে তাকে জিজ্ঞেস করা হলে সে উত্তরে বলে যে, তারা কাফের, আর কাফেরদের মসজিদের বিধান সাধারণ বাড়ির বিধানের মতোই।'

জনৈক ব্যক্তি তাকে জিজ্ঞেস করেছিল যে, ওয়াহাবী মুআযযিনের আযানের উত্তর দেওয়া যাবে কি? তখন সে তার উত্তরে বলেছিল যে, না। কারণ তাদের সালাতকে সালাত বলে গণ্য করা যাবে না এবং তাদের আযানকেও আযান বলে গণ্য করা যাবে না (মালফুযাত, ১০৫ পৃ.)।'

আর মুসলিমদের মসজিদে ওয়াহাবীদেরকে প্রবেশ করার অনুমতিও দেওয়া যাবে না, যেমনটি এই বিষয়টি বেরেলভীর এক প্রতিনিধি ও উত্তরসূরী মুরাদ

আবাদী স্পষ্টভাবে বলেছে। সে বলেছে যে, 'নিশ্চয় ওয়াহাবী ও গায়রে মুকাল্লিদদের জন্য মুসলিমদের মসজিদে প্রবেশের কোনো অধিকার নেই। মসজিদে তাদের প্রবেশ ফাসাদ সৃষ্টির কারণ। যদি তারা মসজিদে প্রবেশ করা থেকে বিরত না হয়, তাহলে সরকারীভাবে নিষেধাজ্ঞা করে দিতে হবে (ফাতওয়া নাঈমুদ্দীন মুরাদ আবাদী, ৬৪ পৃ.)।'

৩২. ওয়াহাবীদেরকে মাসজিদ থেকে বের করে দেওয়া

ওয়াহাবীদেরকে মাসজিদ থেকে বের করে দেওয়া আবশ্যক হওয়া মর্মে সে একটি স্বতন্ত্র কিতাবই লেখে, সেই কিতাবের নাম দেয় 'ইখরাজুল ওয়াহাবিয়্যিন আনিল মাসাজিদ'। বেরেলভীরা এই বিষয়ে অনেক কঠোরতা করে, এমনকি তারা তাদের মসজিদের ফলকে লিখে দেয় যে, এখানে ওয়াহাবীদের সালাত আদায়ের কোনো অনুমতি নেই।' এমনকি এই যুগে, আলো ও জ্ঞানের যুগে, কিছু মসজিদ লিখা হয়েছে যে, হে শাইখ আব্দুল কাদের জিলানী, তারপর তার নিচে লিখা রয়েছে, এখানে ওয়াহাবীদের জন্য প্রবেশ করা নিষিদ্ধ। আর আমি আমারা দুই চোখে লাহোরে দুটি মাসজিদ দেখেছি, যেগুলোতে এমন কথা লিখা ছিল।

বেরেলভী আরো বলে যে, ওয়াহাবীদের পিছনে সালাত আদায় করলে তা বাতিল হয়ে যাবে (ফতোয়া রিযভীয়্যাহ, ৬/৪৩)।'

অনুরূপভাবে বেরেলভীদের মুফতী আহমাদ ইয়ারখান গুজরাটিও তার ফাতওয়াতে এমন কথাই বলেছে (ফাতওয়া নাঈমিয়্যাহ, ১/১০৪)।

বেরেলভী নিজেই বলেছে যে, কোনো ওয়াহাবী যদি কোনো মুসলিম ব্যক্তির জানাযার সালাত আদায় করে, তাহলে সেটি জানাযা বলেই গণ্য হবে না। আর এভাবেই যদি সেই মৃত ব্যক্তিকে দাফন করে দেওয়া হয়, তাহলে তাকে যেন কোনো জানাযার সালাত আদায় করা ছাড়াই দাফন করে দেওয়া হলো (ফতোয়া রিযভীয়্যাহ, ৪/১২)।'

আর ওয়াহাবীদের জানাযার সালাত আদায় করা সম্পর্কে, জনৈক ব্যক্তি তাকে জিজ্ঞেস করে যে, কোনো ওয়াহাবী ব্যক্তি মারা গেলে তার জানাযার সালাত আদায় করার বিধান কি? তখন সে উত্তরে বলে যে, ওয়াহাবীরা হলো কাফের মুরতাদ। যে ব্যক্তি তাদের জানাযার সালাত আদায় করবে, সেও কাফের হয়ে যাবে (মালফূযাত, ৭৬ পৃ.)।'

অনুরূপভাবে তাদের জন্য কোনো দুআ করাও জায়েয নয়। কেননা আল্লাহ তা'আলা তাদের সম্পর্কে বলেছেন যে, তারপর তারা আর ফিরে আসবে না (মালফূযাত, ২৮৬ পৃ.)।'

এখানে সীমাবদ্ধ নয়। বরং যে ব্যক্তি বিশ্বাস করবে যে, ওয়াহাবীরা মুসলমান, সেও কাফের, আর পিছনে সালাত আদায় করাও জায়েয নয়, যেমনটি বেরেলভী তার কিতাবে স্পষ্টভাবে এমনটি বলেছে (ফতোয়া রিযভীয়্যাহ, ৬/৮০-৮১)।

অন্য আরেকজন বলেছে, যে ব্যক্তি বেরেলভীদের সম্পর্কে কথা বলবে, তার পিছনেও সালাত আদায় করা জায়েয নয় (ফাতাওয়া নাঈমুদ্দীন মুরাদ আবাদী, ৬৪ পৃ.)।'

আর তাদের সাথে অন্যান্য লেনদেন করাও হারাম। সে বলে যে, 'ওয়াহাবীদের সাথে সাক্ষাত করা, তাদের সাথে উঠাবসা করা হারাম। তারা অসুস্থ হলে তাদেরকে দেখতে যাওয়াও হারাম। তাদের কেউ মারা গেলে তাকে গোসল করার, তার জানাযা বহন করাও হারাম (ফাতাওয়া নূরিয়্যাহ, ১/২১৩)।'

আর মুরাদ আবাদী বলে যে, ওয়াহাবীরা পথভ্রষ্ট, অন্যদেরকে পথভ্রষ্টকারী এবং নাস্তিক। তাদের পিছনে সালাত আদায় করা জায়েয নয় এবং তাদের সাথে মেলামেশা করাও জায়েয নয় (ফতোয়া রিযভীয়্যাহ, ৬/৯০)।'

সে আরো বলে যে, মনোযোগ দিয়ে ওয়াহাবীদের কথা শ্রবণ করাও হারাম। তাদের সাথে বসা এবং তাদের সাথে কথাবার্তা বলাও হারাম (মাজমূআতু ফাতাওয়া নাঈমুদ্দীন, ১১২ পৃ.)।'

সে আরো বলে যে, তাদের সাথে মুসাফাহা করা ও তাদেরকে সালাম দেওয়াও হারাম এবং এতে অবশ্যই পাপ হবে ও আল্লাহ তা'আলার অবাধ্যতা করা হবে (ফতোয়া রিযভীয়্যাহ, ৪/২১৮)।'

সে আরো বলে যে, কোনো হানাফীর জন্য ওয়াহাবীদের কুপ থেকে পানি পান করাও জায়েয নয় (জায়াল হাক্ক, ২/২২২)।'

সে আরো বলে, তাদের সালামের উত্তর দেওয়াও হারাম (ফাতওয়া ইফরিকাহ, ১৭০ পৃ.)।'

এতেই তার কথা সীমাবদ্ধ নয়। বরং সে আরো বলে যে, যে ব্যক্তি তাদের সাথে লেনদেন করবে ও তাদের সাথে উঠাবসা করবে, তার সাথে বিবাহ দেওয়াও হারাম (ফতোয়া রিযভীয়্যাহ, ৫/৭২)।'

কোনো বিবাহে যদি কোনো ওয়াহাবী খুতবা দেয় ও বিবাহ পড়ায়, তাহলে সেই বিবাহ বাতিল। আর নতুনভাবে আবার সেই বিবাহ পড়াতে হবে এবং নতুনভাবে তাকে ইসলাম গ্রহণ করতে হবে (ফতোয়া রিযভীয়্যাহ, ৬/৮৯)।'

সে আরো বলে যে, বিবাহের ক্ষেত্রে ওয়াহাবীদের সাক্ষী থাকা হারাম (ফাতওয়া ইফরিকাহ, ৬৯ পৃ.)।'

বেরেলভীর এক ছাত্র ও প্রতিনিধি বলে যে, 'ওয়াহাবীদের সাথে বিবাহ দেওয়া হারাম। কেননা তারা মুসলিমদের জন্য উপযুক্ত নয় (বিহারু শারীআত, আমজাদ আলী, ৭/৩২)।'

কিন্তু কিভাবে তার ছাত্র এমন নিষ্ঠুরতা ও কঠোরতায় পৌঁছাতে পারে! বেরেলভী নিজেই বলে যে, 'ওয়াহাবীরা মুরতাদ, তার সাথে বিবাহ দেওয়া যাবে না, কোনো পশুকেও না, আবার কোনো মানুষকেও না। যদি বিবাহ দেওয়া হয়, তাহলে সেটি ব্যভিচার বলেই গণ্য হবে (ফতোয়া রিযভীয়্যাহ, ৫/১৯৪)।'

আমি প্রথমবার বেরেলভীদেরকে জিজ্ঞেস করতে চেয়েছিলাম যে, তার কি পশুকেও বিবাহ করে ও পশুকেও বিবাহ দেয়? তখন সে বলেছে যে, 'কোনো ওয়াহাবীর পক্ষ থেকে কোনো কিছু জানতে চাওয়া হারাম, হারাম, হারাম। যে ব্যক্তি তার কুফরী ও আযাব হওয়ার বিষয়ে সন্দেহ করবে, সেও কাফের হয়ে যাবে (ফতোয়া রিযভীয়্যাহ, ৪/১০৬)।'

আমজাদ আলী বলে, কোনো ব্যক্তি যদি কোনো ওয়াহাবীকে যাকাত দেয়, তাহলে সেটি যাকাত বলেই গণ্য হবে না (আহকামু শারীআত, ১/১২২)।'

জনৈক জিজ্ঞেসাকারীর জিজ্ঞাসার উত্তরে সে বলে যে, ওয়াহাবীদের নিকটে শিশুদেরকে শিক্ষা করতে দেওয়া হারাম, হারাম, হারাম। যে ব্যক্তি এমন কাজ করবে, সে তার সন্তানদের শত্রু এবং পাপে নিমজ্জিত। আর আল্লাহ তা'আলা বলেছেন যে, তোমরা নিজেদেরকে ও তোমাদের পরিবার পরিজনকে জাহান্নামের আগুন থেকে রক্ষা করো (সূরা আত তাহরীম: ৬) (বিহারু শারীআত, ৫/৪৬)।'

ওয়াহাবীদের যবেহ করা পশু সম্পর্কে সে বলে যে, ইয়াহূদীদের যবেহ করা পশু হালাল, অনুরূপভাবে নাসারাদের যবেহ করা পশুও হালাল। কিন্তু ওয়াহাবীরা মুত্তাকী হলেও এবং যবেহ করার সময় এক লক্ষ বার আল্লাহর নাম উচ্চারণ করলেও তাদের যবেহ করা পশুর গোশত খাওয়া হারাম। কেননা

কোনো মুরতাদের যবেহ করা পশুর গোশত খাওয়া যাবে না (ফাতাওয়া ইফরিকাহ, ২৭ পৃ.)।'

অনুরূপভাবে সে আরো বলে যে, যে ব্যক্তির থেকে ব্যভিচার করা প্রমাণিত হয়েছে এমন ব্যভিচারের যবেহ করা পশুর গোশত খাওয়াও হালাল (আহকামু শারীআত, ২৩৭ পৃ.)।'

এগুলো এমন কেন?

সে এর উত্তরে বলে যে, 'সবচেয়ে বড় কুফরী হলো মাজূসদের কুফরী। তাদের কুফরী ইয়াহূদী ও নাসারাদের কুফরীর চেয়েও বড়। আর হিন্দুদের কুফরী মাজূসদের কুফরীর চেয়েও বড়। আর ওয়াহাবীদের কুফরী হিন্দুদের কুফরীর চেয়েও বড় (ফতোয়া রিযভীয়্যাহ, ৬/১৩)।'

সে আরো বলে যে, ইয়াহূদী, মূর্তিপূজকসহ আরো অন্যান্য প্রকৃত কাফেরদের চেয়ে ওয়াহাবীরা আরো বেশি নিকৃষ্ট ও ক্ষতিকর (আহকামু শারীআত, ১২৪ পৃ.)।'

সে আরো বলে যে, ওয়াহাবীরা কুকুরের চেয়েও বেশি নিকৃষ্ট ও বেশি অপবিত্র। কেননা কুকুরের কোনো আযাব হবে না, কিন্তু এই ওয়াহাবীরা কঠিন আযাব পাওয়ার উপযুক্ত (ফতোয়া রিযভীয়্যাহ, ৫/১৩৮)।'

এই হলো বেরেলভী ও তার অনুসারী।

তারা এই ধার্মিক লোকদেরকে কাফের বলে আখ্যায়িত করেছে। কারণ, তারা কুসংস্কার ও কল্পকাহিনীতে বিশ্বাসী নয়, যেগুলো বেরেলভীরা নিয়ে এসেছে এবং কুসংস্কারাচ্ছন্ন লোকজন তৈরি করেছে। আর আল্লাহ তা'আলার ওপর মিথ্যারোপকারী ও রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ওপর মিথ্যা অপবাদ দেওয়া ব্যক্তিদের কথার বিপরীতে আল্লাহর তা'আলার কথা ও রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কথাকে তারা পরিত্যাগ করেননি। আর তারা তাদেরকে নির্যাতন করেছিল শুধু এ কারণে যে, তারা ঈমান এনেছিল পরাক্রমশালী ও প্রশংসার যোগ্য আল্লাহর উপর। আসমানসমূহ ও যমীনের সর্বময় কর্তৃত্ব যাঁর; আর আল্লাহ সবকিছুর প্রত্যক্ষদর্শী (সূরা আল বুরূজ: ৮-৯)।

অন্য আলোচনাতে যাওয়ার আগে, আমরা বর্ণনা করতে চাই যে, যে ব্যক্তি ওয়াহাবীদের কিতাব পড়ে তাদের ওপর বেরেলভী ও বেরেলভী মতবাদের

অনুসারীরা অনেক কঠোরতা করেছে এবং তাদের ছাড়া অন্য কারো কিতাব পড়তে বেরেলভীদেরকে ভীষণভাবে নিষেধ করেছে।

বেরেলভী বলে যে, ‘ওয়াহাবীদের বইপত্র পড়া হারাম (ফতোয়া রিযভীয়্যাহ, ৬/৯)।’

অন্য আরেকজন বলে যে, ‘আলেম ছাড়া অন্য কোনো ব্যক্তির জন্য ওয়াহাবীদের কিতাবের দিকে দৃষ্টিপাত করাও জায়েয নয় (বিহারু শারীআত, ৫/১১)।’

পক্ষান্তরে বেরেলভী বলে যে, এমনকি একজন বিজ্ঞ আলেমের জন্যও ওয়াহাবীদের কিতাবের দিকে দৃষ্টিপাত করা জায়েয নয় (মালফূযাত, বেরেলভী, ৩৩৫ পৃ.)।’

ওয়াহাবীদের কোনো এক আলেমের একটি কিতাব সম্পর্কে বেরেলভী বলে যে, মুসলিমদের জন্য এই কিতাবের দিকে দৃষ্টিপাত করাও হারাম (ফতোয়া রিযভীয়্যাহ, ৬/৫৪)।’

মুরাদ আবাদী তার জনৈক ইমাম থেকে বর্ণনা করে যে, ‘তুমি ইবনু তাইমিয়্যাহ ও ইবনুল কাইয়্যিম আল-জাওযিয়্যাহসহ আরো অন্যান্যদের কিতাবগুলোর দিকে দৃষ্টি দেওয়া থেকে সাবধান থাকবে, যারা নিজেদের প্রবৃত্তিকে ইলাহ হিসেবে গ্রহণ করেছে, আল্লাহ তা‘আলা তাদেরকে জেনেই বিভ্রান্ত করেছেন। আর তিনি তাদের শ্রবণশক্তি ও অন্তরের ওপর মোহর মেরে দিয়েছেন, আর তাদের দৃষ্টিশক্তির ওপরে দিয়েছেন পর্দা। আল্লাহ তা‘আলার পরে তাদেরকে আর কে হিদায়াত করতে পারে? কিভাবে এই নাস্তিকরা সীমা লংঘন করেছে এবং শরীআত ও সত্যের সীমানা ভেঙ্গে দিয়েছে? এভাবে তারা মনে করেছিল যে, তারাই তাদের রবের পক্ষ থেকে হিদায়াতের ওপর রয়েছে, অথচ বিষয়টি এমন নয়। বরং তারাই নিকৃষ্টতম গোমরাহীতে রয়েছে, তারাই সবেচেয়ে খারাপ বৈশিষ্ট্যের অধিকারী, আর সবেচেয় বেশি মিথ্যা ও অপবাদদাতা। ফলে আল্লাহ তা‘আলা তাদের সংঘকে লাঞ্ছিত করেছেন এবং তাদের মতো মানূষদের থেকে পৃথিবীকে পবিত্র করেছেন (ফাতাওয়া নাঈমুদ্দীন মুরাদ আবাদী, ৩৩-৩৪ পৃ.)।

হিজাজে ওয়াহাবীদের ক্ষমতা গ্রহণ করার কারণে হজ্জের বিকৃতি সম্পর্কে বেরেলভীদের ফাতওয়া:

কুরআন ও সুন্নাহকে আঁকড়ে ধারণকারী, সালাফে সালেহীনের অনুসারীদের ওপর বেরেলভীদের বিদ্বেষের অন্তর্ভুক্ত হলো, তারা হজের ফরয হওয়াকে মাফ হয়ে যাওয়ার পক্ষে ফাতওয়া দিয়েছিল। আর একটি পুস্তিকা প্রকাশ করেছিল, যা এই নামে পাঠ করা হবে যে, 'তানবিরুল হুজ্জাহ লিমায় ইয়াজুয়ু ইলতিওয়াইল হুজ্জাহ'। এই কিতাবটি রচনা করে বেরেলভীর ছেলে ও বেরেলভীদের মুফতী মুস্তফা রেযা।

উপমহাদেশের সকল অঞ্চল থেকে পঞ্চাশ জনেরও বেশি বিশিষ্ট ও বিজ্ঞ আলেমের মাধ্যমে এই কিতাবটি অনুমোদন করা হয়েছিল ও সাক্ষরিত হয়েছিল। তাদের মধ্যে ছিল মাযহার বেরেলভী, যে নিজেকে নামকরণ করেছিল আবীদুর রেযা হাশত আলী, আরো ছিল বেরেলভীর দ্বিতীয় পুত্র হামীদ রেযা, মুরাদ আবাদী নাইমুদ্দীন, দিলদার আলী, এছাড়াও সেই সম্প্রদায়ের অনেক নেতৃবৃন্দ। এই পুস্তিকাটি এই খুতবা দিয়ে শুরু করা হয়েছে যে, হে আল্লাহ! আমাদেরকে ক্ষমা করে দিন, আমাদের ওপর রহম করুন। আপনিই আমাদের অভিভাবক। অতএব কাফির সম্প্রদায়ের ওপর আমাদেরকে সাহায্য করুন, বিশেষ করে ফাসাদ সৃষ্টিকারী নাজদীদের ওপর আমাদেরকে সাহায্য করুন, যারা তীর বেরিয়ে যাওয়ার মতো দীন থেকে বেরিয়ে গেছে, আটা থেকে চুল বের হয়ে যাওয়া মতো যারা দীন থেকে বেরিয়ে গেছে। তারপর সে সৌদি সরকারের জন্য যেই ধরনের গালিগালাজ পেয়েছে, সেগুলোর তাদের জন্য ব্যবহার করেছে। এমন কোনো মিথ্যারোপ নেই, যা সে বাদশাহ আব্দুল আযীয আলে শাইখ, আল্লাহ তা'আলা তাকে দয়া করুন ও তাকে ক্ষমা করুন, তার জন্য ব্যবহার করেনি। আবার সে বাদশাহার ব্যাপারে সকল ধরনের অপবাদ দিয়েছে। আল্লাহ তা'আলাকে কোনো প্রকার ভয় করা ও লজ্জা করা ছাড়াই সে সাহসের সাথে এগুলো বলেছে।

অবশেষে সে তাদের ক্ষমতা থাকার সময়েই ফরয হজ্জকে মাফ হয়ে যাওয়ার বিষয়ে ফাতওয়া প্রদান করে। এই ফাতওয়াতে সাক্ষরকারীদের একজন মন্তব্য করে যে, এই ফাতওয়ার মাধ্যমে হারামাইনের ভূমি থেকে শয়তান নাজদীদেরকে পবিত্র করা হবে।

এরাই হলো বেরেলভী।

এটি হলো, তাওহীদপন্থী বান্দা এবং যারা আল্লাহর কিতাব ও তার রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সুন্নাহর অনুসরণ করে তাদের প্রতি এই বেরেলভীদের বিদ্বেষ। এই ফাতওয়া যদি কিছু ইঙ্গিত করেই, তাহলে সেটি ইঙ্গিত করে তাদের হৃদয়ের কঠোরতা, তাদের মনের ক্ষত, তাদের জিহ্বাকে

দীর্ঘায়িত করা, দীন নিয়ে খেল তামাশা করা, তাদের হীন উদ্দেশ্যে শরীআতকে তাদের লক্ষ হিসেবে নির্ধারণ করা, এমনকি কোনো কারণ ছাড়াই তারা আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে ফরয হওয়া একটি বিধানকে তারা মুসলিমদের থেকে মাফ হয়ে গেছে বলে ফাতওয়া জারি করে। বরং এর পেছনে কারণ ছিল, মানুষের ওপর তাদের হিংসা বিদ্বেষকে প্রকাশ করা, যেই মানুষদেরকে আল্লাহ তা'আলা সম্মানিত করেছেন ও তাদেরকে কর্তৃত্ব দান করেছেন।

পৃথিবীতে বেরেলভী সম্প্রদায়ের মতো ইসলামের দিকে নিজেদেরকে সম্পৃক্ত কারী অন্য কোনো সম্প্রদায় এতো বেশি কঠোর হৃদয়ের অধিকারী ও এতো বেশি অভিশাপকারী আছে বলে আমরা জানি না। তবে শিয়ারা ব্যতীত। তাই আমরা জানি না যে, শিয়া ও বেরেলভীদের মধ্যে কারা বেশি কঠোর ও খারাপ?

বেরেলভী সম্প্রদায়ের লোকজন, তাদের উৎপত্তি, তাদের আকীদা, বিরোধীদের প্রতি তাদের আকীদা বিশ্বাস বর্ণনা করার জন্য আমরা এখানে দীর্ঘ আলোচনা করেছি।

পক্ষান্তরে অন্যান্য দল ও জামাআত, যারা পাপাচার করেছে ও কুফরী করেছে এবং অন্যান্য আলেমগণ, যাদেরকে এই সম্প্রদায়ের পক্ষ থেকে নাস্তিক হওয়া ও মুরতাদ হওয়ার বিধান আরোপ করা হয়েছে, আমরা এখানে সংক্ষিপ্তভাবে তাদের নাম বর্ণনা করবো, সাথে সাথে কিতাব ও তাদের দিকে ইঙ্গিত করবো, যাদেরকে কাফের বলে ফাতওয়া দেওয়া হয়েছে এবং যারা তাদেরকে কাফের বলে ফাতওয়া দিয়েছে।

বেরেলভী ও তার অনুসারীরা ভারতীয় উপমহাদেশের সংস্কারবাদী কবি, লেখক, হকের দিকে আহবানকারীদেরকে কাফের বলে আখ্যায়িত করেছে। যাদেরকে তারা কাফের বলেছে, তারা হলো, শাইখ নাযীর আহমাদ খান দেহলভী, সায়্যেদ শিবলী নুমানী, সায়্যেদ আলতাফ হুসাইন হালী, শাইখ যাকাউল্লাহ, যার উপনাম শামসুল উলামাহ, নওয়াব মাহদী আলী খান, নওয়াব মুশতাক হুসাইন।'

'এরা সকলেই হলো, নাস্তিকতার শীর্ষস্থানীয় ব্যক্তি, নাস্তিকতা উপদেষ্টা এবং নাস্তিকতার প্রচারক (তাজানুবু আহলিস সুন্নাহ, ৮৬-৮৭ পৃ.)।'

৩৩. আবুল কালাম মহিউদ্দীন আহমাদ

‘আবুল কালাম মহিউদ্দীন আহমাদ, যাকে ভারতের ইমাম বলা হয়, যিনি শাইখুল ইসলাম ও ইসলামী দাওয়াতের মুজাদ্দিদ ইবনু তাইমিয়্যাহ রহিমাহুল্লাহকে ভারত পাকিস্থান উপমহাদেশে পরিচিত করেছেন এবং শাইখুল ইসলামের কিতাবগুলোকে উর্দু ভাষাতে অনুবাদ করার নির্দেশ দিয়েছেন। বেরেলভী তার সম্পর্কে অনেক নোংরা কথাবার্তা বলেছে, তাকে মিথ্যাবাদী ও পাপাচারী বলেছে এবং সে তাকে মিথ্যারোপকারী ও অবাধ্য বলে নামকরণ করেছে (দাওয়ামুল আইশ, ৯৯ পৃ. থেকে শেষ পর্যন্ত)।’

আর বেরেলভীর প্রতিনিধি স্পষ্টভাবে তাকে মুরতাদ বলে ঘোষণা করেছে। সে বলেছে যে, নিশ্চয় আবূল কালাম আযাদ মুরতাদ।’ অনুরূপভাবে তার কিতাব ‘তরজমাতুল কুরআন’ কিতাবকে সে অপবিত্র কিতাব বলে নামকরণ করেছে (তাজানুবু আহলিস সুন্নাহ, ১৬৬ পৃ.)।’

৩৪. কবি ড. মুহাম্মাদ ইকবাল

মুহাম্মাদী পুস্তিকার কবি এবং ভারত পাকিস্থান উপমহাদেশের সকল মুসলিমদের কবি, আল্লাহ তা‘আলা তার ওপর সালাত ও সালাম নাযিল করুন, যিনি লোকজনের মধ্যে জিহাদের চেতনাকে ফুকে দিয়েছিলেন, জাহেলী রীতি নীতি পরিত্যাগ করতে তাদেরকে উদ্বুদ্ধ করেছিলেন এবং কাফেরদের রীতিনীতি ও বিভিন্ন ধর্মশালা ত্যাগ করার জন্য তাদেরকে উদ্বুদ্ধ করেছিলেন এবং মাযহাবী গোড়ামী ও কোনো ব্যক্তির অন্ধ তাকলীদ করা থেকে তাদেরকে সতর্ক সাবধান করেছিলেন, তিনি হলেন ড. মুহাম্মাদ ইকবাল।

বেরেলভীরা তার সম্পর্কে বলে যে, নিশ্চয় নাস্তিক দার্শনিক ড. মুহাম্মাদ ইকবালের মুখ দিয়ে ইবলীস শয়তান কথা বলে (তাজানুবু আহলিস সুন্নাহ, ৩৪০ পৃ.)।’

তারা আরো বলেছে যে, সঠিক দীন ইসলামের সাথে মুহাম্মাদের ইকবালের মাযহাবের কোনো সম্পর্ক নেই (তাজানুবু আহলিস সুন্নাহ, ৩৪১ পৃ.)।’

বেরেলভীর খলীফা ও প্রতিনিধি বলে যে, মুসলমানদের জন্য মুহাম্মাদ ইকবালের সাথে উঠাবসা করা, তার সাথে কথা বার্তা বলা জায়েয নয়। মুসলমানরা এমনটি করলে তারা অবশ্যই বড় ধরনের গুণাহগার হবে (নাকলান আন যিকরি ইকবার, ১২৯ পৃ.)।’

৩৫. শাইখ জাফর আলী

তারা ইসলামী কবি, তাওহীদ এবং তাওহীদপন্থীদের কবি শাইখ জাফর আলীকেও কাফের বলেছে। অথচ শাইখ জাফর আলী দাসে পরিণত হওয়া মানুষদের অন্তরে জিহাদের আগ্রহকে পুনরুজ্জীবিত করেছিলেন, নিকৃষ্ট ইংরেজ উপনিবেশিকতা ও কাদিয়ানী দালাল এবং অন্যান্য ভ্রান্ত সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে তাদের অন্তরের আগুন জ্বালিয়ে তুলেছিলেন। তাই বেরেলভীরা তাকে কাফের বলেছিল, এমনকি তার কাফের হওয়ার বিষয়ে স্বতন্ত্র একটি কিতাবই লিখেছিল, যার নাম দিয়েছিল 'আল কাসওয়ারাহ আলা আদওয়ারিল হুমুরির কাফারাহ আল-মুলাক্কাব আলা জাফর রম্মাহ মিনাল কুফর'। এতে অনেক প্রবীন বেরেলভী আলেমদের সাক্ষর ছিল। আর এই কিতাব রচনা করেছিল বেরেলভীর ছেলে মুস্তফা রেযা খান।

অনুরূপভাবে যেসব কবি, লেখকগণ নিপীড়িত ভারতীয়দের মধ্যে জিহাদের জন্য এবং জাহেলী রীতি নীতি এবং প্রাচীন পৌত্তলিক ঐতিহ্যকে প্রত্যাখ্যান করার জন্য আকাঙ্খা জাগিয়েছিলেন এবং তাদের কবিতা ও লেখনীর মাধ্যমে কুরআন ও সুন্নাহর দিকে প্রত্যাবর্তন করার জন্য মানুষজনকে উৎসাহিত করেছিলেন, তারা সকলেই কাফের ও পাপাচারী!

অনুরূপভাবে যারা আধুনিক শিক্ষার জন্য, যেমন বিজ্ঞান, রসায়ন, শিল্প, প্রযুক্তি, চিকিৎসা ও আইন বিষয়ক শিক্ষার প্রতিষ্ঠানের সূচনা করেছেন, যাতে করে ভারতীয় মুসলমানরা সেগুলো দিয়ে নিজেদেরকে সজ্জিত করতে পারে, তাদের সামনে আধুনিক বিভিন্ন সমস্যাগুলো মোকাবেলা করতে পারে, আবার যাতে তারা প্রস্তুতি ও সংখ্যাতে হিন্দু এবং আধিপত্য বিস্তারকারী ব্রিটিশ ও ওপনিবেশিকদের কাছে পরাজিত না হয়, তারা সকলেই কাফের ও মুরতাদ। কেননা তারা বান্দাদেরকে অজ্ঞতা ও দাসত্ব থেকে মুক্ত করতে চায়। এরই অন্তর্ভুক্ত হলো এই কবরপূজারীদের দাসত্ব থেকে মুক্ত করা। তারাও কাফের। তাদের শীর্ষে রয়েছেন, ভারত পাকিস্থান উপমহাদেশের প্রথম আধুনিক মুসলিম বিশ্ববিদ্যালয় 'আলিগড় বিশ্ববিদ্যালয়' এর প্রতিষ্ঠাতা সায়্যেদ আহমাদ। কিছু মানুষ বেরেলভীকে বলে যে, আলীগড় রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আরে বাইতের থেকেও নাকি সম্মানীত। এর উত্তরে বেরেলভী বলে যে, এমন ব্যক্তি নিকৃষ্ট ও মুরতাদ। আর হাদীসে বর্ণিত হয়েছে যে, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, তোমরা মুনাফিককে সায়্যেদ বলো না। কেননা সে যদি তোমাদের সায়্যেদ না হয়, তাহলে তোমরা তোমাদের রবকে অসন্তুষ্ট করবে (মালফূযাত, বেরেলভী, ৩/৩১৯)।'

'তাজানুবু আহলিস সুন্নাহ' কিতাবের লেখক সায়্যেদ আহমাদকে মুরতাদ ও নাস্তিক বলে বিধান আরোপ করেছে। এমনকি সে বলেছে যে, যে ব্যক্তি সায়্যেদ আহমেদের নিশ্চিত কুফরীগুলোর কোনো একটি কুফরী সম্পর্কে জানতে পারে, তারপরও তার কাফের হওয়ার বিষয়ে দ্বিধা করে, তাহলে সেও কাফের, মুরতাদ এবং চিরস্থায়ী জাহান্নামী (তাজানুবু আহলিস সুন্নাহ, ৮৬ পৃ.)।'

ভারতীয় উপমহাদেশের ইসলামী সম্প্রদায়ের নেতা, হিন্দু ও ব্রিটিশ উপনিবেশবাদীদের দ্বৈত শৃঙ্খল থেকে পাকিস্তানের মুক্তিদাতা এবং বিশ্বে বৃহত্তম ইসলামী রাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠাতা মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ একজন কাফের এবং তার দল মুসলিম লীগ এবং এর সদস্যরা কাফের। বেরেলভী বলে যে, মুহাম্মাদ আলী জিন্নাহ একজন কাফের, মুরতাদ। তার অনেক কুফরী আকীদা রয়েছে। শরীআতের বিধানে সে নিশ্চিতভাবে মুরতাদ এবং ইসলাম থেকে বেরিয়ে গেছে। যে ব্যক্তি তার কুফরীর বিষয়ে ও তার কাফের হওয়ার বিষয়ে দ্বিধা করবে, সেও কাফের হয়ে যাবে (তাজানুবু আহলিস সুন্নাহ, ১১৯ - ১২২ পৃ.)।

তার দল সম্পর্কে বেরেলভী বলে যে, তার দল মুসলিম দল নয়, বরং তার দলটি অন্ধকারাচ্ছন্ন দল (তাজানুবু আহলিস সুন্নাহ, ১১২ পৃ.)।'

অন্য আরেকজন বলেছে যে, নাস্তিক হলো পৃথিবীর সবচেয়ে জঘন্য মানুষ, আর সে পশুর চেয়েও জঘন্য, আর নাস্তিক হলো জাহান্নামীদের কুকুর, একজন সত্যিকারের আস্তিক ও মুসলমানের পক্ষে কি কুকুর ও জাহান্নামের কুকুরকে নেতা ও অনুসরণীয় ব্যক্তি বানানো সম্ভব? কখনোই নয়। এমনটি হওয়া তো বহু দূরের কথা।'

সে আরো বলে যে, মুসলিম লীগের বিজ্ঞপ্তি ও সংবিধানের অনেক কুফরী ও বিভ্রান্তিমূলক কথা রয়েছে (তাজানুবু আহলিস সুন্নাহ, ১৮৬ পৃ.)।'

সে আরো বলে যে, যে ব্যক্তি মুহাম্মাদ আলীকে মুসলিম বলে বিশ্বাস করবে ও তার প্রশংসা করবে, সে মুরতাদ হয়ে যাবে। আর তার স্ত্রী তার বিবাহ বন্ধন থেকে বেরিয়ে যাবে। আর তার তাওবাহ করা পর্যন্ত মুসলিমদের ওপর তাদেরকে পৃথক করে দেওয়া আবশ্যক হয়ে যাবে (আল জাওয়াবাতুস সানিয়্যাহ, আবূল বারাকাত বেরেলভী, ৩ পৃ.)।'

এই ধরনের আরো বহু কথা রয়েছে।

শেষ কথা, যদিও এতেই শেষ নয়, উপমহাদেশের খতীব সায়্যেদ আতাউল্লাহ বুখারী সম্পর্কে বলা হয়েছে যে, শেষ যুগে তার মতো আর অন্য খতীবকে দেখা যায়নি। অথচ তারা তাকেও কাফের বলেছে এবং তার অনুসারীদেরকেও কাফের বলেছে। কারণ তারা ইসলামী খিলাফত ও ইসলামী প্রতিষ্ঠা করার দিকে আহবান করতেন, যেখানে আসমানী ইলাহী শরীআতের বিধান কার্যকর করা হবে। বেরেলভীরা বলেছে যে, বুখারীর জামাআত হলো কুফরী ও মুরতাদদের জামাআত (তাজানুবু আহলিস সুন্নাহ, ৯০ ও ১৬০ পৃ.)।'

অনুরূপভাবে তারা পাকিস্থানের রাষ্ট্রপতি জিয়াউল হক, পাঞ্জাব অঞ্চলের আমীর সাওয়ার খান এবং পাকিস্থান সরকারের অন্যান্য মন্ত্রীদেরকেও কাফের বলেছিল। কারণ তারা মসজিদে নাববীর ইমাম ও মাসজিদুল হারামের ইমামের পিছনে সালাত আদায় করেছে, যখন তারা পাকিস্থান সফরে এসেছিলেন। জনৈক ব্যক্তি প্রশ্ন করে যে, এই সকল মানুষ হারামাইনের ইমামের পিছনে সালাত আদায় করেছে, তাদের বিধান কী? তখন তারা এর উত্তরে বলেছিল যে, হযরত বেরেলভী ফাতওয়া দিয়েছিল, যে ব্যক্তিই নাজদী ওয়াহাবীদেরকে মুসলিম বলে বিশ্বাস করবে অথবা তাদের পিছনে সালাত আদায় করবে, সেই কাফের মুরতাদ হয়ে যাবে (ফতোয়া রিযভীয়্যাহ, ৬/১১)।'

এই ধরনের আরো বহু কথা রয়েছে।

বেরেলভী সম্প্রদায় যখন এমন কাউকে পেলো না, যাকে তারা কাফের বলতে পারে এবং তাদের বিরোধীদের মধ্যে এমন কেউ অবশিষ্ট ছিল না, যে ব্যক্তি কাফের হওয়া ও মুরতাদ হওয়ার কথা উচ্চারণ করে, তখন তারা পৃথিবীর বুকে চলাফেরা করা প্রত্যেককেই কাফের বলতে শুরু করে। তারা বলে যে, যে ব্যক্তি তুর্কি টুপি পুড়িয়ে দিবে, সে ব্যক্তি ইসলাম থেকে বেরিয়ে যাবে (ফতোয়া রিযভীয়্যাহ, ৬/১১)।'

বেরেলভী নিজেই বলেছে, যে ব্যক্তি ইংরেজদের টুপি পরবে, সে কাফের হয়ে যাবে, তার কুফরীর বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই (ফতোয়া রিযভীয়্যাহ, ৬/৩০)।'

সে আরো বলে যে, যে ব্যক্তি আলেমদের বিরুদ্ধে কথা বলে, সে মুনাফিক ও কাফের (ফতোয়া রিযভীয়্যাহ, ৬/২৬)।'

সে আরো বলে যে, যে ব্যক্তি আলেমদেরকে অপমান করে বা তাদেরকে তুচ্ছ মনে করে, তাহলে সে কাফের হয়ে যাবে (ফতোয়া রিযভীয়্যাহ, ৬/২৪)।'

বেরেলভী আরো বলে, যে ব্যক্তি বলবে যে, আবূ হানীফা রহিমাহুল্লাহর কিয়াস সঠিক নয়, তাহলে সে কাফের হয়ে যাবে (ফতোয়া রিযভীয়্যাহ, ৬/৩৪)।'

এর সাথে সাথে সে বলে, যে ব্যক্তি আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো জন্য সিজদা করার অনুমতি দেয়, তাহলে তাকে কাফের বলা যাবে না (ফতোয়া রিযভীয়্যাহ, ৬/৭০)।'

আর যে ব্যক্তি বলবে যে, আমাদের ইলাহ হলো মুহাম্মাদ, তাতেও সে কাফের হবে না (ফতোয়া রিযভীয়্যাহ, ৬/১১৪)।'

আবার যে ব্যক্তি বলবে যে, আমি পবিত্র, আমার মর্যাদা কতই না বেশি, তাতেও সে কাফের হবে না (ফতোয়া রিযভীয়্যাহ, ৬/১৪৭)।'

এছাড়াও আরো অনেক কথা রয়েছে।

কিন্তু কেউ যদি কোনো আলেমকে বলে 'উয়াইলিম' (আলেমকে ছোট করে এভাবে বলে) তাহলে সে কাফের হয়ে যাবে (ফতোয়া রিযভীয়্যাহ, ৬/১১৯)।'

তার এই কথার সাথে সাথে কাফের বলাতে সতর্কতা অবলম্বন করাও আবশ্যক বলে সে মনে করতো।

কেননা সে বলেছে, যদি কারো বিষয়ে নিরানব্বই দিক থেকে কুফরী হওয়ার সম্ভাবনা থাকে এবং শুধু এক দিক থেকে ইসলাম থাকার সম্ভাবনা থাকে, তাহলে তার ইসলাম থাকার দিকটাকেই গ্রহণ করা উচিত (ফতোয়া রিযভীয়্যাহ, ৬/১১৪)।'

সে আরো বলেছে যে, কোনো ব্যক্তি যদি কোনো মুসলিমকে কাফের বলে, অথচ সে কাফের নয়, তাহলে সেই কুফরী তার নিজের দিকেই ফিরে আসবে, যেমনটি হাদীসে বর্ণিত হয়েছে (ফতোয়া রিযভীয়্যাহ, ৬/১১)।'

পরিশেষে, বেরেলভী একজন মুসলিমকে কাফের বলার বিষয়ে খুবই সতর্কতা অবলম্বন করেছে, এই বিষযে সে তাড়াহুড়া করতো না (আনওয়ার রেযা, ২৯১ পৃ.)।

অন্য আরেকজন বলেছে, কোনো মুসলিমকে কাফের বলার ক্ষেত্রে সে খুবই সতর্কতা অবলম্বন করতো (ফাযিলু বেরেলভী, মাসউদ আহমাদ, ৪৪ পৃ.)।'

বেরেলভী নিজের সম্পর্কে নিজেই লিখেছে যে, আমরা কোনো মুসলিমকে কাফের বলার বিষয়ে সতর্কতা অবলম্বন করি। আর যে ব্যক্তি 'লা ইলাহা

ইল্লাল্লাহ’ বলেছে, তাকে যথাসম্ভব কাফের না বলারই চেষ্টা করি (ফতোয়া রিযভীয়্যাহ, ৬/২৫১)।’

এমন সতর্কতা ও সাবধনতা থাকার পরেও এই হলো তার ও তার অনুসারীদের অবস্থা যে, তারা বিশ্বের সবাইকেই কাফের বলেছে। আর যদি তারা সতর্কতা অবলম্বন না করতো, তাহলে তারা কী যে করতো তা আমাদের জানা নেই।

একটি মজার বিষয় দিয়ে আমরা এই অধ্যায়টি শেষ করছি, যেটি ভারত পাকিস্থানের আরেমগণ তার বই থেকেই তা প্রমাণ করেছেন। তাহলো, সে চরম ক্ষোভ ও ক্রোধে নিজেকেই বহুবার কাফের বলেছে। এমনকি সে কিছু মানুষের কাফের হওয়ার বিষয়ে ফাতওয়া জারি করে বলে, ‘যে ব্যক্তি তাদের কাফের হওয়া ও তাদের আযাব হওয়ার বিষয়ে সন্দেহ পোষণ করবে, সেও কাফের হয়ে যাবে। তারপর সে ভুলে গিয়ে তাদেরকে মুসলিম বলে।’

অন্যদিকে, আমরা বলি, সে বহুবার বলেছে ও লিখেছে, যে ব্যক্তি আওলাদে রাসূলের কাউকে (রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বংশধরদের কাউকে) অবজ্ঞা বা হেয়জ্ঞান করবে সে কাফের হয়ে যাবে (বালেগুন নূর, ২৩ পৃ.)।’

অথচ সে নিজে শুধু তাদেরকে অবজ্ঞাই করেনি, বরং অনেককে কাফের বলে ঘোষণা করেছে। যেমন মুহাদ্দিস দেহলভী, সায়্যেদ নাযীর হুসাইনসহ আরো অনেক বিশিষ্ট আলেমদেরকে সে কাফের বলেছে, অথচ তারা ছিলেন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বংশধর। আর তাদের আলোচনা পূর্বেই করা হয়েছে। সুতরাং আমরা জানি না যে, বেরেলভী কীসের উপযুক্ত হতে পারে?

আল্লাহ তা‘আলা যেন আমাদের অনিষ্ট, আমাদের কর্মসমূহের অনিষ্ট ও আমাদের জিহ্বার অনিষ্ট থেকে আমাদেরকে রক্ষা করেন। আমীন।

পঞ্চম অধ্যায়

বেরেলভী মতবাদ ও বিভিন্ন কল্পকাহিনী

১. কল্পকাহিনী

প্রতিটি বিদআতী সম্প্রদায়েরই বিভিন্ন কেসসা কাহিনী ও কল্পকথা রয়েছে, যাতে করে তাদের বাতিলটা শক্তিশালী হয় এবং তাদের মিথ্যা আরো জোরদারপূর্ণ হয়, আবার যাতে করে তারা দলীল প্রমাণ বিহীন না থাকে এবং যাতে করে কেউ তাদেরকে দলীল প্রমাণ না থাকার কারণে তিরস্কার করতে না পারে। যখন তারা ইসলামী শরীআতের মূল দুটি উৎস কুরআন ও সুন্নাহতে তাদের কোনো দলীল খুঁজে না পায়, তখন তারা বিভিন্ন কল্পকাহিনী ও মিথ্যা গল্পের আশ্রয় নেয়। এগুলোকে তারা নিশ্চিত দলীল প্রমাণের মতো অগ্রাধিকার দেয়, যাতে করে তাদের জন্য একটি স্তম্ভ দাঁড়িয়ে যায়। কিভাবে এমনটি করা তাদের জন্য সম্ভব হয়। কেননা বাতিল দিয়ে কোনো বাতিল জিনিস শক্তিশালী হয় না, লাঞ্ছিত ব্যক্তি অন্য লাঞ্ছিত ব্যক্তিকে সাহায্য করতে পারে না। আর মিথ্যা শুধু অন্ধকারকেই জমা করে, যাতে এক অন্ধকার আরেক অন্ধকারের ওপর থাকে। আর অন্ধকার শুধু মাকড়শার ঘরই নির্মাণ করতে পারে। আর নিশ্চয় সবচেয়ে দুর্বল বাড়ি হলো মাকড়শার বাড়ি, যদি তারা জানতো। আর তাদের সম্পর্কেই আল্লাহ তা'আলা বলেছেন, ওরাই তারা, পার্থিব জীবনে যাদের প্রচেষ্টা পণ্ড হয়, যদিও তারা মনে করে যে, তারা সৎকাজই করছে (সূরা আল কাহাফ: ১০৪)।

সত্য ও বাস্তবতা থেকে বিমুখ হওয়া এবং কুরআন ও সুন্নাহকে অবহেলা করার কারণে তারা তাদের দীনকে ক্ষতিগ্রস্থ করেছে এবং প্রতিষ্ঠিত সত্য ও বাস্তব ঘটনা থেকে বিচ্যুত হওয়ার কারণে তারা তাদের দুনিয়াকেও ক্ষতিগ্রস্থ করেছে। আর এটিই হলো সুস্পষ্ট ক্ষতি। পক্ষান্তরে যে ব্যক্তি বিদআত ও নতুন উদ্ভাবিত কাজকর্ম থেকে দূরে থাকে এবং কুপ্রবৃত্তি ও ধারনা থেকে বেঁচে থাকে, সে হিদায়াতকে আঁকড়ে ধরে এবং সেই নূর বা আলোর অনুসরণ করে, যেটি আল্লাহ তা'আলা নাযিল করেছেন অন্ধকারকে দূর করতে ও অজ্ঞতাকে নিশ্চিহ্ন করতে। অন্ধকার ও আলো কি সমান হতে পারে? আল্লাহ তা'আলা বলেন, আর আল্লাহ তা'আলা যার জন্য নূর রাখেননি তার জন্য কোনো নূর নেই (সূরা আন নূর: ৪০)।

ইসলামের দিকে নিজেদেরকে সম্পৃক্তকারী কত বিভ্রান্ত দল কুরআনকে পরিত্যাজ্য হিসেবে গ্রহণ করেছে এবং তারা তাদের অনুসারীদেরকে নিজেদের

আনুগত্য ও অনুসরণ করাকে আবশ্যক করেছে। আর এমন কত সম্প্রদায় রয়েছে, যারা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সুন্নাতকে পরিত্যক্ত বানিয়েছে এবং বাতিলপন্থীদের বিদআতকে অনুসরণীয় বানিয়েছে।

বেরেলভীরা এই সকল মানুষদের অভ্যাস ও পন্থার ওপর রয়েছে। তারা বাতিলকে প্রতিষ্ঠিত করার জন্য এবং হককে বাতিল প্রমাণ করার জন্য সকল ধরনের মিথ্যাকেই তার গ্রহণ করে এবং সকল হাস্যকর বিষয়কেই তারা আঁকড়ে ধরে। এর মাধ্যমে তারা শুধু নিজেদেরকেই ধোকা দেয় অথচ তারা তা বুঝে না।

২. হাস্যকর ও দুঃখজনক কাহিনী

একই সাথে তাদের হাস্যকর ও দুঃখজনক কথা রয়েছে, আর সেগুলোর সংখ্যা অনেক বেশি। কিন্তু আমরা এখানে শুধু সেগুলো বর্ণনার ওপরই সীমাবদ্ধ থাকবো, যেগুলো বেরেলভী আহমাদ রেযা নিজেই বর্ণনা করেছে। এর বাহিরে খুব কমই বর্ণনা নিয়ে আসবো, যেগুলো তার বিশিষ্ট অনুসারী, সাহায্যকারীরা এবং তাদের নিকটে বিশ্বস্ত ব্যক্তিরা বর্ণনা করেছে। বেরেলভী তার দুর্বল বিশ্বাসগুলো প্রমাণ করার চেষ্টা করেছে, যেই বিশ্বাসগুলো কুরআন ও সুন্নাহর সম্পূর্ণ বিপরীত। যেমন, ওলী আওলিয়াদের ক্ষমতা, সাহায্যপ্রার্থীদেরকে সাহায্য করা, বিপদগ্রস্থের ডাকে সাড়া দেওয়া, সংকটাপন্ন ব্যক্তিদের সংকট দূর করা, ওলীদের গায়েব জানা, সকল স্থান ও সময়ে তাদের উপস্থিত থাকা ইত্যাদি। বেরেলভী কোনো এক শায়খের বর্ণনা দেওয়ার আগে বলতো যে, সেই শাইখকে তার মুরীদ এক বছরের বা তারও বেশি সময়ের দূরুত্ব থেকে ডাকলেও সেই শাইখ তার মুরীদের ডাকে সাড়া দেয় (আনওয়ারুল ইনতিবাহ ফী হিল্লী নিদা ইয়া রাসূলাল্লাহ, ১৮২ পৃ.)।

কোনো একজনের কথা বর্ণনা করে বলে যে, সে বলেছে, ‘আমি তাদের কবরে পূর্ণ ক্ষমতা রাখি। সুতরাং যে ব্যক্তির প্রয়োজন রয়েছে, সে যেন আমার মুখোমুখী আসে এবং সেই প্রয়োজনের কথা বলে, তাহলে আমি তার সেই প্রয়োজন পুরা করে দিবো।’

৩. এক বছরের রাস্তার দূর থেকে পীর সাহেবের সাড়া দান

এই ধরনের মিথ্যা কথাগুলোকে সত্যায়ণ করার জন্য সে মিথ্যা কাহিনী বর্ণনা করে, যাতে করে মিথ্যার মাধ্যমে অন্য মিথ্যা শক্তিশালী হয়। তাই সে বর্ণনা করে যে, ‘আমার নেতা মাদিয়ান ইবনু আহমাদ আল-উশবুনী একদা ওযূ করছিল। সে তার জুতা খুলে প্রাচ্যের দেশগুলোর দিকে সেই জুতা নিক্ষেপ

করলো। পুরো এক বছর পরে তার নিকটে এক এক ব্যক্তি আসলো, আর তার নিকটে সেই জুতা ছিল। সেই ব্যক্তি বললো, হে আমার শাইখ! আমার মেয়ে মরুভূমিতে ছিল, আর এক খারাপ লোক তার ক্ষতি করার জন্য এসেছিল। আর আমার মেয়ে তখন আমার শাইখ ও মুরশিদের নাম জানতো না। তাই সে বলে ডাক দিয়ে বললো, 'হে আমার পিতার শাইখ! আমার দিকে নজর দিন। এই নাম উচ্চারণ করা এবং সাহায্য চাওয়ার সাথেই সাথেই সেই জুতা এসে হাজির হলো এবং সেই ব্যক্তির মাথায় আঘাত করলো। এর মাধ্যমে আমার মেয়ে রক্ষা পেলো (আনওয়ারুল ইনতিবাহ ফী হিল্লী নিদা ইয়া রাসূলাল্লাহ, ১৮২ পৃ.)।

ইবনু মুহাম্মাদ আল-হানাফী থেকে এমন ঘটনা বর্ণিত হয়েছে। সেটি হলো, তার কোনো এক মুরীদ সফরে ছিল। পথিমধ্যে চোরের দল তাকে আক্রমণ করে। তাদের একজন তাকে জবেহ করার জন্য তার বুকের ওপর বসে। তখন সে ডাক দিয়ে বলে, হে আমার ওস্তাদ! মুহাম্মাদ আল-হানাফী, আমাকে রক্ষা করুন। এই নাম ধরে ডাকার সাথে সাথেই একটি জুতা উড়ে এসে উপস্থিত হয় এবং চোরের বুকে আঘাত করে। এতেই সে অজ্ঞান হয়ে যায়। আর এর মাধ্যমে সায়্যেদ হানাফীর মুরীদ রক্ষা পায় (আনওয়ারুল ইনতিবাহ ফী হিল্লী নিদা ইয়া রাসূলাল্লাহ, ১৮১ পৃ.)।'

সে আরেকটি গল্প রচনা করে। সেটি হলো, এক দরিদ্র ব্যক্তি ভিক্ষা করছিল। একবার সে এক ব্যক্তির দোকানের দরজায় দাঁড়িয়ে দোকানদারকে একটি রুপি দিতে বলল, কিন্তু কর্মচারী তাকে তা দিতে অস্বীকার করল। তাই দরিদ্র লোকটি তাকে বলল: আমাকে দাও, নয়তো দোকান উল্টিয়ে দেবো। তখন লোকেরা জড়ো হয়ে ভিড় কলো এবং একজন সদয় মনের লোক তাদের পাশ দিয়ে যাওয়ার সময় কর্মচারীকে বলল যে, তাকে এক রুপি দাও, অন্যথায় তোমার দোকান উল্টে যাবে। তখন লোকেরা তাকে বলল, হে শাই, সে একজন অজ্ঞ লোক। আর এটি শরীআতের বিরোধ কাজ। কিভাবে সে এমন কাজ করতে পারে? তখন শাইখ বললো, আমি তার অন্তর ভালোভাবে দেখলাম এবং তা শূন্য অবস্থাতে পেলাম, তাই আমি তার শায়খের অভ্যন্তরে তাকালাম এবং এটিও শূন্য অবস্থাতে পেলাম। কিন্তু আমি গভীরভাবে অনুসন্ধান করে তার শায়খের শায়খের দিকে তাকালাম এবং তাকে দেখতে পেলাম যে, সে একজন জ্ঞানী ও ক্ষমতাধর ব্যক্তি ছিল এবং আমি তাকে এই দরিদ্র ব্যক্তির জন্য দাঁড়িয়ে থাকতে দেখেছি এবং সে যা বলবে সেই শাইখ তা পালন করবে এবং এই ব্যক্তির দোকানকে উল্টিয়ে দিবে (মালফুযাত লি মুজাদ্দিদীল মিআতিল হাযিরাহ, ১৮৯ পৃ.)।

ওলী আওলিয়াদের ক্ষমতা, সাহায্যপ্রার্থীদের সাহায্য করা, দুর্দশাগ্রস্থদেরকে সহযোগিতা করা এবং বালা মুসিবতে আক্রান্ত ব্যক্তিদের মুসিবত দূর করাতে তাদের সক্ষমতা থাকার বিষয়ে এগুলো হলো সুস্পষ্ট ও অকাট্য দলীল প্রমাণ।

৪. ওলী আওলিয়াদের ক্ষমতা ও শক্তি

ওলী আওলিয়াদের ক্ষমতা ও শক্তি বর্ণনা করার জন্য তারা যেসব কাহিনী তৈরি করেছে, তার মধ্যে আশ্চর্যকর একটি কাহিনী হলো,

জনৈক ব্যক্তি বায়েজিদ বোস্তামীর কাছে উপস্থিত হয়ে দেখলো যে, বায়েজিত বোস্তামি আকাশের দিকে তাকিয়ে আছে এবং তার চোখ দিয়ে অশ্রু গড়িয়ে পড়ছে। তখন সেই ব্যক্তি বললো, হে ওস্তাদ! এটা কী? তখন বায়েজিদ বোস্তামী বললো, আমি আরশে গিয়েছিলাম এবং এক পা দিয়ে জমীনকে ভাজ করেছিলাম। তখন আমি দেখলাম যে, ক্ষুধার্ত বাঘ যেমন মুখ খুলে থাকে, তেমন আরশ রবের খোজে মুখ খোলে রয়েছে। আমি আশ্চর্য হয়ে চিৎকার করে বললাম, এটি তো এক আশ্চর্যকর বিষয়! দয়াময় আল্লাহ আমাদেরকে জানিয়েছেন যে, তিনি আরশের ওপরে রয়েছেন। তাই আমি তোমার কাছে তাঁর খোজে এসেছি। কিন্তু আমি তোমাকে এই অবস্থাতে দেখছি। তখন আরশ উত্তর দিলো। তারপর আল্লাহ তা'আলা আমার হয়ে আরশকে বললেন যে, হে আরশ! তুমি যদি আমাকে পেতে চাও, তাহলে আমাকে বায়েজিদের অন্তরে তালাশ করো (হিকায়াতু রিযভীয়্যাহ, ১১০ পৃ.)।'

তাদের তৈরি করা কথার মধ্যে আরো রয়েছে যে, হিংস্র পশুরা তাদেরকে ভয় করে ও তাদের আনুগত্য করে। আর তাদের বিষয়ে এমন জ্ঞান রয়েছে, যার মাধ্যমে অন্তরে কী ঘটছে তা তারা জানতে পারে।

বেরেলভী একটি কাল্পনিক কাহিনী বর্ণনা করে। সেটি হলো,

দুইজন আলেম কোনো এক আল্লাহর ওলীর কাছে উপস্থিত হলেন এবং সেই ওলীর পিছনে সালাত আদায় করলেন। ওলী সালাতে কুরআন তিলাওয়াত করলো, কিন্তু ধীরে ধীরে তিলাওয়াত করলো না এবং তাজবীদের কায়েদাতে হরফগুলো তার মাখরাজ অনুযায়ী উচ্চারণ করলো না। তখন এই ওলীর বিষয়ে তাদের অন্তরে ভাবনা আসলো, যেই ওলী তাজবীদের কায়েদাগুলো জানে না। তাদের অন্তরে যা হচ্ছিল ওলী সবই জানতে পারছিল, কিন্তু সে নিশ্চুপ ছিল। তারপর সেই দুই আলেম গোসল করার জন্য নদীতে গেলেন এবং তাদের কাপড়গুলো খুলে নদীর এক পাশে রাখলেন। তারপর এক সিংহ এসে সেই কাপড়গুলো একত্রিত করে তার ওপর বসে পড়লো। তারপর সেই দুই আলেম

সেই সিংহের চলে যাওয়ার জন্য অপেক্ষা করতে লাগলেন, যাতে তারা সেখান থেকে বের হতে পারে। কিন্তু সেই সিংহ চলে যায় না। এই খবর ওলীর কাছে পৌঁছালে সে দ্রুত সিংহের কাছে আসলো। তারপর তার কান ধরে ডান গালে একটি থাপ্পড় দিলো, তারপর মুখমন্ডল ঘুরিয়ে বাম গালে আরেকটি থাপ্পড় দিলো। তারপর তাকে বললো যে, তুমি আমাদের মেহমানদের ক্ষতি করার সাহস করেছো? এখান থেকে চলে যাও। তখন সে পালিয়ে গেল। তারপর ওলী দুই আলেমকে বললো, আপনারা জিহ্বাকে ঠিক করেছেন (এতে সে তাদের তাজবীদ ও কিরাআতের দিকে ইঙ্গিত করলো), আর আমরা অন্তরকে ঠিক করেছি। এটি হলো, সেই দুই আলেম মনে মনে যা ভেবেছিল তার জন্য ওলীর পক্ষ থেকে প্রতিউত্তর (হিকায়াতু রিযভীয়্যাহ, ১১০ পৃ.)।'

এই সম্প্রদায়ের কিতাবগুলোতে এই ধরনের কত বেশিই না কল্পকাহিনী রয়েছে!

আর হাস্যকর ও দুঃখজনক ঘটনা বহু রয়েছে। সেগুলোর মধ্যে বেরেলভী বর্ণনা করেছে যে,

আমার ওস্তাদ আহমাদের দুটি স্ত্রী ছিল। আর সে আব্দুল আযীয দাব্বাগের মুরীদ ছিল। একবার সে আমার ওস্তাদকে বললো যে, তোমার এক স্ত্রী জাগ্রত থাকাবস্থাতে তুমি কেন আরেক স্ত্রীর সাথে সহবাস ও মেলামেশা করলে? তখন সে বললো, হে আমার ওস্তাদ! সে তো জাগ্রত ছিল না, বরং সে ঘুমন্ত ছিল। তখন আব্দুর আযীয দাব্বাগ বললো, সে ঘুমিয়ে থাকার ভাব করেছিল, কিন্তু আসলে সে ঘুমিয়ে ছিল না। তখন সে বললো, হে আমার ওস্তাদ! আপনি কিভাবে এটা জানতে পারলেন? তখন তার শাইখ বললো, সেখানে তৃতীয় আরেকটি খাট ছিল কি? সে বললো, হ্যাঁ, সেখানে আরেকটি খাট ছিল। তখন তার শাইখ বললো, আমি সেই খাটের ওপরই ছিলাম (হিকায়াতু রিযভীয়্যাহ, ৫৫ পৃ.)।'

এই ধরনের কল্পকাহিনী থেকে আল্লাহ তা'আলার নিকটে আশ্রয় প্রার্থনা করছি। এর চেয়েও কি বড় ও নোংরা কল্পকাহিনী থাকতে পারে?

শাইখ তার মুরীদ ও স্ত্রীদের মাঝে একই ঘরে ঘুমায়? এর চেয়েও বড় কথা হলো, শাইখ মুরীদের নড়াচড়াও দেখে, এমনকি স্ত্রীর সাথে সহবাস কারও দেখে এবং আরেক স্ত্রীকে দেখে যে, সে তার স্বামী সহবারে দকে তাকিয়ে আছে!

এটি কি দীন ও শরীআত হতে পারে?

এটিই যদি দীন হয়, তাহলে কোনটি নাস্তিকতা, পাপাচার ও ফাসেকী তা আমাদের জানা নেই। আর আমরা জানি না যে, কোনটি লজ্জা আর কোনটি নৈতিকতা, যেটি উদীয়মান প্রজন্মকে শিক্ষা দেওয়া হয়, যেমন দৃষ্টি নত করা এবং অসার কথাবার্তা থেকে দূরে থাকা। বেরেলভী সম্প্রদায়ের দাবী অনুযায়ী যদি আল্লাহর ওলীরা এই কাজগুলো সম্পর্কে জানে, এই ধরনের অশ্লীল কাজগুলো করে, শরীআতের হারাম বিষয়ের দিকে দৃষ্টি দেয়, মাহরাম নয় এমন মহিলাদের মাঝে ঘুমায়, স্বামী স্ত্রীর মধ্যকার বিষয়গুলো পর্যবেক্ষন করে, তারপর সেগুলো নির্লজ্জতা ও অসম্মান করে সেগুলো আবার বর্ণনা করে, যে তারা একান্তে তা দেখেছে ও পর্যবেক্ষণ করেছে, এগুলোই যদি ওলী হওয়ার প্রমাণ হয় এবং এগুলোই যদি কারামত হয়, তাহলে এমন ওলী ও কারামত থেকে সালাম জানাই।

তারপর এই ঘটনার ওপর টীকা লিখা হয়েছে, যিই ঘটনা সেই শায়খের প্রবৃত্তির স্বাদ মেটানোর জন্য ও তা বর্ণনা করার জন্যই শুধু বানানো হয়েছে। সম্মানীত টিকাকার এর টিকাতে লেখেন,

ঘটনাটি থেকে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায় যে, শাইখ তার মুরীদ থেকে এমন অবস্থাতেও পৃথক হয় না, যেমনটি আশ-শারানী তার ‘আল মীযান’ কিতাবে বর্ণনা করেছে যে, ফকীহ ও সূফীদের সকল ইমামই তাদের মুকাল্লিদদেরকে সুপারিশ করবে। আর তাদের মুরীদের রুহ ফিরিয়ে দেওয়ার সময়, মুনকার নাকীরের প্রশ্নের সময়, হাশর, নাশর হিসাব, মীযান এবং সিরাতের সময়েও তারা তাদের দিকে লক্ষ রাখবে। কোনো অবস্থাতেই তারা তাদের মুরীদদের থেকে উদাসীন হয় না (হিকায়াতু রিযভীয়্যাহ, ৫৫ পৃ.)।’

বেরেলভী তার ‘মালফূযাত’ কিতাবে আরো একটি ঘটনা বর্ণনা করেছে, যার মাধ্যমে কবরে বিভিন্ন উৎসব ও উরস করার ফায়েদা স্পষ্ট হয় এবং মানুষের দৃষ্টি ও মনোযোগ আরো বেশি আকৃষ্ট হয়।

সায়্যেদ আহমাদ বাদাভী কবীরের কবরে তার জন্মদিনে তিনদিনব্যাপী উৎসব ও উরস অনুষ্ঠিত হতো। মানুষজন বাৎসরিকভাবে সেখানে জমায়েত হতো। যারা নিয়মিতভাবে সেখা উপস্থিত হতো, তাদের মধ্যে আব্দুল ওয়াহাব আশ-শারানীও ছিল। সায়্যেদ আহমেদ বাদাভীর মীলাদের অনুষ্ঠানে একবার আব্দুল ওয়াহাব আশ-শারানী উপস্থিত হলো, তখন লোকজন খুবই ভিড় করছিল। এমন সময় এক ব্যবসায়ীর দাসীর দিকে তার দৃষ্টি পড়লো। সেই দাসীটি তার অন্তরে ধরে গেল এবং সে তাকে নিজের করে নিল। তারপর সে কবরের কাছে গেল। তখন সায়্যেদ বাদাভী তাকে ডাক দিয়ে বললো, হে আব্দুল ওয়াহাব!

সেই মহিলাটিকে কি তোমার পছন্দ হয়েছে? সে বললো, হ্যাঁ। কোনো মুরীদের জন্য তার কোনো গোপন কথা তার শায়খের নিকট গোপন রাখা উচিত নয়। তখন সায়্যেদ বাদাভী বললো, তুমি সুন্দর বলেছো। সেই মেয়েটিকে আমি তোমার নিকট হাদীয়া দিলাম। তখন শারানী আশ্চর্য হলো যে, কিভাবে সায়্যেদ বাদাভী সেই দাসীকে হাদিয়া দিতে পারে, অথচ সেই মহিলাটি এক ব্যবসায়ীর দাসী? কিছু সময় পরে সেই ব্যবসায়ী উপস্থিত হয়ে দাসীটিকে মাযারের জন্য মানত হিসেবে দিয়ে দিলো। তখন কবরের খাদেমের কাছে ইলহাম করা হলো যে, সে যেন এই মহিলাকে আব্দুল ওয়াহাবের জন্য হাদিয়া দেয়। তখন আব্দুল ওয়াহাব শারানী দিশেহারা হয়ে গেল। তারপর সায়্যেদ বাদাভী তাকে ডেকে বললো, হে আব্দুল ওয়াহাব! সে তো আর ব্যবসায়ীর নেই। সুতরাং তুমি তাকে নিয়ে অমুক ঘরে যাও। আর সেখানে গিয়ে তোমার প্রয়োজন পূরণ করো (মালফূযাতুল বেরেলভীয়্যাহ, ২৭৫-২৭৬ পৃ.)।'

৫. বেরেলভী ওলী আওলিয়াদের গায়েব সম্পর্কে

বেরেলভী ওলী আওলিয়াদের গায়েব সম্পর্কে জানা এবং সকল বিষয়ে তাদের শক্তি ও ক্ষমতা থাকা, এমনকি তাদের মৃত্যুর পরেও তাদের শক্তি ও ক্ষমতা থাকাকে প্রমাণ করতে চেয়েছে। কিন্তু সে এর পক্ষে মিথ্যা কাহিনী ও নোংরা যৌন চাহিদা সম্পৃক্ত ঘটনা ছাড়া আর কোনো দলীল প্রমাণ পাইনি।

এগুলো হলো দাবী ও এগুলোই হলো প্রমাণ।

আরো অদ্ভুদ ব্যাপার হলো, শাইখ শুধু একাই অদৃশ্য সম্পর্কে জানে, সাধারণ মানুষের অন্তরে এবং বিশেষভাবে তার মুরীদদের অন্তরে যা কিছু হয় সে সম্পর্কে জানে, বিষয়টি এমন নয়, বরং শায়খের মুরীদরাও তা জানে। তারা সেগুলো জানে শায়খের পা মোবারককে চুমা দিয়ে ও যেই জমীনে শায়খের পা স্পর্শ করেছে সেই জমীনকে চুমা দেওয়ার মাধ্যমে। এর দলীল হলো একটি ঘটনা, যা বেরেলভী নিজেই বর্ণনা করেছে।

বেরেলভী বলে যে, হযরত সায়্যেদ মুহাম্মাদ ছিল বিশিষ্ট পণ্ডিত ও শ্রদ্ধেয় ব্যক্তিদের একজন। একদা সে রাস্তা দিয়ে হাটছিল। এমন সময় সে হযরত নাসিরুদ্দীন মাহমূদ শারাগ দেহলভীকে তার বাহনে দেখলো। সায়্যেদ মুহাম্মাদ তার নিকটে তাড়াতাড়ি এসে তার হাটুতে চুমা দিলো। তখন শাইখ বললো, তুমি আরো নিচে যাও। তখন সায়্যেদ মুহাম্মাদ তার পায়ে চুমা দিলো। তারপর শাইখ তাকে বললো, আরো নিচে যাও। তখন সে ঘোড়ার খুরে চুমা দিলো। শাইখ বললো যে, তুমি আরো নিচে যাও। তখন সায়্যেদ মুহাম্মাদ

একটু পিছনে এসে সেই যমীনকে চুমা দিলো, যেখানে সেই ঘোড়ার পা স্পর্শ করেছিল। তখন মানুষজন আশ্চর্য হয়ে বললো যে, এমন সম্মানীত সায়েদ মুহাম্মাদ শায়খের হাটুতে চুমা দিলো, কিন্তু তাতেও সে সন্তুষ্ট হলো না। তারপর সে তার পায়ে চুমা দিলো, কিন্তু তাতেও সে সন্তুষ্ট হলো না। তারপর সে তার ঘোড়ার খুরে চুমা দিলো, কিন্তু তাতেও সে সন্তুষ্ট হলো না, এমনকি শেষ পর্যন্ত সে তার সামনের যমীনে চুমা দিলো! তখন সায়্যেদ মুহাম্মাদ বললো, এই চুমাগুলোর কারণে আমার শাইখ আমাকে কী দিয়েছে তা মানুষজন জানে না। আমি যখন তার হাটুতে চুমা দিয়েছিলাম, তখন আমার সামনে মানবতার জগত উন্মোচিত হয়েছিল। তারপর যখন তার পায়ে চুমা দিয়েছিলাম, তখন আমার সামনে উর্ধজগত উন্মোচিত হয়েছিল। তারপর যখন ঘোড়ার খুরে চুমা দিয়েছিলাম, তখন আমার জন্য প্রতাপশালীর জগত উন্মোচিত হয়েছিল। তারপর যখন যমীনে চুমা দিয়েছিলাম, তখন আমার সামনে মাবুদ আল্লাহ তা'আলার জগত উন্মোচিত হয়েছিল (হিকায়াতু রিযভীয়্যাহ, ৬৩-৬৪ পৃ.)।'

এদের সম্পর্কেই আল্লাহ তা'আলা বলেছে যে,

﴿أُوْلَـٰٓئِكَ ٱلَّذِينَ ٱشۡتَرَوُاْ ٱلضَّلَـٰلَةَ بِٱلۡهُدَىٰ فَمَا رَبِحَت تِّجَـٰرَتُهُمۡ وَمَا كَانُواْ مُهۡتَدِينَ﴾

তারাই হিদায়াতের বিনিময়ে গোমরাহীকে ক্রয় করেছে। তাই তাদের ব্যবসা লাভজনক হয়নি এবং তারা হিদায়াতপ্রাপ্তও ছিল না (সূরা আল বাকারা: ১৬)।

৬. নবীগণের মতো ওলীরাও তাদের কবরে জীবিত

তারা বলেছে যে, নবীগণের মতো ওলীরাও তাদের কবরে জীবিত রয়েছে। চোখ ধাধানোর মতো শুধু কয়েক সেকেন্ড বা কয়েক মুহূর্তের জন্যই শুধু তাদের মৃত্যু আসে। তারপর তাদেরকে নিকটে তাদের রূহ ফিরিয়ে দেওয়া হয় এবং তারা তাদের শরীর নিয়ে পার্থিব জীবনযাপনের মতো জীবিত থাকে। সেখান থেকে তারা শুনতে পারে, উত্তর দিতে পারে, তারা দাঁড়াতে পারে ও বসতে পারে। তারা ঘুমায় এবং জাগ্রত হয়।

যদি এই সম্প্রদায়কে বলা হয় যে, যদি তোমরা সত্যবাদী হও, তাহলে এর পক্ষে দলীল নিয়ে আসো। তখন তারা বলে যে,

'শাইখ আহমাদ ইবনু রিফাঈ প্রতি বছর হাজীদেরকে দিয়ে নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে সালাম প্রেরণ করতো। যখন সে নিজেই যিয়ারত করলো, তখন সে নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কবরের সামনে দাঁড়িয়ে কবিতা আবৃত্তি করতে লাগলোঃ

আমার রূহ অনেক দূরে থাকাবস্থাতে আমি তা (সালাম) প্রেরণ করতাম।

যমীন তা গ্রহণ করতো, সেই হলো আমার প্রতিনিধি,

এটি হলো সুযোগ, যেখানে আমি উপস্থিত হয়েছি।

সুতরাং আপনি আপনার দুই হাতকে বাড়িয়ে দিন, যাতে করে আমার দুই ঠোট মর্যাদাবান হয়ে যায়।'

বলা হয়ে থাকে যে, তখন নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হাত কবর থেকে বেরিয়ে আসে, আর সে তাতে চুমা দেয় (মাজমূআতু রাসাইল লিল বেরেলভীয়্যাহ, ১৭৩ পৃ.)।'

ওলীরা এমনই হয়। এর দলীল হলো,

'আব্দুল ওয়াহাব শারানী নিয়মিতভাবে সায়্যেদ আহমাদ বাদাভী কবীরের উরসে উপস্থিত হতো। একবার উপস্থিত হতে দুইদিন দেরী হলো। তখন হযরতের কবরের পাশে যারা থাকতো, তারা দেখলো যে, হযরত সায়্যেদ বাদাভী বারবার তার পর্দা উঠিয়ে তার মুরীদ আব্দুল ওয়াহাব সম্পর্কে জিজ্ঞেস করছে যে, সে উপস্থিত হয়েছে নাকি এখনো উপস্থিত হয়নি? যখন আব্দুল ওয়াহাব উপস্থিত হলো, তখন হযরতের কবরের পাশে থাকা লোকজন তাকে বললো যে, হযরত কবর থেকে বারবার তার পর্দা উঠিয়ে আব্দুল ওয়াহাব উপস্থিত হয়েছে কিনা তা জিজ্ঞেস করছিল। তখন আব্দুল ওয়াহাব বললো যে, হযরত কি তার মাযারে আমার উপস্থিতি সম্পর্কে জানতে পারে? তখন তারা বললো যে, কেনই বা তারা জানবে না, অথচ সে নিজেই বলেছে যে, যে ব্যক্তি তার বাড়ি থেকে আমার যিয়ারতের জন্য চায়, তার বাড়ি যত দূরেই হোক না কেন, আমার কবরের কাছে উপস্থিত হওয়া পর্যন্ত তার ইচ্ছাটা আমি জানি। আর সে যে বোঝা বহন করে, সেই সবগুলোরই আমি জিম্মেদার হয়ে যাই (মালফূযাত লিল বেরেলভীয়্যাহ, ২৭৫ পৃ.)।'

এর চেয়েও বড় বিষয় হলো, একটি ঘটনা বর্ণনা করা হয়েছে যে, দুই আপন ভাই আল্লাহর রাস্তাতে নিহত হয়েছিল। তাদের তৃতীয় আরেকটি ভাই ছিল। যখন সেই ভাইয়ের বিবাহের দিন আসলো, সেদিন সেই দুই ভাইও উপস্থিত

হলো। তাদের উপস্থিতি দেখে তৃতীয় ভাই আশ্চর্য হলো। তখন তারা দুজনে বললো যে, আমাদেরকে এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত হওয়ার জন্য বিশেষভাবে পাঠানো হয়েছে। তারপর তারাই সেই বিবাহের দায়িত্ব গ্রহণ করলো। এবং বিবাহের পরে আবার তারা ফিরে গেল (হিকায়াতু রিযভীয়্যাহ, ১১৬ পৃ.)।'

আমাদের নিকটে আরো একটি ঘটনা বর্ণনা করা হয়েছে যে,

'সায়্যেদ আবূ সাঈদ খাজ্জাজ বলেছে যে, আমি একবার পবিত্র মক্কাতে ছিলাম। এমন সময় বানূ শায়বার দরজার কাছে এক যুবককে মৃত অবস্থাতে দেখলাম। সেই যুবক আমার দিকে তাকিয়ে হাসতে থাকলো, আর বললো যে, হে আবূ সাঈদ! তুমি কি জানো না যে, আল্লাহর প্রিয়জনরা জীবিত। আর যদি তারা মারা যায়, তাহলে শুধু তারা এক জগত থেকে আরেক জগতে স্থানান্তরিত হয় মাত্র (মাজমূআতু রাসাইল লিল বেরেলভীয়্যাহ, ২/২৪৩)।'

অনুরূপভাবে আরো একটি ঘটনা হলো,

সায়্যেদ হযরত আবূ সাঈদ বলেছে, এক দরিদ্র ব্যক্তি মারা গিয়েছিল। আমি তাকে নিয়ে তার কবরে নামলাম। তারপর তার কাফন খুলে তার মাথাটা মাটির ওপর রাখলাম, যাতে করে আল্লাহ তা'আলা তার দরিদ্রতাতে তার ওপর রহম করেন। তখন দরিদ্র ব্যক্তিটি তার দুই চোখ খুলে বললো, হে আবূ সাঈদ! যিনি আমাকে আশ্রয় দিয়েছেন তার সামনে তুমি আমকে লাঞ্ছিত করলে? আমি অবাক হয়ে বললাম, হে সায়্যেদ! মৃত্যুর পরেও জীবিত থাকে? তখন সে আমাকে বললো, আমি জীবিত, আর আল্লাহ প্রিয়জনেরা সকলেই জীবিত, যাতে করে আমার এই সম্মান দিয়ে তোমাকে সাহায্য করতে পারি (মাজমূআতু রাসাইল লিল বেরেলভীয়্যাহ, ২/২৪৩-২৪৪)।'

এই ধরনের ঘটনা আরো কতই না রয়েছে! সেগুলোর মধ্যে আরো রয়েছে,

'এক মহিলা মৃত্যুবরণ করলো। তারপর তাকে কাফন পরিয়ে দাফন করা হলো। তারপর স্বপ্নে তার ছেলের সাথে তার সাক্ষাত হলো। সে বললো যে, আমার কাফন জীর্ণ হয়ে গেছে, সেজন্য আমি এটি নিয়ে আমার সঙ্গীদের কাছে যেতে লজ্জা করছি। তাই আজ থেকে তৃতীয় দিনে আমাদের সাথে অমুক ব্যক্তি মিলিত হবে। যখন সেই ব্যক্তিকে কাফন পরানো হবে, তখন তুমি তার কাফনের সাথে নতুন সুন্দর একটি কাফন দিও। সকাল হলে ছেলেটি সেই ব্যক্তির খোঁজ নিয়ে জানতে পারলো যে, সেই ব্যক্তি সুস্থ রয়েছে, তার কোনো অসুস্থতা নেই। কিন্তু তৃতীয় দিনে ছেলের নিকটে খবর আসলো যে, সেই ব্যক্তি মারা গেছে। তখন ছেলে অতি দ্রুত তার জন্য মূল্যবান নতুন একটি কাফন

নিয়ে আসলো এবং তার কাফনের সাথে সেই মূল্যবান নতুন কাফনটিকেও দিয়ে দিলো এবং বললো যে, এটি আমার মায়ের নিকটে পৌঁছিয়ে দিও। তারপর রাতে ঘুমের সময় তার মা উপস্থিত হয়ে বললো যে, আল্লাহ তোমাকে উত্তম প্রতিদান দিন, কেননা তুমি আমার জন্য নতুন কাফন পাঠিয়েছো।[৪২৫]

আরো একটি ঘটনা বর্ণনা করাতে কোনো সমস্যা নেই, যেখানে মৃত ব্যক্তির এক স্থান থেকে আরেক স্থানে স্থানান্তরিত হওয়ার কথা বর্ণনা করা হয়েছে। এই ঘটনাটি বর্ণনা করেছে বেরেলভীর এক অনুসারী। ঘটনাটি হলো,

'ভারতের জৈনপুরে এক ধার্মিক মহিলা মারা যায়। আর জৈনপুরেরই এক খারাপ ব্যক্তি মদীনাতে মারা যায় এবং তাকে বাকীউল গারকাদে দাফন করা হয়। তারপর ধার্মিক মহিলাটিকে জৈনপুরী থেকে বাকীউল গারকাদে স্থানান্তর করা হয়, আর সেই ব্যক্তি লাশ বাকিউল গারকাদ থেকে জৈনপুরে সেই মহিলার কবরে স্থানান্তর করা হয়। আর এই ঘটনা মানুষজন তাদের স্বচক্ষে দেখেছে।[৪২৬]

৭. মৃতদেরকে জীবিত করার ক্ষমতা

আর মৃতদেরকে জীবিত করাতে তাদের ক্ষমতা থাকাটাও তাদের পূর্ববর্তীতে উপকথাতে রয়েছে এবং তারা তাদের পিতৃপুরুষদেরকে এগুলো বিশ্বাসী অবস্থাতে পেয়েছে। সেই ঘটনাগুলো হলো,

'সায়্যেদ হযরত আহমাদ একবার রাস্তা দিয়ে পার হচ্ছিল। পথিমধ্যে সে দেখলো যে, একটি হাতি মরে আছে, আর মানুষজন তার চারপাশে দাঁড়িয়ে আছে। তখন সে তাদের কাছে গিয়ে জিজ্ঞেস করলো যে, কী হয়েছে? তারা বললো, হাতিটি মারা গেছে। তখন সে বললো যে, এর সূড় ঠিক রয়েছে, ছোখ দুটিই ঠিক রয়েছে। অনুরূপভাবে তার দুই হাত ও দুই পাও ঠিক রয়েছে, তাহলে সে কিভাবে মারা যেতে পারে? এই কথা বলার সাথে সাথেই হাতিটি নড়াচড়া করে জীবিত হয়ে দাঁড়িয়ে গেল।[৪২৭]

অনুরূপভাবে আরো বর্ণিত হয়েছে যে, 'শাইখ জীলানী একবার এক চিলের দিকে রাগের দৃষ্টিতে তাকিয়েছিল। এতেই সেই চিল মরে পড়ে গিয়েছিল।

[৪২৫] মালফুযাত লিল বেরেলভীয়্যাহ, ৯৫ পৃ.

[৪২৬] মাওআয়িযু নাঈমিয়্যাহ, ২৬ পৃ.

[৪২৭] (হিকায়াতু রিযভীয়্যাহ, ৭১ পৃ.)

তারপর শাইখ জীলানী সেই চিলকে স্পর্শ করার সাথে সাথে সে আবার জীবিত হয়ে উড়ে যায়।[৪২৮]

এই সম্প্রদায়ের লোকদের আশ্চর্যকর বিষয় হলো, তারা এমন কল্পকাহিনী বর্ণনা করে, যেগুলো বিবেক গ্রহণ করে না এবং মানুষের চিন্তা ভাবনা সেগুলোকে অবজ্ঞা করে। সেসব ঘটনাগুলোর মধ্যে আছে,

‘আল্লাহর দুই ওলী নদীর দুই পাশে বসবাস করতো। একবার একজন এক ধরনের দুগ্ধজাত খাবার রান্না করে অপর জনের কাছে পাঠাতে চাইলো। তাই সে তার খাদেমকে বললো যে, তুমি এই খাবার নিয়ে আমার সেই বন্ধুর কাছে যাও। তখন খাদেম বললো, আমি কিভাবে নদী পার হবো, অথচ আমার কাছে নদী পার হওয়ার মতো নৌকা বা এমন কিছুই নাই। তখন ওলী বললো, তুমি নদীর কাছে গিয়ে তাকে বলো যে, আমি এমন এক ব্যক্তির নিকট থেকে এসেছি, যে এখনো তার স্ত্রীর সাথে সহবাস করেনি। তখন সেই খাদেম আশ্চর্য হয়ে গেল এবং দিশেহারা হয়ে গেল। কারণ তার শায়খের অনেক সন্তান ছিল (তাহলে সহবাস না করলে সন্তান হলো কিভাবে)। তারপর খাদেম নদীর কাছে এসে তার শাইখ যা বলেছে তাই বললো, এতে নদী বিদীর্ণ হয়ে গেল। আর সেই খাদেম নিরাপদে নদী পার হয়ে গেল। তারপর সে খাবারটি অপর ওলীকে দিল। তখন সেই ওলী খাবার খেয়ে তার জন্য কল্যাণের দুআ করলো। আর বললো, তোমার ওস্তাদকে আমার পক্ষ থেকে সালাম দিও। তখন খাদেম তাকে বললো যে, আমি সেখানে গিয়ে আপনার পক্ষ থেকে তাকে সালাম দিবো? তাহলে কিভাবে আমি সেখানে পৌঁছাবো, অথচ আমার ও তার মাঝে এই নদী রয়েছে? তখন ওলী বললো, তুমি নদীর কাছে গিয়ে বলো যে, আমি এমন এক ব্যক্তির নিকট থেকে আসলাম, যে ত্রিশ বছর ধরে কোনো খাবার খায়নি। এতে তার দিশেহারা আরো বেড়ে গেল। কেননা সে এখনই তাকে খাবার খেতে দেখলো, যেই খাবার সে নিজেই নিয়ে আসলো। তারপর তার চিঠি নদীর কাছে পৌঁছাতেই খাদেমের জন্য নদী বিদীর্ণ হয়ে রাস্তা তৈরি হয়ে গেল।[৪২৯]

তারা যেসব আশ্চর্য ঘটনাগুলো বর্ণনা করেছে, সেগুলোর মধ্যে রয়েছে,

‘ইয়াহইয়া আল-মুনীরীর এক মুরীদ সাগরে পড়ে গিয়ে প্রায় ডুবে যাচ্ছিল। তখন খিযির আলাইহিস সালাম উপস্থিত হয়ে তাকে বললেন যে, তোমার হাত

[৪২৮] বাগিন ফিরদাউস লিল বেরেলভী, ২৭ পৃ.

[৪২৯] মালফুযাত লিল বেরেলভীয়্যাহ, ৫৩ পৃ.

আমার হাতের ওপর রাখো, আমি তোমাকে উদ্ধার করবো। তখন মুরীদ সতর্ক হয়ে বললো যে, হে আমার সায়্যেদ! আমার এই হাত তো মুনীরীর হাতের ওপর রয়েছে। সুতরাং কখনোই আমি তার হাত ছেড়ে অন্য হাত ধরবো না। এই কথা বলার সাথে সাথেই খিযির আলাইহিস সালাম অদৃশ্য হয়ে গেল এবং মুনীরী উপস্থিত হলো। এবং সে তার হাত ধরে তাকে ডুবা থেকে উদ্ধার করলো।[৪৩০]

এই ধরনের ঘটনাগুলোর মধ্যে আরো রয়েছে,

'বিশর আল-হাফী কখনো জুতা পরতো না, এজন্যই তাকে হাফী নামে নামকরণ করা হয়েছিল। তার সম্মান ও মর্যদার অন্তর্ভুক্ত হলো, যখন সে যেই রাস্তা দিয়ে হাটতো, সেই রাস্তাতে পশুরা পেশাব পায়খানা করতো না, যাতে করে হাফীর পা নোংরা হয়ে না যায়। হাফী যেই রাস্তা দিযে চলতো, সেই রাস্তাতে কোনো একদিন এক ব্যক্তি পেশাব পায়খানা দেখে বলে উঠলো, ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রজিউন'। তাকে এই ধরনের কথা বলার কারণ সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হলে সে উত্তর দিলো যে, এটি প্রমাণ করে যে, বিশর আল-হাফী মৃত্যুবরণ করেছে। পরে খোঁজ নিয়ে জানা গেল যে, লোকটি যা বলেছে তাই সত্য।[৪৩১]

৮. জাহান্নামীদেরকে জাহান্নাম থেকে মুক্ত করতে পারে এবং যাদের আযাব হচ্ছে তাদেরকে আযাব হতে নাজাত দিতে পারে

এছাড়াও ওলী আওলিয়াদের এই ক্ষমতা (তাদের ধারণা) রয়েছে যে, তারা জাহান্নামীদেরকে জাহান্নাম থেকে মুক্ত করতে পারে এবং যাদের আযাব হচ্ছে তাদেরকে আযাব হতে নাজাত দিতে পারে। এর দলীল হলো,

সায়্যেদ ইসমাইল হাযরামী একদা অনেকগুলো কবরের পাশ দিয়ে যাচ্ছিল। তার সাথে ইমাম মুহিবুদ্দীন তাবারীও ছিল। সায়্যেদ হাযরামী তাকে বললো, তুমি কি বিশ্বাস করো যে, কবরবাসীরাও জীবিতদের সাথে কথা বলে? মুহিবুদ্দীন তাবারী বললো যে, হ্যাঁ, আমি তা বিশ্বাস করি। তখন সায়্যেদ হাযরামী বললো, এই কবরবাসী আমাকে বলছিল যে, আমি জান্নাতীদের অন্তর্ভুক্ত। তারপর সে চল্লিশের বেশি কবরের পাশে দাঁড়িয়ে কাঁদতে শুরু করলো, এমনকি সূর্য উদিত হয়ে গেল ও দিনের আলো প্রকাশিত হলো।

[৪৩০] মালফুযাত লিল বেরেলভীয়্যাহ, ১৬৪ পৃ.
[৪৩১] হিকায়াতু রিযভীয়্যাহ, ১৭২ পৃ.

তারপর সে হেসে বললো যে, তুমিও তাদের অন্তর্ভুক্ত। এটা কি ও কী ঘটনা ঘটলো তা সম্পর্কে তাকে জিজ্ঞেস করা হলে সে বললো, এই কবরবাসীদের আযাব দেওয়া হচ্ছিল। তখন আমি কান্না করছিলাম এবং তাদের জন্য সুপারিশ করছিলাম। এমনকি শেষ পর্যন্ত আমার সুপারিশ কবুল করা হলো এবং তাদের আযাব মাফ করা হলো। কিন্তু এক পাশে একটি কবর ছিল, সেদিকে আমি খেয়াল করিনি। তারপর আমি শুনলাম যে, এক মহিলা আমাকে বলছে যে, আপনি কেন আমাকে আপনার শাফায়াত থেকে বঞ্চিত করলেন অথচ আমি তাদের অন্তর্ভুক্ত ছিলাম (অর্থাৎ তাদের সাথে আমার কবরেও আযাব হচ্ছিল এবং আমার কবরও তাদের মাঝেই ছিল)। আমি অমুক গায়িকা ছিলাম। আপনি শুধু তাদের জন্য সুপারিশ করলেন, কিন্তু কেন আমার জন্য সুপারিশ করলেন না? তার এই কথা শুনে আমি হেসে ফেললাম। তখন আমি বললাম যে, তুমিও তাদের অন্তর্ভুক্ত এবং তার কবরের আযাবও মাফ করে দেওয়া হলো।[৪৩২]

বেরেলভী লিখেছে যে, এক যুবক ইবনু আরাবীর মাজলিশে বসে কান্না করছিল। ইবনু আরাবী তাকে জিজ্ঞেস করলো যে, কিসে তোমাকে কাঁদাচ্ছে? সে বললো, আমি আধ্যাত্মিক অনুপ্রেরণার মাধ্যমে জেনেছি যে, আমার মাকে আযাব দেওয়া হচ্ছে এবং জাহান্নামের ফেরেশতারা আমার মাকে জাহান্নামের দিকে টেনে নিয়ে যাচ্ছে। তখন ইবনু আরাবী বললো, আমার নিকটে কিছু ওযীফার সওয়াব বিদ্যমান ছিল। তখন আমি মনে মনে বললাম যে, আমি সেই সওয়াবগুলো মহিলাটিকে দিয়ে দিবো। তখন সেই যুবক হাসতে শুরু করলো। তাকে বলা হলো যে, কী এমন হলো যে, তোমার কান্না থেমে গেল এবং তুমি হাসতে শুরু করলে। তখন সে বললো, আমি আযাবের ফেরেশতাদেরকে দেখলাম যে, তারা আমার মাকে ছেড়ে দিচ্ছে এবং রহমতের ফেরেশতারা আমার মাকে নিয়ে জান্নাতে নিয়ে যাচ্ছে।[৪৩৩]

এর পরে কি আর কোনো দলীল প্রমাণের প্রয়োজন আছে? অর্থাৎ এই ধরনের নিশ্চিত দলীল প্রমাণের পরে? কিন্তু যে ব্যক্তি এর পরেও দলীল চাইবে, সে হলো ওয়াহাবী কাফের। আমরা এই ধরনের দুর্বল বিবেক ও অসুস্থ অন্তর থেকে আল্লাহ তা'আলার কাছে আশ্রয় চাই, যেই অন্তরে শয়তান প্রভাব বিস্তার করেছে এবং তাকে সঠিক পথ থেকে বিচ্যুত করে দিয়েছে।

---

[৪৩২] মালফুযাত লিল বেরেলভীয়্যাহ, ৫৭-৫৮ পৃ.

[৪৩৩] মালফুযাত লিল বেরেলভীয়্যাহ, ৪৮ পৃ.

৯. অদ্ভুত ও আশ্চর্যকর কাহিনী

তারা যেসব অদ্ভুত ও আশ্চর্যকর কাহিনীগুলো বর্ণনা করে, সেগুলো এমন কাহিনী যা মানুষকে আল্লাহ থেকে বিমুখ করে, তাদেরকে আল্লাহ ছাড়া অন্যের দিকে পরিচালিত করে এবং তাদেরকে জানায় যে, আল্লাহ তা'আলার কোনো ক্ষমতা, ইচ্ছা ও শক্তি নাই। বরং এই সবগুলোই ওলী আওলিয়া ও সৎ লোকদের নিকট স্থানান্তরিত হয়ে গেছে। তাদের হাতেই সকল কিছু রয়েছে। সুতরাং একমাত্র তাদের কাছেই সাহায্য চাইতে হবে। তাদের হাতে ছাড়া কোনো নাজাত নেই। এর সর্বোৎকৃষ্ট উদাহরণ হলো, যা বেরেলভী নিজেই বর্ণনা করেছে। সেটি হলো,

বায়েজিদ বোস্তামী দজলা নদীর তীরে দাঁড়িয়ে আল্লাহর নাম স্মরণ করে তাতে নেমে পড়ে এবং যমীনে হাটার মতোই নদীর পানির ওপর দিয়ে হেঁটে যাচ্ছিল। এক ব্যক্তি তাকে দেখলো। আর সেও দজলা নদী পাড়ি দিতে চাইছিল। তাই সেও নদীতে নেমে পড়লো এবং বায়েজীদের পিছন পিছন হাঁটছিল ও তার নাম উচ্চরণ করছিল। তারপর সে বায়েজীদের কাছে এসে দেখলো যে, বায়েজীদ আল্লাহর নাম উচ্চারণ করছে। তখন সেও তার অনুসরণ করে আল্লাহর নাম উচ্চারণ করতে লাগলো। আল্লাহর নাম উচ্চারণ করতেই সে নদীতে ডুবতে শুরু করলো। তখন বায়েজীদ তার দিকে দৃষ্টি দিল। তারপর বায়েজীদ তাকে বললো যে, তুমি আল্লাহর নাম নয়, বরং আমার নাম উচ্চারণ করো। তুমি কিভাবে আল্লাহর নাম উচ্চারণ করা ও আমার নাম পরিত্যাগ করার দুঃসাহসিকতা দেখালে? তখন সেই ব্যক্তি বললো যে, আমি আপনাকে আল্লাহর নাম উচ্চারণ করতে দেখলাম, তাই আমিও আল্লাহর নাম উচ্চারণ করলাম। বায়েজীদ বললো যে, তুমি কি আমার স্তরে পৌঁছাতে পেরেছো যে, তুমি আল্লাহর কাছে পৌঁছাবে? তখন সেই ব্যক্তি বায়েজীদের নাম উচ্চারণ করতে লাগলো, এতেই সে ডুবে যাওয়া থেকে নাজাত পেল এবং যমীনের ওপরে রাস্তাতে হাঁটার মতোই পানির ওপর দিয়ে হাঁটতে শুরু করলো।[৪৩৪]

১০. উপসংহার:

শত শত ও হাজার হাজার ঘটনা থেকে একটি ঘটনা বর্ণনা করার মাধ্যমে আমরা এই অধ্যায় শেষ করবো, যার ওপর বেরেলভী সম্প্রদায়ের দীন প্রতিষ্ঠিত, এর ওপরই তারা তাদের শরীআতকে নির্মাণ করেছে এবং

[৪৩৪] মালফূযাত লিল বেরেলভীয়্যাহ, ৫২-৫৩ পৃ.

এগুলোকেই দীন ও দুনিয়াতে তারা তাদের দলীল প্রমাণ বানিয়েছে। তারা কতই না ক্ষতি ও লোকসানের মধ্যে রয়েছে! বেরেলভী নিজেই বলেছে,

এক জ্ঞানী ব্যক্তি তার জন্য শাইখ ও কামেল পথপ্রদর্শক খুঁজছিল, কিন্তু তার সন্ধান পাচ্ছিল না। তাই সে এক রাতে আল্লাহ তা'আলাকে বললো যে, আপনার গৌরব ও মর্যাদার কসম! আগামীকাল সূর্য উঠার পরে সর্বপ্রথম আমি যেই লোকের সাথে সাক্ষাত করবো, তার কাছেই বায়আত করবো। সকাল হলে সে বাড়ি থেকে বের হয়ে রাস্তাতে দাঁড়িয়ে প্রথম আগমনকারী ব্যক্তির অপেক্ষা করতে লাগলো। তখন এক চোর চুরি করা সম্পদ বহন করে আনছিল। তখন সেই জ্ঞানী ব্যক্তি দ্রুত তার কাছে গিয়ে তার হাত ধরে তাকে বললো, আপনার হাত বাড়িয়ে দেন, আমি আপনার কাছে বায়আত করবো। তখন সেই চোর আশ্চর্য হয়ে গেল এবং দিশেহারা হয়ে গেল। আর সে তার থেকে পালানোর ইচ্ছা করলো। কিন্তু সেই জ্ঞানী ব্যক্তি তাকে ছাড়লো না, এমনকি শেষ পর্যন্ত প্রকৃত কথা বলতে বাধ্য হলো। তখন চোর তাকে বললো, হে শাইখ! আপনি আমার থেকে কী চান? কেননা আমি তো প্রসিদ্ধ চোর ও ডাকাত। আর এগুলো হলো চুরির সম্পদ। তখন জ্ঞানী ব্যক্তি তাকে বললো, ঘটনা যাই হোক না কেন, আমি আল্লাহর কাছে কসম করেছি যে, সকালে আমি সর্বপ্রথম যার সাথেই সাক্ষাত করবো, তার হাতেই আমি বায়আত করবো। যখন খিযির আলাইহিস সালাম এই ঘটনা দেখলেন, পথপ্রদর্শক অন্বেষণকারীর সত্যতা দেখলেন, তখন তিনি সেখানে উপস্থিত হলেন, চোরের হাত ধরে তাকে ওলীর সকল পদমর্যাদা দান করলেন এবং তাকে উচ্চ মর্যাদা দিলেন ও পরিপূর্ণতায় প্রবেশ করালেন। আর তখন চোর সেখানেই দাঁড়িয়ে ছিল। তারপর খিযির আলাইহিস সালাম চোরকে এই জ্ঞানী ব্যক্তির বায়আত গ্রহণ করার আদেশ করলেন।[৪৩৫]

এটিই হলো সেই সম্প্রদায়। আর শারঈ মাসআলা ও দীনী আকীদা বিশ্বাস প্রমাণ করাতে এগুলোই হলো তাদের দলীল প্রমাণ। এটাই তাদের জ্ঞানের শেষ সীমা।

﴿إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعۡلَمُ بِمَن ضَلَّ عَن سَبِيلِهِۦ وَهُوَ أَعۡلَمُ بِمَنِ ٱهۡتَدَىٰ﴾

[৪৩৫] হিকায়াতু রিযভীয়্যাহ, ৭১-৭১ পৃ.

নিশ্চয় আপনার রব, তিনিই ভাল জানেন কে তাঁর পথ থেকে বিচ্যুত হয়েছে এবং তিনিই ভাল জানেন কে হেদায়াতপ্রাপ্ত হয়েছে (সূরা আন নাজম ৫৩ : ৩০)। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿أَرَءَيۡتَ مَنِ ٱتَّخَذَ إِلَٰهَهُۥ هَوَىٰهُ أَفَأَنتَ تَكُونُ عَلَيۡهِ وَكِيلًا ۝٤٣ أَمۡ تَحۡسَبُ أَنَّ أَكۡثَرَهُمۡ يَسۡمَعُونَ أَوۡ يَعۡقِلُونَۚ إِنۡ هُمۡ إِلَّا كَٱلۡأَنۡعَٰمِ بَلۡ هُمۡ أَضَلُّ سَبِيلًا﴾

আপনি কি তাকে দেখেছেন, যে তার প্রবৃত্তিকে ইলাহরূপে গ্রহণ করে? তবুও কি আপনি তার যিম্মাদার হবেন? নাকি আপনি মনে করেন যে, তাদের অধিকাংশ শোনে অথবা বোঝে? তারা তো পশুর মতই; বরং তারা আরও অধিক পথভ্রষ্ট (সূরা আল ফুরকান ২৫: ৪৩-৪৪)।

গ্রন্থপঞ্জি: যে সকল গ্রন্থ এবং উৎস এ বইতে উল্লিখিত হয়েছে

১. আল-কুরআনুল কারীম
২. ইমাম বুখারী, আস সহীহ।
৩. ইমাম মুসলিম, আস সহীহ।
৪. ইমাম তিরমিযী, আল জামি'।
৫. ইমাম আবু দাউদ, আস সুনান।
৬. ইমাম নাসাঈ, আস সুনান
৭. ইমাম ইবনু মাজাহ, আস সুনান।
৮. ইমাম মালিক, মুয়াত্ত্বা।
৯. ইমাম আহমদ, আল মুসনাদ।
১০. বাইহাকী, আস সুনান
১১. হাকিম, আল মুসতাদরাক।
১২. সাঈদ ইবনে মানসুর, আস সুনান
১৩. ইবনে আবী শাইবা, আল মুসান্নাফ।
১৪. আব্দুর রায্যাক, আল মুসান্নাফ।
১৫. মুহাম্মদ বিন হাসান আশ শাইবানী, 'আল আসার।
১৬. মুহাম্মদ বিন হাসান আশ শাইবানী, কিতাবুল আসল।
১৭. খতীব তিবরিযী, মেশকাতুল মাসাবীহ।
১৮. হাইসামী, মাজমাউয যাওয়াইদ।
১৯. ইমাম ইবনু কাসীর, তাফসীরে ইবনু কাসীর।
২০. ইমাম ইবনু জারীর তাবারী, তাফসীরে তাবারী।
২১. ইমাম কুরতুবী, তাফসীর আল কুরতুবী।
২২. সিদ্দিক হাসান খান, ফাতহুল বয়ান।
২৩. আশ শাওকানী, ফতহুল কাদীর।
২৪. ইমাম তিরমিযী, শামাইলে তিরমিযী।
২৫. বাইহাকী, শুয়াবুল ঈমান।
২৬. ইবনু হাজার আসকালানী, ফাতহুল বারী।
২৭. মুল্লা আলী কারী, মিরকাত শরহে মিশকাত।
২৮. আল আলুসী, রুহুল মা'আনী।
২৯. রশীদ রেযা, তাফসীর আল মানার।
৩০. কাজী সানাউল্লাহ, তাফসীরে মাযহারী।

৩১. মুল্লা আলী কারী, মাওযু'আত।
৩২. মুহাম্মদ তাহের পাটনী, তাযকেরাতুল মাওযু'আত।
৩৩. আশ শাওকানী, আল ফাওয়াইদুল মাজমু'আ ফিল আহাদীসুল মাওযু'আহ।
৩৪. আলবানী, সিলসিলাতু আহাদিসুস সহীহাহ।
৩৫. সাখাবী, মাকাসিদুল হাসানা।
৩৬. সুয়ুতী, তাহির আল মাকালা।
৩৭. যারকাশী, আল বুরহান ফি উলুমুল কুরআন।
৩৮. আল যাজারী, তাশিল উলুমুল কুরআন।
৩৯. শাহ ওয়ালী উল্লাহ, তাফহীমাত আল ইলাহিয়্যাহ।
৪০. শাহ ওয়ালী উল্লাহ, হুজ্জাতুল্লাহিল বালিগাহ।
৪১. আলুসী, আল আয়াতুল বাইয়্যিনাত ফী আদাম সামা' আল আনওয়াত।
৪২. ইবনু কাসীর আল বিদায়া ওয়ান নিহায়া।
৪৩. ইবনু হাজার আসকালানী, লিসানুল মীযান।
৪৪. আহমদ মুহাম্মদ আল মিশরী, আল কওলুল মুতামাদ ফী 'আমালিল মাওলিদ।
৪৫. ইবনু তাইমিয়্যাহ, আল ফাতওয়া।
৪৬. আল মারগিনানী, আল হিদায়া।
৪৭. ইবনুল হুমাম, ফাতহুল কাদীর।
৪৮. হাসকাফী, দুররুল মুখতার।
৪৯. ইবনু নুজাইম, আল বাহরুর রায়েক।
৫০. জাইলায়ী, তাবিঈনুল হাকাইক।
৫১. ফাতওয়া হিন্দিয়া।
৫২. সারাখসী, আল মাবসুত।
৫৩. আল কাসানী, বাদাই ওয়াস সানাই।
৫৪. আল বুখারী আল হানাফী, খুলাসাতুল ফাতওয়া।
৫৫. ফাতওয়া কাযী খান।
৫৬. ইবনুল বাযযায, ফাতওয়া বাযযাযিয়্যা।
৫৭. আল হালওয়ানী, আল কুনিয়া।
৫৮. কাযী সানাউল্লাহ, মা লা বুদ মিনহু।
৫৯. শাহ আবদুল আযীয, ফাতওয়া আযীযিয়্যাহ।
৬০. শাহ রফিউদ্দিন, ফাতওয়া।
৬১. ইবনু আবিদীন শামী, মাজমু'আ রাসাইল।

৬২. ইবনু আবিদীন শামী, রদ্দুল মুখতার।
৬৩. আইনী, আল বিনায়া শরহে হিদায়া।
৬৪. মাহমুদ আল হানাফী, শরহে দিরায়া।
৬৫. ইবরাহীম আল কাযী, মাজালিসুল আবরার।
৬৬. আহমাদ রেযা বেরেলভী, আল ফাতওয়া (পাকিস্তান ও ভারতীয় সংস্করণ)।
৬৭. আল বেরেলভী, ফাতওয়া আফ্রিকিয়্যাহ। (পাকিস্তানী সংস্করণ)
৬৮. আল বেরেলভী, নাফিউল ফাইয়ান মান আনারা বিনুরিহী কুল্লা শাইন, (পাকিস্তানী সংস্করণ)
৬৯. আল বেরেলভী, আহকামুল কুবুর মু'মিনীন (পাকিস্তানী সংস্করণ)।
৭০. আল বেরেলভী, বারাকাতুল ইসতিমদাদ, (পাকিস্তানী সংস্করণ)।
৭১. আল বেরেলভী, সালাতুস সফা ফী নুরুল মুস্তফা (পাকিস্তানী সংস্করণ)।
৭২. আল বেরেলভী, রিসালা বালিগান নূর, (ভারতীয় সংস্করণ)।
৭৩. আল বেরেলভী, রিসালা মাহী আদ্ দালালাহ, (পাকিস্তানী সংস্করণ)
৭৪. আল বেরেলভী, হুজ্জাতুল মু'তামানাহ, (ভারতীয় সংস্করণ)।
৭৫. আল বেরেলভী, শারহুল হুকুক, (পাকিস্তানী সংস্করণ)।
৭৬. আল বেরেলভী, হাযিজ আল বাহরাইন (পাকিস্তানী সংস্করণ)।
৭৭. আল বেরেলভী, রিসালা আল বাররুল মিকাল ফী কুবুলাতুল ইকলাল (পাকিস্তানী সংস্করণ)।
৭৮. আল বেরেলভী, বাযলুয যাওয়াইজ ফীদ্দু'আই ওয়াল কিয়াম বা'দাল জানাইয, লাহোর।
৭৯. আল বেরেলভী, মুনীরুল আইন ফী হুকুমি তাকবিলিল ইবহামাইন' (পাকিস্তানী সংস্করণ)।
৮০. আল বেরেলভী, আল হারফুল হাসান ফী কিতাবুল কাফন, (পাকিস্তানী সংস্করণ)।
৮১. আল বেরেলভী, আযকার হাবীব রিযা (মাজমুয়াহ মাকালাত), লাহোর।
৮২. আল বেরেলভী, মাকালাত রিযা (মাজমুয়াহ মাকালাত), লাহোর।
৮৩. আল বেরেলভী, আনওয়ার রিযা, (মাজমুয়াহ মাকালাত আল বেরেলভীয়্যাহ), লাহোর।
৮৪. আল বেরেলভী, হাদাইকে বাকশিশ (বেরেলভীর কবিতার সংকলন)।
৮৫. আল বেরেলভী, রিসালা হায়াত আল মামাত, (পাকিস্তানী সংস্করণ), এন.ডি.।

৮৬. আল বেরেলভী, খালিসুল ইতিকাদ, লাহোর, এন.ডি.।
৮৭. আল বেরেলভী, বাদরুল আনওয়ার ফিত্ তাবাররুক ওয়াল আদাব লিল আসার, (পাকিস্তানী সংস্করণ)।
৮৮. আল বেরেলভী, বারিকুল মানার লিশুমুল মাজার, (পাকিস্তানী সংস্করণ)।
৮৯. আল বেরেলভী, আহকামে শারিয়াত, (পাকিস্তানী সংস্করণ)।
৯০. আল বেরেলভী, ইযান আল আযর ফী আযান আল কুবুর, (পাকিস্তানী সংস্করণ)।
৯১. আল বেরেলভী, রিসালাতুল হুজ্জাতুল ফা'ইহা ফী তাতাইয়্যেবুত তাইয়্যুম ওয়াল ফাতিহা, (পাকিস্তানী সংস্করণ)।
৯২. আল বেরেলভী, আদ দাওলাতুল মাক্কিয়াহ বিল মাদ্দাতুল গাইবিয়্যাহ, (পাকিস্তানী সংস্করণ)।
৯৩. আল বেরেলভী, রিসালা আল কিয়াম, (পাকিস্তানী সংস্করণ)।
৯৪. আল বেরেলভী, রিসালা আল খতমে নুবুওয়াত, (পাকিস্তানী সংস্করণ)।
৯৫. আল বেরেলভী, রিসালা তামহীদুল ঈমান, (পাকিস্তানী সংস্করণ)।
৯৬. আল বেরেলভী, হুসাইন আল হারামাইন আলা মানহারুল কুফর ওয়ালমাইন (ভারতীয় সংস্করণ)।
৯৭. আল বেরেলভী, রিসালা তাজাল্লী আল ইয়াক্বিন, (পাকিস্তানী সংস্করণ)।
৯৮. আল বেরেলভী, রিসালা রুহুন কি দুনইয়া, (পাকিস্তানী সংস্করণ)।
৯৯. আল বেরেলভী, রিসালা সুবহানাল সুব্বুহ্, (পাকিস্তানী সংস্করণ)।
১০০. আল বেরেলভী, রিসালা আল ইন্তিবা ফী হাল নিদা ইয়া রাসূলুল্লাহ', করাচী পাকিস্তান।
১০১. আল বেরেলভী, বারাকাতুল ইস্তিমদাদ, (পাকিস্তানী সংস্করণ)।
১০২. আল বেরেলভী, আল ইস্তিমদাদ আলা আযইয়ালুল ইরতিদাদ, (পাকিস্তানী সংস্করণ)।
১০৩. আল বেরেলভী, আল জমজমাতুল কামরিয়্যাহ ফীল দব্ব আনিল খামরিয়্যাহ, (পাকিস্তানী সংস্করণ)।
১০৪. আল বেরেলভী, ই'লাম আল আ'লাম বিআন্না হিন্দুস্তান দারুল ইসলাম, (ভারতীয় সংস্করণ)।
১০৫. আল বেরেলভী, দাওয়ামুল আইশ ফী আন্নাল আইম্মাতা মিন কুরাইশ (লাহোর, পাকিস্তান)।

১০৬. আল বেরেলভী, সাইফুল মুস্তফা আলা আদইয়ানুল ইফতিরাহ, ভারতীয় সংস্করণ।

১০৭. আল বেরেলভী, রিসালা কাফলুল ফকীহুল ফাহীম, (পাকিস্তানী সংস্করণ)।

১০৮. আল বেরেলভী, আহসানুল উই'আ লি আদাবিদ দুআ, (পাকিস্তানী সংস্করণ)।

১০৯. আল বেরেলভী, হাক্কুল আইব ফী হুরমাতি তাসবীদুশ শাইব, (পাকিস্তানী সংস্করণ)।

১১০. আল বেরেলভী, আন নাহিল হাযিজ আন তাকরার সালাতিল জানাইয, (পাকিস্তানী সংস্করণ)।

১১১. আল বেরেলভী, রিসালা আল মুবীন ফী খাতামুন নাবিয়্যিন' (ভারতীয় সংস্করণ)।

১১২. আল বেরেলভী, রিসালা আল কাউকাবিয়াতুশ শিহাবিয়্যা ফী কুফরিয়াত আবিল ওয়াহহাবিয়্যাহ, পাকিস্তানী সংস্করণ।

১১৩. আল বেরেলভী, রিসালা আযলাল ই'লাম, (পাকিস্তানী সংস্করণ)।

১১৪. আল বেরেলভী, রিসালা হুক্কাত আল মারজান ফী হুকমুল দুখান, (পাকিস্তানী সংস্করণ)।

১১৫. আল বেরেলভী, রিসালা মাজক্ব তালবিস বার ইদ্দা'আ তাকদীস, (পাকিস্তানী সংস্করণ)।

১১৬. আল বেরেলভী, দিমানী বাগ (পাকিস্তানী সংস্করণ)

১১৭. আল বেরেলভী, আল কামাল আল মুবীন, (পাকিস্তানী সংস্করণ)

১১৮. আল বেরেলভী, আনফাসুল ফিকর ফী কুরবানুল বাকর, (পাকিস্তানী সংস্করণ)

১১৯. আল বেরেলভী, রিসালা কামারুল তামাম ফী নফী আল জীল্ল, (পাকিস্তানী সংস্করণ)

১২০. আল বেরেলভী, রিসালা আল মুন্নাত আল মুমতাজা, (পাকিস্তানী সংস্করণ)

১২১. আল বেরেলভী, আল উইফাক আল মুবীন, (পাকিস্তানী সংস্করণ)

১২২. আল বেরেলভী, দাওয়াহীম ফাতওয়া , লাহোর

১২৩. আল বেরেলভী, রিসালা আল নূর ওয়াল নাওয়ারাক, (পাকিস্তানী সংস্করণ)

১২৪. আল বেরেলভী, হুসনুল তাওমিনুম, (পাকিস্তানী সংস্করণ)

১২৫. আল বেরেলভী, রিসালা রাহবুস সা'হ, (পাকিস্তানী সংস্করণ)

১২৬. আল বেরেলভী, রিসালা আত তারসুল মুয়াদ্দাল, (পাকিস্তানী সংস্করণ)

১২৭. আল বেরেলভী, লাম' আল আহকাম, (পাকিস্তানী সংস্করণ)
১২৮. আল বেরেলভী, আল মাদাম আত তারাজ, (পাকিস্তানী সংস্করণ)
১২৯. আল বেরেলভী, রিসালা 'আল আহকাম ওয়াল 'ইলাল, (পাকিস্তানী সংস্করণ)
১৩০. আল বেরেলভী, মালাক আসমানী, (পাকিস্তানী সংস্করণ)
১৩১. আল বেরেলভী, রিসালা নুযুল আয়াত ফুরকান বিসুকুন জামিন ওয়া আসমান, (ভারতীয় এবং পাকিস্তানী সংস্করণ)।
১৩২. আল বেরেলভী, রিসালা আর্ক বিলাদুল হাবীব ওয়াল বিসাল',
১৩৩. আল বেরেলভী, আল হিদায়াত আল মুবারাক ফী ফালাকিল মালাইকা।
১৩৪. আল বেরেলভী, রিসালা ইলযামুস সুন্নাহ লি আহলিল ফিতনা, ভারতীয় সংস্করণ।
১৩৫. আল বেরেলভী, ফাতওয়া আল হারামাইন বার রাযফু নাদওয়াতুল মাইন, ভারতীয় সংস্করণ।
১৩৬. আল বেরেলভী, আল হাজার ওয়াল ইবাহা, ভারতীয় সংস্করণ।
১৩৭. আল বেরেলভী, রিসালা ইজালাতুল আর, পাকিস্তানী সংস্করণ।
১৩৮. নুরুল্লাহ আল কাদরী, আল ফাতওয়া নুরিয়্যাহ। (পাকিস্তানী সংস্করণ)
১৩৯. আল কাদরী, রিসালা গায়াতুল ইহতিয়াত, লাহোর।
১৪০. আহমদ ইয়ার নাঈমী, আল ফাতওয়া নাঈমীয়্যাহ (পাকিস্তানী সংস্করণ)।
১৪১. আহমাদ ইয়ার, ইলমুল কুরআন, লাহোর, এন.ডি.
১৪২. আহমাদ ইয়ার, সালতানাত মুস্তফা, (পাকিস্তানী সংস্করণ)।
১৪৩. আহমাদ ইয়ার, জা আল-হাক্ক (লাহোর, পাকিস্তান)
১৪৪. সদরুল আল ফাযিল নাঈমুদ্দীন মুরাদাবাদী, ফাতওয়া।
১৪৫. নাঈমুদ্দীন, আল কালিমাতুল উলিয়্যা লিইলাম 'ইলমুত মুস্তফা (পাকিস্তানী সংস্করণ)।
১৪৬. নাঈমুদ্দীন, আতিয়াব আল বায়ান ফী রদ্দু তাকভীয়াতুল ঈমান।
১৪৭. আমজাদ আলী রিযভী, বাহারে শারিয়াত। (লাহোর)
১৪৮. আহমাদ সাঈদ কাজমী, হায়াতুন নাফী (পাকিস্তানী সংস্করণ)।
১৪৯. আহমাদ সাঈদ, আল হাক্কুল মুবীন (পাকিস্তানী সংস্করণ)।
১৫০. আহমাদ সাঈদ কাজমী, মাকালাতুল কাজিমী, (পাকিস্তানী সংস্করণ)।
১৫১. আহমাদ সাঈদ কাজমী, তাসকীন আল খাওয়াতির ফী মাসআলাতিল হাজির ওয়া নাযির, (পাকিস্তানী সংস্করণ)।

১৫২. সাঈদ আহমাদ কাজিমী, হায়াতুন নবী, মুলতান পাকিস্তান, এন.ডি.
১৫৩. সাঈদ বেরেলভী, রিসালা সুরুরুল আইন (পাকিস্তানী সংস্করণ)।
১৫৪. আল কাজমী, মিরাজুন নবী, (পাকিস্তানী সংস্করণ)
১৫৫. আবদুল কাদীর, ইজালাতুদ দালালাহ (ভারতীয় সংস্করণ)।
১৫৬. খলীল আল বারকাতী, হিকায়াত রিযভীয়্যাহ, (পাকিস্তানী সংস্করণ)।
১৫৭. আবদে সামী', আনওয়ার সাতিয়া' (পাকিস্তানী সংস্করণ)।
১৫৮. আইয়ুব রিযভী, বাগ-ই ফিরদাউস (বেরেলী, ভারত)।
১৫৯. আইয়ুব রিজভী, মাদায়েহ আলা হযরত, ভারতীয় সংস্করণ।
১৬০. শারাফ আল কাদরী, ইয়াদে আলা হযরত, লাহোর, এন,ডি.
১৬১. শারাফ আল কাদরী, তাযকিরা আকাবির আহলি সুন্নাত, পাকিস্তানী সংস্করণ।
১৬২. শুযায়াত আলী কাদরী, মান হুয়া আহমাদ রেযা, লাহোর, এন,ডি.
১৬৩. নাসিম আল বাস্তাওবী, আলা হযরত বেরেলভী, লাহোর।
১৬৪. জাফর উদ্দীন বিহারী, হায়াতে আলা হযরত, করাচী, এন,ডি.
১৬৫. আল বিহারী, আল মুজমালুল মাওয়াদ্দিদ বি তাহফাতুল মুজাদ্দিদ, ভারতীয় সংস্করণ।
১৬৬. বদরুদ্দীন, সাওয়ানেহ আলা হযরত, (পাকিস্তানী সংস্করণ)।
১৬৭. সি্দ্দীক বেরেলভী, তাযকিরাত উলামায়ে আহলুস সুন্নাত', (পাকিস্তানী সংস্করণ)।
১৬৮. দীদার আলী, হিদায়াতুত তারিক্ব ফী বায়ানুত তাহকীক, লাহোর এন.ডি।
১৬৯. দীদার আলী, রাসূলুল কালাম ফীল মাওলিদ ওয়াল কিয়াম, লাহোর, এন.ডি.
১৭০. দীদার আলী, তাফসীর মীযানুল আদইয়ান, লাহোর এন.ডি।
১৭১. দীদার আলী, তারিক খাতম ওয়াল সাআল জাওয়াব, লাহোর এন.ডি।
১৭২. দীদার আলী মাদাদ গাফ্‌ফার, লাহোর, এন.ডি.
১৭৩. দীদার আলী, সুলুক কাদেরিয়া, লাহোর এন.ডি.
১৭৪. হাসনাইন রেযা, (সম্পা.) মালফুযাত আল বেরেলভী, (পাকিস্তানী সংস্করণ)।
১৭৫. হাসনাইন রেযা, (সম্পা.) ওয়াসাইয়া আল বেরেলভী, বেরেলী, ভারত।
১৭৬. মুহাম্মদ উসমান আল বেরেলভী, কাশফ্ ফুযুয, পাকিস্তানী সংস্করণ।
১৭৭. আব্দুস সাত্তার, নাগমাতুর রুহ (বেরেলী, ভারত)।

১৭৮. মুহাম্মদ তাইয়্যেব কাদরী, তাযানুব আহলুস সুন্নাহ আন আহলুল ফিতনাহ, (ভারতীয় সংস্করণ)।
১৭৯. শুমুলুল ইসলাম লি আবা আন নবী আল কারীম, (পাকিস্তানী সংস্করণ)।
১৮০. আল হাইবাতুল জাব্বারিয়্যাহ (পাকিস্তানী সংস্করণ)
১৮১. আজমল শাহ, রদ্দু শিহাবুস সাকিব বার ওয়াহাবী খাইব, করাচী।
১৮২. মাসুদ আহমেদ, ফাযিল বেরেলভী আওর তারক মাওয়ালাত, (পাকিস্তানী সংস্করণ)
১৮৩. মাসুদ আহমেদ, ফাযিল বেরেলভী ফী নাজর উলামা আল হিযাজ, (পাকিস্তানী সংস্করণ)।
১৮৪. হায়াত সদরুল আফাযিল, (পাকিস্তানী সংস্করণ)
১৮৫. মাহমুদ আল কাদরী, তাযকিরা উলামায়ে আহলুস সুন্নাহ, (ভারতীয় সংস্করণ)।
১৮৬. আবদুন নবী, সিরাত সালিক, (পাকিস্তানী সংস্করণ)।
১৮৭. আল ইয়াওয়াকিত আল মাহরিয়া, (পাকিস্তানী সংস্করণ)
১৮৮. গোলারবী, মাহী মুনীর, (পাকিস্তানী সংস্করণ)
১৮৯. মুস্তফা রেযা, আল কাসওয়ারা আলা আদবারুল হুমারুল কাফারা, ভারতীয় সংস্করণ।
১৯০. মুস্তফা রেযা, তানাবীর আল হুজ্জা লিমান ইউজাব্বিজু ইলতিবাল হাজ্জ, ভারতীয় সংস্করণ।
১৯১. আওলাদুর রাসূল, রিসালা মুসলিম লীগ কি জাররিন বাখেয়া দারী, ভারতীয় সংস্করণ।
১৯২. আবুল বারাকাত, আল জাওয়াবাতুল সানিয়্যা আলা জুহা আল সাওয়ালাত আল লীগিয়্যা, লাহোর এন.ডি.